রাজনীতি ও নারীশক্তি

ক্ষমতায়নের নব দিগন্ত

লেখিকা পরিচিতি

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম. এ. এবং ডক্টরেট কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায় মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপিকা হিসেবে কর্মজীবন আরম্ভ করেন এবং পরবর্তীকালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনীতি বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। তিনি গবেষণার কাজে আমেরিকার কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়, এবং ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে কয়েক বছর কাটিয়েছেন। প্রফেসর কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৯০-৯২ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রধান ছিলেন। ১৯৯৫ সালের জানুয়ারী মাসে ষাট বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি, ভারত, চিন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনীতি এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন সম্বন্ধে চারখানি গবেষণা গ্রন্থ এবং বহুসংখ্যক গবেষণা নিবন্ধের রচয়িতা। বর্তমান গ্রন্থটি লেখিকার পূর্ববর্তী দুখানি নারী বিষয়ক গ্রন্থের ধারাবাহী এবং পরিপূরক।

লেখিকার অন্যান্য গ্রন্থ

Industrialization Through Industrial Estates (1969)

Agricultural Development of India and China : A Comparative Study (1976)

Burma and Indonesia : Comparative Political Economy and Foreign Policy (1983)

Political Economy of Nonalignment : Indonesia and Malaysia (1990)

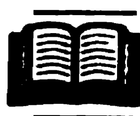
ধর্ম ও নারী ঃ সেকাল ও একাল (১৯৯৮)

নারী শ্রেণী ও বর্ণ ঃ নিম্নবর্গের নারীর আর্থসামাজিক অবস্থান (২০০০)

রাজনীতি ও নারীশক্তি

ক্ষমতায়নের নব দিগন্ত

কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়



ম্যানাস্ক্রিপ্ট ইন্ডিয়া
১৬৬/৩ শাস্ত্রী নরেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী রোড
সাঁতরাগাছি, রামরাজাতলা, হাওড়া-৭১১ ১০৪

প্রথম সংস্করণ ঃ ২০০১

প্রকাশক ঃ শ্রী প্রশান্ত আদিত্য
ম্যানাস্ক্রিপ্ট ইন্ডিয়া
১৬৬/৩ শাস্ত্রী নরেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী রোড
সাঁতরাগাছি, রামরাজাতলা, হাওড়া-৭১১ ১০৪

মুদ্রক ঃ ফ্রেন্ডস্ গ্রাফিক
১১বি, বিডন রো
কলকাতা-৭০০ ০০৬

সূচীপত্র

ভূমিকা

২০০০ সালকে ভারত সরকার নারীর ক্ষমতায়নের বছর বলে ঘোষণা করেছেন। সাধারণ অর্থে ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা লাভ অথবা এমন স্থানে অবস্থান করা যেখান থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেওয়া সম্ভব। এই ক্ষমতায়ন হতে পারে পারিবারিক, আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্য অনুযায়ী এদেশের পিতৃতান্ত্রিক আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় পুরুষরাই সর্বত্র ক্ষমতা প্রয়োগ এবং আধিপত্য করে এসেছেন। আর সুপরিকল্পিতভাবে নারীকে শিক্ষাহীন এবং আর্থিকভাবে পরনির্ভরশীল করে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। আজও নারীর স্থান প্রধানত গৃহকোণে এবং সেখানেও নারী পুরুষের অধীন। মনুর উক্তি 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি' আজও অনেকাংশেই সত্য।

স্বাধীনতা আন্দোলনে এবং বিভিন্ন গণ আন্দোলনে জাতিবর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে এদেশের নারীশক্তিকে ব্যবহার করা হয়েছে আন্দোলনেরই স্বার্থে। কিন্তু দেশের রাজনীতিতে নারীর এই অবদান অনেকখানি অস্বীকৃত এবং অলক্ষিত থেকে গেছে। সংসদীয় গণতন্ত্রে নারীর সামাজিক ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার প্রতি নজর দেওয়া হয়নি। গড়ে তোলা হয়নি উপযুক্ত আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো। আর তারই ফলশ্রুতি রূপে নারীর আর্থসামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ব্যহত হয়েছে। এখনও গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পার্লামেন্ট পর্যন্ত রাজনৈতিক ক্ষমতার সব কেন্দ্রে নারীর অবস্থান অতি সীমিত। আশির দশকের মধ্যভাগ থেকে পঞ্চায়েত, পুরসভা, বিধানসভা এবং সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষণের দাবি ওঠে। পরে সংবিধান সংশোধনির মাধ্যমে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে এবং পুরসভাগুলিতে নারীরা সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রবেশাধিকার লাভ করে। কিন্তু বিধানসভা ও সংসদের উভয় সভায় সংরক্ষণের দাবিতে মহিলা সংরক্ষণ বিলটি এখনও সংসদীয় রাজনীতির জটিল আবর্তে আবদ্ধ হয়ে আছে।

এই গ্রন্থের শুরুতে আমরা বর্তমান রাজনীতিতে বিভিন্ন জাতিবর্ণ ও শ্রেণীর নারীর সীমিত অবস্থানের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট এবং স্বাধীনতার কাল থেকে রাজনীতির বিভিন্ন পর্যায়ে এবং স্তরে নারীর অবদান ও অবস্থান বিশ্লেষণ করব। কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রে রাজনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতিবর্ণ ও শ্রেণীর নারীর ক্ষমতায়ন কতটুকু সম্ভব হয়েছে, তা দেখানো এবং ক্ষমতায়নের প্রতিবন্ধকতাগুলি নিয়ে আলোচনা করাই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। স্বাভাবিক কারণেই পঞ্চায়েতের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে চারটি পরিচ্ছেদে বিভিন্ন রাজ্যের পঞ্চায়েতে নারীর অবস্থান ও ক্ষমতায়ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই চারটি পরিচ্ছেদের মধ্যে দুটি পরিচ্ছেদ পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত বিষয়ক।

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক পরিচ্ছেদ দুটি (সপ্তম ও অষ্টম) প্রধানত আমার ব্যক্তিগত ক্ষেত্র সমীক্ষা এবং বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির দপ্তর থেকে

প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভরশীল। এই সমীক্ষার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইনস্টিটিউট অফ পঞ্চায়েতস অ্যাণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট-এর অধিকর্তা শ্রী অমল মুখোপাধ্যায়, আই. এ. এস এবং প্রবীণ অনুষদ সদস্য ডঃ মানব সেন-এর নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। বিশেষত শ্রী মুখোপাধ্যায়ের অকৃত্রিম সাহায্য ও সহযোগিতা না পেলে এ সমীক্ষা দুঃসাধ্য হতো। ২০০০ সালের নভেম্বর থেকে ২০০১ সালের মার্চ পর্যন্ত পাঁচটি জেলার (দক্ষিণ ২৪-পরগণা, মেদিনীপুর. বীরভূম, হুগলী এবং নদীয়া) দশটি ব্লকের (জয়নগর, ডায়মণ্ডহারবার ব্লক-১ ও ব্লক-২, ফলতা, সাগর, সাঁকরাইল, বোলপুর-শ্রীনিকেতন, চণ্ডীতলা ব্লক-১ ও ব্লক-২ এবং চাকদহ) বেশ কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যাদের সাথে আলোচনা সভা ও মৌখিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছি। মোট সমীক্ষিত মহিলাদের সংখ্যা ২৮৬। এদের মধ্যে অধিকাংশই গ্রাম পঞ্চায়েতের সাধারণ সদস্যা। কিছু প্রধান এবং উপ-প্রধানও আছেন। এছাড়া, কিছু জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা, পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী এবং কর্মাধ্যক্ষাও সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত। এদের মধ্যে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন চণ্ডীতলা ব্লক-১এর সভানেত্রী শ্রীমতী চায়না চ্যাটার্জী, হুগলী জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষা শ্রীমতী কৃষ্ণা ব্যানার্জী এবং ফলতা ব্লক-এর অডিট অ্যাণ্ড একাউন্টস্ অফিসার শ্রী দেবল মণ্ডল। দক্ষিণ ২৪-পরগণা জেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী উৎপল মুখার্জী, ডব্লু, বি. সি. এস সাগর ব্লকের সমীক্ষার কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। এদের সবাইকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। এই পুস্তকের সাধারণ তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীমতী নন্দিনী ব্যানার্জী দে এবং সর্বাণী গোস্বামী। শ্রী প্রশান্ত আদিত্য ব্যক্তিগত উদ্যম নিয়ে বইটির প্রকাশ ত্বরান্বিত করেছেন। তাকেও আমার ধন্যবাদ জানাই।

১

আর্থসামাজিক পটভূমি

একুশ শতকের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আজও বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতে নারীরা সামাজিক হীনস্থানে অবস্থিত। এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে এদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় নারীর অমূল্য অবদান আছে। কিন্তু সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির বিবর্তনে নারীর এই ভূমিকা ও অবদানের অধিকাংশই উপেক্ষিত অথবা অবমূল্যায়িত হয়েছে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা সকলেরই জানা। প্রাক্ স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে বিভিন্ন গণআন্দোলনেও নারীর অংশগ্রহণ ও অবদান ছিল অনবদ্য। আর একথাও সত্য যে ভারতীয় নারীরা ১৯১৯ সালেই তাদের অন্যতম রাজনৈতিক অধিকার অর্থাৎ ভোটাধিকার অর্জন করেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর বহুদল ভিত্তিক সংসদীয় গণতন্ত্রের উচ্চতর ক্ষমতার দরবারে অর্থাৎ পার্লামেন্ট ও রাজ্য বিধানসভায় নারীর অংশগ্রহণ এখনও পর্যন্ত অত্যন্ত সীমিত। সত্তরের দশকে শুরু হওয়া নারী আন্দোলনও এ বিষয়ে বিশেষ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির কাছেও নারীরা সাধারণভাবে উপেক্ষিত হয়েছেন। আশির দশক পর্যন্ত তৃণমুল স্তরের পঞ্চায়েত রাজনীতিতে নারীদের প্রায় দেখাই যেত না। পরে অবশ্য পঞ্চায়েতের সব স্তরেই এক-তৃতীয়াংশ আসনে নারীর প্রতিনিধিত্ব বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আর পুরসভাগুলিতেও নারীরা অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ আসনে প্রবেশাধিকার পেয়েছেন। তবে এখনও সমাজের অর্ধাংশ নারী সমেত বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ দুর্বল শ্রেণী, অর্থাৎ তপশিলী জাতি/উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর (ও বি সি) মানুষের উচ্চতর রাজনৈতিক ক্ষমতার আঙিনায় প্রবেশের সুযোগ অতি সংকীর্ণ। এদের মধ্যে আবার তপশিলী জাতি/উপজাতি এবং ওবিসি নারীরাই হলেন সর্বাপেক্ষা অসুবিধাভোগী। ভারতের সংসদীয় রাজনীতিতে তপশিলী জাতি/উপজাতি এবং ও বি সি নারী সহ সব নারী এবং অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীর এই অতি সীমিত অবস্থান তাদের আর্থসামাজিক

হীনাবস্থানেরই প্রতিচ্ছবি। আর আর্থসামাজিক এই হীনাবস্থান একদিনে তৈরী হয়নি।

ইতিহাস বলে যে বিপুল সংখ্যক মানুষের এই আর্থসামাজিক হীন অবস্থান স্বল্পসংখ্যক শাসক শ্রেণীর মানুষের কূট রাজনীতির দ্বারাই নির্ধারিত এবং নির্দেশিত হয়েছে। আর শাসন শোষণের এই রাজনীতিতে প্রধানত ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে হাতিয়ার রূপে। ক্ষত্রিয় শাসকগোষ্ঠী প্রাচীনকাল থেকে তাদের সমর্থনপুষ্ট পরগাছা ব্রাহ্মণকুলের সাথে এক মিত্রশক্তি গঠন করে ব্রাহ্মণদের রচিত তথাকথিত শাস্ত্রীয় বিধানকে প্রয়োগ করে উচ্চ নীচ জাতিবর্ণ ও শ্রেণী ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। আর তথাকথিত ধর্মীয় সমর্থনে শাসকশ্রেণী আর্থসামাজিক এই পিরামিডের শীর্ষে অবস্থান করে বিপুল সংখ্যক নরনারীকে শোষণ ও বঞ্চনার দ্বারা নির্বাসিত করেছেন তলদেশে। প্রাচীনভারতে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকারদের তথাকথিত নির্দেশই ছিল প্রশাসনিক আইন এবং এখনও অধিকাংশ আধুনিক আইনেরও প্রধান ভিত্তি হল শাস্ত্রীয় বিধি বিধান। সুতরাং যে অগণিত নরনারী আজ তাদের আর্থসামাজিক হীনস্থানের কারণে দেশের রাজনীতির আঙিনায়ও উপেক্ষিত এবং বঞ্চিত হচ্ছেন, তারা বহুলাংশে এই ধর্মীয় বিধি বিধানেরই শিকার। রাষ্ট্রনীতিতে ধর্মের প্রভাব যে কত ব্যাপক, গভীর ও দীর্ঘ, তার প্রমাণ বর্তমান ভারতের হিন্দু আইন, মুসলিম আইন, পারসী আইন প্রভৃতি ব্যক্তিগত আইনগুলি। 'ধর্মনিরপেক্ষ' ভারতীয় সংবিধানে যদিও জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সাম্যের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, তথাপি ধর্মভিত্তিক বিভিন্ন ব্যক্তিগত আইনগুলিই শাসননীতিতে ধর্মের অপরিহার্য প্রভাবকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

সুতরাং, ভারতের সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে নারী এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য দুর্বলশ্রেণীর অবস্থান ও ভূমিকা আলোচনার জন্য তথাকথিত শাস্ত্রীয় বা ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতে এদের অবস্থান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন। এই আলোচনাই বর্তমান ভারতীয় রাজনীতিতে নারী এবং অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীর অবস্থানের প্রেক্ষাপট জানতে আমাদের সাহায্য করবে।

ভারতে বহু ধর্মের মানুষের বাস হলেও এখানে শুধু হিন্দু ধর্মশাস্ত্র নিয়েই আলোচনা করা হবে। প্রধানত দুটি কারণে। প্রথমত ধর্ম কিভাবে এদেশের অধিকাংশ নারীর পারিবারিক, সামাজিক এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক হীনস্থান বহুলাংশে নির্ণয় করছে, তা জানতে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের আলোচনাই আমাদের সাহায্য করবে। দ্বিতীয় এবং প্রধান কারণটি নিহিত আছে এদেশে সাম্প্রতিক হিন্দু মৌলবাদের উত্থান এবং বিশেষত

এই মৌলবাদী আন্দোলনে কিছু নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্যে। জঙ্গি মৌলবাদী রাজনৈতিক পরিবার, আর এর সাধু, সন্ত, মোহান্ত এবং মহিলা শাখা দুর্গা বাহিনী সবাই এদেশে হিন্দুরাষ্ট্র স্থাপনের স্বপ্নে মশগুল। স্বাধ্বী ঋতম্ভরা, উমা ভারতী, সম্প্রতি প্রয়াত রাজমাতা বিজয় রাজে সিন্ধিয়া, সুষমা স্বরাজ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের মহিলা শাখা 'রাষ্ট্রসেবিকা', আর এর যত শাখা প্রশাখা সবাই সংঘ পরিবারকে ঘিরে আছে মৌলবাদী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে। আর এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিপুল সংখ্যক মধ্যবিত্ত এবং ধর্মভীরু নারীর সমর্থন ও সহযোগিতা পাওয়ার আশায় এরা অনবরত মাতৃশক্তির মহিমা কীর্তন করে যাচ্ছেন। আর সেই সঙ্গে দুটি মহাকাব্যের, বিশেষত রামায়ণের নারী চরিত্রগুলিকে এদেশের নারীর আদর্শরূপে তুলে ধরতে চাইছেন। মৌলবাদীদের স্বপ্নে দেখা হিন্দুরাষ্ট্র স্থাপিত হলে কয়েক সহস্র বছর পেছনে ফেলে আসা সেই রামরাজ্যই এদেশে গড়ে উঠবে, যেখানে অনেক নিরপরাধ সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়, বিনা দোষে বনবাসে যেতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত হতে হয় আত্মঘাতী। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এদেশের জাতি, বর্ণ ও শ্রেণী ভিত্তিক সমাজে নিম্নবর্গের নারীরাই বেশি নির্যাতিত এবং শোষিত। এখানে চিরকাল ক্ষত্রিয়ের অস্ত্রে বহু অনার্য তাড়কা নিহত হয়, প্রায় বিনা অপরাধে অনার্য শূর্পনখাদের অঙ্গচ্ছেদ করা হয়, আর ক্ষত্রিয় জননী ও তার পুত্রদের প্রাণ রক্ষার্থে জতুগৃহে দাহ করা হয় পুত্রসহ নিষাদ জননীকে।

সুতরাং এদেশের অধিকাংশ নারীর পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক অবমানবিক অবস্থানের সঠিক কারণগুলি খুঁজতে হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের আলোচনাই অত্যাবশ্যক। ভারতের সনাতন হিন্দু প্রশাসনিক রাজনীতির মূল নির্দেশাবলি রচিত আছে বেদ বেদাঙ্গ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র এবং পরবর্তীকালের বিভিন্ন পুরাণ পর্যন্ত তথাকথিত হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলিতে। এসব শাস্ত্রের বিধি বিধানগুলি কিভাবে শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত নারীর সারাজীবনের স্বাতন্ত্র্যকে হরণ করে নারীকে প্রায় এক জড় পদার্থে পরিণত করে রেখেছে যুগযুগান্তর ধরে, সে বিষয়েই আলোচনা করা হবে এই পরিচ্ছেদে।

প্রথম অনুচ্ছেদে সাধারণভাবে সব নারীর বর্তমান আর্থসামাজিক হীনবস্থানে ধর্মের প্রভাব আলোচিত হবে। আর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে নিম্নবর্গের নারীর হীনতর স্থানটিই আলোচ্য।

ধর্মে নারীর স্থান

ব্যক্তিগত ধনভিত্তিক পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বুনিয়াদকে সুরক্ষিত এবং সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে শাসকগোষ্ঠীর সমর্থনে কিছু চতুর এবং কৌশলী পুরুষ দ্বারা বিভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছিল তথাকথিত শাস্ত্রীয় বা ধর্মীয় বিধি বিধান, যার মধ্যেই নিহিত আছে রাজার ঐশ্বরীয় উৎপত্তির তত্ত্ব এবং সমাজে পুরুষের সার্বিক প্রভুত্ব ও নারীর সার্বিক হীনতার তত্ত্ব।

স্মৃতিশাস্ত্রের প্রধান প্রবক্তা মনু বলেছেন ঃ

"পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।

রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥"[১]

— স্ত্রীলোককে কুমারী অবস্থায় পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্যে পুত্র রক্ষা করবে, স্ত্রীলোক কখনও স্বাতন্ত্র্যলাভের যোগ্য নয়। আসলে ক্ষত্রিয়ের শাসনের রাজনীতিতে নারীকে সারাজীবন ধরে স্বাতন্ত্র্য লাভের অযোগ্য করে রাখাই ছিল ধর্মগুরুদের বিশেষ লক্ষ্য।

অবাঞ্ছিত শৈশব ও শিক্ষা

শাস্ত্রীয় বিধানে নারীপুরুষের বৈষম্য শুরু হয় জন্ম মুহূর্ত থেকে। হিন্দুধর্মের আকর গ্রন্থ বেদ-এ পুত্র-পৌত্রের জন্য শত সহস্রবার প্রার্থনা আছে। কিন্তু কন্যার জন্য প্রার্থনা নেই কোথাও। আজও শুধু কন্যার জন্য প্রার্থনা কি কেউ করেন? কন্যা ভ্রূণের হত্যা এখন অসংখ্য অবাঞ্ছিত কন্যাকে জন্ম নেবার অধিকার থেকেই বঞ্চিত করছে।

পিতৃতন্ত্রকে চিরায়ত করে রাখার প্রয়োজনেই কন্যাকে অবাঞ্ছিত করে রাখা অত্যাবশ্যক ছিল। শাসকগোষ্ঠী তাই তাদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধা ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকারদের দিয়ে কন্যাকে সর্বদা দুঃখকষ্টের কারণ বলে বর্ণনা করিয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলছে, 'পুত্র হল সর্বোচ্চ স্বর্গের প্রদীপ, আর কন্যা দুঃখের কারণ।'[২] পরবর্তীকালে ধর্মশাস্ত্রকে অবলম্বন করে রচিত মহাভারতের রাজকাহিনীতেও অনুরূপ উক্তি একাধিকবার আছে।[৩] পিতৃতন্ত্রকে কায়েমিভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখার রাজনৈতিক কূটনীতির ফলেই জন্মের পর থেকেই কন্যা সংসারে অনাদরণীয়া হয়ে পড়ে। অধিকাংশ স্থলে এখনও কন্যার শৈশব ও শিক্ষাও তাই অনাদরে এবং অবহেলায় কাটা অস্বাভাবিক নয়। ধর্ম মতে কন্যাসন্তানের সারাজীবনের ব্রতই হল বিবাহ দ্বারা পুত্রসন্তান উৎপন্ন করা।

কারণ পুরুষের ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারী রূপে এবং বংশ রক্ষার জন্য পুত্রের প্রয়োজন হয়। সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত কন্যা উত্তরাধিকারিণী রূপে স্বীকৃত না হওয়ায় সম্পত্তি রক্ষা ও বৃদ্ধির দায়িত্বও কন্যার উপর বর্তাতো না। ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনানুসারে কন্যাও পিতৃসম্পত্তির অংশীদার রূপে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও প্রাচীন রীতির ধারাবাহিকতার ফলে বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আজও কন্যাকে ফাঁকি দেওয়া হয়। ধর্মীয় অনুশাসনে নারীর জীবনের আদর্শই ছিল এবং এখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আছে, পুত্র প্রজননের দ্বারা স্বামীর সম্পত্তির সুরক্ষার ব্যবস্থা করা, এবং গৃহিণী রূপে পতিপুত্র সহ যৌথ পরিবারের আত্মীয়স্বজনের পরিচর্যা করে তাদের সকলকে সুখে শান্তিতে রাখা। এখনও ভারতীয় জনমানসে বালিকা শিশুর ভবিষ্যৎ ভাবমূর্তি হল পতিব্রতা স্ত্রী এবং বিশেষত স্নেহময়ী জননী রূপে। বিদুষী এবং গৃহের বাইরে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে সফল নারী রূপে নয়। কিন্তু মাতৃত্বের গগনস্পর্শী গরিমার আড়ালেই লুকিয়ে আছে পিতৃতন্ত্রের বুনিয়াদ আর নারী অবদমনের ইতিহাস। একদিকে মাতৃরূপে দেবীপূজা, আর অন্যদিকে মাতৃরূপা কন্যার জন্ম প্রতিরোধের চেষ্টা আমাদের ধর্মাশ্রিত বিকৃত সামাজিক মূল্যবোধেরই অন্যতম ফলশ্রুতি। যে কন্যার জন্মই অনাকাঙ্ক্ষিত, তার আহার, পুষ্টি ও শিক্ষারও অযত্ন থাকাই তো স্বাভাবিক।

বৈদিক ভারতে কিছু 'ব্রহ্মবাদিনী' শিক্ষিত নারীর উল্লেখ পাওয়া গেলেও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ 'সদ্যোবধূ' নারীদের শিক্ষার কথা কিছু পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে বিদেশী অনার্য ও বিধর্মীদের প্রভাব থেকে সমাজকে রক্ষা করার রাজনৈতিক প্রয়োজনে ধর্মশাস্ত্রের নুতন অনুশাসন অনুযায়ী নারীকে সম্পূর্ণরূপে গৃহাভ্যন্তরে আবদ্ধ করে ফেলা হয়। আর এই সময়ই মনু ঘোষণা করেন যে বেদপাঠে নারীর কোন অধিকার নেই, তারা মিথ্যার মতো অপবিত্র।[৪] মনুর ধর্মীয় বিধানে "নারীর পক্ষে বিবাহই হল উপনয়ন, পতিসেবা বেদাধ্যয়ন, আর পতিগৃহে বাস হল গুরুগৃহে বাস।"[৫] এভাবেই পুরুষতান্ত্রিক শাসনের রাজনীতিতে শুধু নারীর শিক্ষাই নয়, তার স্বাধীন জীবিকা এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথও সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করে ফেলা হয়। নারীকে বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে গৃহস্থালির মধ্যে পুরুষের পদানত করে রাখার ব্যবস্থা হয় পাকা।

মধ্যযুগে এদেশে তুর্কি-আফগান এবং মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে হিন্দু রাজা, সামন্ত, সমাজপতি এবং পুরোহিতকুলের এক রাজনৈতিক সংকট উপস্থিত

হয়। আর ধর্মকেন্দ্রিক এই রাজনৈতিক সংকটের কালে নারীকে সম্পূর্ণরূপে গৃহের মধ্যে বন্দি করে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় এই সময়ই নারীর পারিবারিক ও সমাজিক অবস্থানের আরও অবনতি ঘটে। নারীশিক্ষার দিক থেকেও এই কালটি ছিল ঘন অন্ধকারময়। এই সময়ে রচিত পুরাণগুলিতে পুরুষের প্রভুত্ব ও নারীর পরাধীনতার তত্ত্বটি নানা আখ্যান, উপাখ্যান, উপকথা, ব্রতকথা, ইত্যাদির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। সেই সনাতন ঐতিহ্যের ধারাকে বহন করে আজও শত শত নারী সতী-সাবিত্রী ব্রত, পুত্র কামনায় ব্রত, স্বামীপুত্রের কল্যাণের জন্য ব্রত প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে স্বামীপুত্রের সেবায় এবং সংসারের ঘূর্ণাবর্তে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ হয়ে আছেন। আর সেই সঙ্গে ভুলে আছেন তাদের অশিক্ষা এবং অসমান ও অপমানিত অস্তিত্বের কথা। আজ স্বামীপুত্রের জীবনই অধিকাংশ নারীর জীবন। নারীও বিশ্বাস করতে শিখেছেন যে তার স্বতন্ত্র কোন জীবন নেই, থাকতে পারে না।

বিবাহিত জীবনে নারী

নারীর প্রকৃত জীবনযাত্রা শুরু হয় বিবাহের পরে এবং সারাজীবনের মধ্যে বিবাহিত জীবনই হয় দীর্ঘতম। কিন্তু পুরুষতন্ত্রে শাসনশোষণের রাজনীতিতে শাস্ত্রকারদের নির্দেশে বিবাহ ব্যবস্থার মধ্যেই লুকানো আছে নারী পুরুষের বৈষম্যের প্রকরণ। পিতৃতান্ত্রিক শাসনের নিয়মে নারীকে তার বিবাহের পরেই স্বামী বা প্রভুর পরিবারে প্রবেশ করতে হয়। পুরুষ নারীর পরিবারে প্রবেশ করে না। আর শাস্ত্রীয় আইনের বিধানে প্রথম দিন থেকেই স্বামী হলেন গৃহের কর্তা, আর স্ত্রী স্বামীর অধীন। প্রাচীন শাস্ত্রীয় মন্ত্রকে অনুসরণ করে এখনও ধর্মমতে অনুষ্ঠিত বিবাহ সভায় বর বধূকে বলেন ঃ "ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু, মম চিত্তমনু চিত্তং তেহস্তু।" [৬] —আমার সেবায় তোমায় হৃদয় দান কর। তোমার চিত্ত আমার চিত্তকে অনুসরণ করুক। কিন্তু বধূকে দিয়ে এরকম কোন মন্ত্র উচ্চারণ করানো হয় না। মূলত স্বামী এবং স্ত্রীকে নিয়েই পরিবার গড়ে উঠলেও স্ত্রী পারিবারিক সম্পত্তির অংশীদার হন না, এবং এখনও স্বামীর মৃত্যুর পরে সেই সম্পত্তির পূর্ণ অধিকার স্ত্রীতে বর্তায় না। ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে পুত্রকন্যার সাথে স্ত্রীকে স্বামীর সম্পত্তির একজন উত্তরাধিকারিণী রূপে স্বীকার করা হলেও বাস্তবে এই আইনকে ফাঁকি দেওয়ার অনেক পথই আজও খোলা আছে। আর এখনও স্বামীর জীবিতাবস্থায় পারিবারিক সম্পত্তিতে স্ত্রীর আইনি অধিকার শূন্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ত্রী শুধু পারিবারিক

সম্পত্তির মালিকের অর্থাৎ স্বামীর ঘরণী, আর স্বামী কর্তৃক ভরণীয়া মাত্র। রামায়ণের রাজকাহিনীতে ধর্মশাস্ত্রে বর্ণিত নারীর পারিবারিক অবস্থানের আসল রূপটি প্রকটরূপে প্রকাশিত হয়েছে স্বয়ং রামের মুখে। রাজা দশরথের শর্ত রক্ষার্থে বনে যাওয়ার সময় রাম কৌশল্যাকে বলেছিলেন, "জননি! স্ত্রীলোক যতদিন জীবিত থাকে ততদিনই ভর্তা উহার দেবতা ও প্রভু। মাত! সেই বৃদ্ধ রাজার হিতসাধন করা আপনার বিধেয়। যে নারী ব্রতোপবাসশীল হইয়া ভর্তৃসেবা না করে তাহার অধোগতি লাভ হয়, ভর্তৃসেবা করিলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। ... মহারাজ [দশরথ] আমাদিগের পিতা, আমাদিগের উপর তাহার সর্বাঙ্গীন প্রভুতা আছে। এইরূপ অবস্থায় তাহার আজ্ঞাক্রমে দেবীও (কৌশল্যা) অন্য অনাথা স্ত্রীলোকের ন্যায় ... এই স্থান হইতে বহিস্কৃত হইতে পারেন।[৭] অর্থাৎ পারিবারিক জীবনে স্ত্রীর কোন স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা থাকতে নেই। থাকতে দেওয়া হয় না। আর পারিবারিক জীবনে নারী পুরুষ সম্পর্কের এই রূপটিই প্রতিফলিত হয় আমাদের সমাজ জীবনে, যেখানে আজও সর্বত্রই নারীর অবস্থান পুরুষের নীচে।

বিবাহিত নারী পুরুষ উভয়েই গার্হস্থ্যজীবন যাপন করেন। কিন্তু সেখানেও নারীর স্থানটি নির্দিষ্ট আছে পুরুষের নীচে। গৃহিণী রূপে সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালন থেকে শুরু করে স্বামীপুত্র সহ সকল আত্মীয় স্বজনের আহার বিহার, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা, এবং তদুপরি রোগেশোকে তাদের শুশ্রূষা করার যাবতীয় দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে নারীর উপর। ধর্মীয় রাজনীতিতে বিশেষজ্ঞ পুরুষ পণ্ডিতেরা স্ত্রীর গার্হস্থ্যজীবনের প্রধান অংশীদার গৃহপতিকে কোন গৃহকর্মের দায়িত্ব দেন নি। সন্তান প্রতিপালনের জন্য মূলত ধাত্রীর দায়িত্বও স্ত্রীর একার। এ ব্যাপারে পিতার কোন দায় নেই। আর মনু বলেছেন— " অন্নপাক কারণে এবং গৃহোপকরণের পর্যবেক্ষণে সর্বদা স্ত্রীজাতিকে নিয়োজিত রাখা কর্তব্য।"[৮] তা না হলে পরিবারের পুরুষগণের আহার ও অন্যান্য সুখ সুবিধার ব্যবস্থা হবে কিভাবে? মনুর বিধানে গৃহিণীর উচিত গৃহস্থালির কাজকর্মে চতুর হওয়া, প্রফুল্ল চিত্তে বাড়িঘর পরিষ্কার করা এবং যত্নের সঙ্গে বাসনপত্র মাজা।[৯] গৃহিণীর অসময়ে ঘুমোবার, গৃহের বাইরে ঘোরাফেরা করবার এবং অন্যলোকের গৃহে গিয়ে থাকবার (তা পিতৃগৃহ হলেও) কোন অধিকার নেই।[১০] অর্থাৎ বিবাহিতা নারীর দায়িত্ব হল বর্হির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরিবারস্থ সকলের সুখশান্তি বিধানের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করা। বর্তমানেও অধিকাংশ নারীর জীবন কাটে গৃহের চার দেওয়ালের মধ্যে, বিশেষত "অন্নপাক কারণে" রান্নাঘরে।

শাস্ত্রনির্দিষ্ট এই স্থানটি বর্তমানে চাকুরিরতা নারীদের পক্ষেও সমানভাবে প্রযোজ্য। একথা বিস্ময়কর হলেও সত্য যে আজ একুশ শতকের উত্তর আধুনিকতার যুগেও অধিকাংশ নারীর জীবন কাটে সংসারের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে। এ জীবনটা ভালো না মন্দ তা বোঝবার মতো অবসরই তাদের থাকে না। স্বাধীন ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথও থাকে রুদ্ধ। তার ফলে স্বাভাবিক কারণেই থাকে না পারিবারিক বা সামাজিক কোন প্রতিষ্ঠা। অপরদিকে গৃহকর্তরা দৈনন্দিন পারিবারিক দায় দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকেন, নারীর উপর আধিপত্য করেন, আর সেই সঙ্গে বহির্জগতে প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের পথটিও তাদের জন্য খোলা থাকে।

স্বামীকে ঘিরেই অতিবাহিত হয় নারীর জীবন। স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথেই আজও শেষ হয়ে যায় অধিকাংশ নারীর গার্হস্থ্যকাল। ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন (Hindu Women Remarriage Act, 1856) পাশ হওয়া সত্ত্বেও শাস্ত্রীয় অনুশাসন এবং এই অনুশাসনকে জড়িয়ে ধর্মীয় কুসংস্কার এবং নানা আর্থসামাজিক কারণের জন্য বিধবা বিবাহ এখনও ব্যতিক্রমী ঘটনার মধ্যে পড়ে। পুরুষ শাসিত ধর্মাশ্রিত সমাজে অনেক রূপ কানোয়ারকে এখনও 'সতী' হতে হয়। আর কিছু মৌলবাদী রাজনৈতিক শক্তি নারীর এই আত্মাহুতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন। বিপরীতে ১৯৫৫ সালে পুরুষের একাধিক বিবাহ আইনত নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এখনও পুরুষের একাধিক স্ত্রী নিয়ে সমাজ সংসার এত বিচলিত নয়। এ বিষয়ে শাস্ত্রভিত্তিক আইনও নারীকে সুবিচার দিতে ব্যর্থ হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত সারাজীবনই নারী পুরুষের পারিবারিক ও সামাজিক অসমান অবস্থান বিদ্যমান। যুগযুগান্তর ধরে নারীর প্রতি ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক নীতির ফলেই সাধারণ নারীর স্থান আজ আর্থসামাজিক কাঠামোর নিম্নস্তরে। আর তপশিলী জাতি/উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর (ও বি সি), অর্থাৎ নিম্নবর্গের নারীর অবস্থান সাধারণ নারীদের অপেক্ষাও নিম্ন স্তরে।

শূদ্র ও নারী

ইতিহাল বলে যে এদেশের ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণ জোটশক্তি নিজেদের কায়েমি স্বার্থ চরিতার্থে তথাকথিত বৈশ্য এবং শূদ্র বর্ণকে ধর্মের নামে বংশ পরম্পরায় কৃষি এবং শিল্পশ্রমিকে পরিণত করেছে, আর নিজেরা ভোগ করছে উদ্বৃত্ত সম্পদ। চারটি

বর্ণের বাইরেও সামাজিক প্রয়োজনে সৃষ্ট হয়েছিল 'পঞ্চম' বর্ণ রূপে তথাকথিত অতিশূদ্র, অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ দলিতরা। এদের কাজ ছিল বর্জ্য ও ত্যক্ত পদার্থের যথোপযুক্ত ব্যবহার, মৃতদেহের সৎকার, বধ্যবক্তিকে বধ এবং রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা প্রভৃতি অশুচি, "অপবিত্র এবং ঘৃণ্য" কাজগুলি সম্পাদন করা। এর বাইরেও ছিলেন আর্য-অনার্য সংঘাতের কালে পাহাড়ে, জঙ্গলে, সমুদ্রোপকূলে পলাতক এদেশের আদিবাসীরা। প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর নিরিখে এরা সকলেই পরিচিত ছিলেন শূদ্র বা অবর্ণ নামে। জনসংখ্যা এবং অর্থনৈতিক কার্যাবলী বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমশ পুরুষানুক্রমে জন্মগত বর্ণভেদ ও শ্রেণীভেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক জটিল আকার ধারণ করে। সাধারণভাবে মুষ্টিমেয় বর্ণহিন্দুরা (উচ্চবর্ণ হিন্দু) ধনী শ্রেণীতে পরিণত হয়। আর অসংখ্য নিম্নবর্ণের (অবর্ণ) মানুষকে ঠেলে দেওয়া হয় আর্থসামাজিক পিরামিডের নীচের তলায়। এখনও এ ব্যবস্থা প্রায় অপরিবর্তিত আছে।

১৯৮০ সালে মণ্ডল কমিশন সামাজিক শিক্ষাগত এবং অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর জনগণকে অর্থাৎ প্রাচীন ভারতে বর্ণিত শূদ্রকে তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি এবং অন্যান্য (হিন্দু এবং অ-হিন্দু) অনগ্রসর শ্রেণী রূপে ভাগ করেছিলেন। আর এই বিপুল জনজাতির (৭৫ শতাংশ) অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার উৎপত্তিস্থল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মণ্ডল কমিশন-এ বলা হয় ঃ

"It was the all-pervasive tyranny of the caste system which kept the lower castes socially backward and economically poor. The poverty of these castes stemmed from their social discrimination and they did not become socially backward because of their poverty. In view of this, historical and sociological evidence does not support the view that, in the ultimate analysis, social backwardness is the 'result of poverty to a great extent.' In fact, it is just the other way around."[১১]

অর্থাৎ দারিদ্রের ফলে এইসব নিম্নবর্গের মানুষ সামাজিকভাবে অনগ্রসর হয়নি, বরং সামাজিক বৈষম্যের ফলে অনগ্রসরতাই এদের দরিদ্র শ্রেণীতে পরিণত করেছে। বহু সংখ্যক গবেষণা থেকেও এই সত্যই প্রমাণিত হয়েছে যে তপশিলী জাতি/উপজাতি এবং ওবিসি শ্রেণীর মানুষরাই জাতিবর্ণ এবং শ্রেণী দুদিক থেকেই আর্থসামাজিক

পিরামিডের তলদেশে বাস করছেন আজও। জাতিবর্ণ ও শ্রেণী পরস্পরের সাথে এমনভাবে মিশে আছে যে একটি থেকে অপরটিকে আলাদা করা প্রায় দুঃসাধ্য।

এদেশের রাজণ্যবর্গ, সামন্ত ও সমাজপতিরা ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকারদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধে জাতিবর্ণ ও শ্রেণী ভিত্তিক যে আর্থসামাজিক পিরামিড গড়ে তুলেছিলেন, তার তলদেশেই নির্ধারিত ছিল সব বর্ণের নারী এবং শূদ্রের স্থান। এই সমাজ বিন্যাসে নারীকে সর্বত্র শূদ্রের সাথে তুলনা করা হয়েছে। শতপথ ব্রাহ্মণে নারীকে শুধু শূদ্র নয়, কুকুর ও কালো পাখির (কাক) সঙ্গে তুলনা করে সবাইকে 'অনৃত' বা মিথ্যা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। চাতুর্বর্ণ্য প্রথার ঐশ্বরীয় উৎপত্তি প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে ভগবদ্‌গীতায় 'শ্রীভগবান'-এর মুখ দিয়েই বলানো হয়েছে যে তিনি নিজেই ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্র, এই চারবর্ণকে সৃষ্টি করেছেন। আর একথা বলানোর সময় তাকে দিয়ে আরও বলানো হয়েছে যে বৈশ্য, শূদ্র এবং নারী প্রভৃতি "পাপযোনি"রা তাকে আশ্রয় করেই পরমগতি লাভ করে। অর্থাৎ বৈশ্য, শূদ্র এবং নারী, এরা সবাই একস্থানীয় এবং পাপী। পরবর্তীকালের বায়ুপুরাণেও অনুরূপ বক্তব্য আছে।[১২] ধর্মশাস্ত্রের যুগে মনু শূদ্র এবং নারী উভয়ের জন্যই বেদপাঠ নিষিদ্ধ করে এদের শিক্ষার পথকে রুদ্ধ করার সাথে সাথে যাগযজ্ঞ ভিত্তিক ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড থেকেও এদের বঞ্চিত করেছিলেন। শূদ্র এবং নারীর জন্য নির্দিষ্ট ছিল এবং এখনও আছে, কিছু নিম্নস্তরের পূজা ও ব্রত। শূদ্র এবং সব বর্ণের নারীকে শাসন শোষণ ও অবদমিত করে রাখার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল যজ্ঞ ভিত্তিক ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ থেকে তাদের দূরে রাখা। কিন্তু শূদ্র এবং নারীকে দাসত্বের মধ্যে রাখার সর্বশেষ এবং সর্বপ্রধান উপায়টি ছিল এদের উভয়কেই আর্থিক দিক থেকে নিঃস্ব করে দরিদ্র শ্রেণীতে পরিণত করে রাখা। মনু এবং মহাভারতে ভীষ্মের অনুশাসন অনুযায়ী শূদ্র এবং নারীর ধন সঞ্চয় করার কোন অধিকার ছিল না। ভার্যা এবং দাস (শূদ্র) কোন ধন উপার্জন করলেও সে ধনে তাদের নিজস্ব কোন অধিকার স্বীকার করা হতো না। ভার্যা এবং দাস-এর অর্জিত ধনে অধিকার থাকতো শুধু তাদের প্রভুর, অর্থাৎ গৃহস্বামীর।[১৩] শূদ্রের যেমন একমাত্র কাজ ছিল উচ্চতর তিন বর্ণের সেবা করা, সব বর্ণের নারীরও তেমনি কাজ ছিল পরিবারস্থ সকলের সেবা করা। সেই ধারাবাহিকতার ফলেই শূদ্র (বর্তমানের তপশিলী জাতি/উপজাতি, ওবিসি) এবং সব বর্ণের নারী এখনও দরিদ্র শ্রেণীতে পরিণত হয়ে আছে।

সংবিধানের ১৬(৪) ধারা অনুযায়ী অনুন্নত শ্রেণীর সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্য ১৯৫৩

সালে গঠিত কাকা কালেলকার কমিশন-এর (ফার্স্ট ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস কমিশন) ১৯৫৫ সালের রিপোর্টে সমগ্র নারী সমাজকে অনুন্নত শ্রেণীরূপে উল্লেখ করা হয়। পরে মণ্ডল কমিশন-এর সুপারিশ অনুযায়ী যখন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগতভাবে অনুন্নত গোষ্ঠীকেই অনুন্নত বা অনগ্রসর শ্রেণীরূপে নির্ধারণ করা হয়, তখনও নারীরা অনগ্রসর শ্রেণীর মধ্যেই পড়ে। কারণ শিক্ষায়, অর্থনৈতিকভাবে এবং সামাজিক মর্যাদায় নারীরা (ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া) আজও অনগ্রসর। সমস্ত সরকারি বেসরকারি নথিপত্রে এখনও তপশিলী জাতি/উপজাতি, ওবিসি শ্রেণীর মানুষ এবং নারীকে একসঙ্গে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করা হয়। অর্থাৎ নারীমাত্রই তপশিলী জাতি/উপজাতি এবং অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের সাথে তুলনীয়।

নিম্নবর্গের নারী

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে শাসন শোষণ এবং বঞ্চনার ধর্মীয় রাজনীতিতে সাধারণভাবে সব নারীই শূদ্রের মতো আর্থসামাজিক হীনস্থানে অবস্থিত এবং দুর্বল শ্রেণীতে পরিণত হলেও দরিদ্র তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি (আদিবাসী) এবং ওবিসি (নিম্নবর্গ) নারীর অবস্থান উচ্চবর্ণ তথা উচ্চ ও মধ্যবিত্ত (উচ্চবর্গ) নারীর সাথে সম্পূর্ণ এক নয়। প্রাচীন ভারতেও শূদ্র, আদিবাসী এবং অনগ্রসর শ্রেণীর নারীরা শিক্ষায়, অর্থনৈতিক পেশায় এবং সামাজিক মর্যাদায় সম্পূর্ণ আলাদা এবং পিছিয়ে পড়া জগতের বাসিন্দা ছিলেন। আজও তার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। ভারতীয় রাজনীতিতে নারীর অবস্থানের আলোচনার প্রয়োজনে উচ্চ এবং নিম্ন, এই দুই বর্গের নারীর আর্থসামাজিক অবস্থানের বিভিন্নতা জানাও একান্ত জরুরি।

শিক্ষা

শিক্ষার অনগ্রসরতাই নারীর আর্থসামাজিক অনগ্রসরতার প্রধান কারণ। সদ্য প্রকাশিত ২০০১ সালের সেনসাস অনুযায়ী ভারতে গড় শিক্ষিত মানুষের হার ৬৫.৩৮ শতাংশ। আর পুরুষ ও নারী শিক্ষার হার যথাক্রমে ৭৫.৯৬ শতাংশ এবং ৫৪.২৮ শতাংশ। ১৯৯১ সালের সেনসাসে পুরুষ এবং নারী শিক্ষার গড় হার ছিল যথাক্রমে ৬৪.২০ শতাংশ এবং ৩৯.১৯ শতাংশ। কিন্তু সাধারণ নারীশিক্ষার এই গড় হারের মধ্যে তপশিলী জাতি/উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর নারীর আরও নিম্ন শিক্ষার হারটি হারিয়ে যায়। বহুদিনের নির্মম বঞ্চনা ও উপেক্ষার ফলে

স্বাভাবিকভাবেই বর্ণহিন্দু মানুষের তুলনায় অবর্ণদের শিক্ষার হার অনেক কম। আর একথা মহিলাদের ক্ষেত্রেই আরও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ২০০১ সালের সেনসাসের বিস্তারিত তথ্য এখনও সুলভ নয়। তবে সারণি-১এ দেখা যাচ্ছে যে ১৯৭১, ১৯৮১ এবং ১৯৯১, এই তিনটি সেনসাস রিপোর্টেই সাধারণ নারীশিক্ষার হার ছিল সর্বোচ্চ (যথাক্রমে ২২.৫, ২৯.৪৩ এবং ৩৯.০ শতাংশ), তপশিলী জাতি নারীশিক্ষার হার ছিল মাঝামাঝি (যথাক্রমে ৬.৪৪, ১০.৮৩ এবং ২৩.৭৬ শতাংশ), আর তপশিলী

সারণি – ১

তপশিলী জাতি, আদিবাসী এবং সাধারণ নারীশিক্ষার হার

১৯৭১, ১৯৮১, এবং ১৯৯১

	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১
তপশিলী জাতি	৬.৪৪	১০.৮৩	২৩.৭৬
আদিবাসী (তপশিলী উপজাতি)	৪.৮৫	৮.০৪	১৮.১৯
সাধারণ	২২.২৫	২৯.৪৩	৩৯.০০

সূত্র ঃ ১৯৭১ এবং ১৯৮১ সাল ঃ *Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes*, 1986-87, p. 293 ; ১৯৯১ সাল ঃ *Census of India,* 1991, Series - 1, Paper of 1993.

উপজাতি নারীশিক্ষার হার ছিল সর্বনিম্ন (যথাক্রমে ৪.৮৫, ৮.০৪ এবং ১৮.১৯ শতাংশ)। অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা এগিয়ে আছেন সাধারণ নারীরা, আর সর্বনিম্ন স্তরে আছেন তপশিলী উপজাতি বা আদিবাসী নারীরা।

বর্তমান ভারতে নারীশিক্ষার এই চিত্র নারী অবদমনের রাজনীতি ও সংস্কৃতিরই প্রতিফলন। সুদূর অতীতে আর্য-অনার্য সংমিশ্রণের ফলে মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন নারী শিক্ষায় উৎকর্ষ লাভ করেছিলেন, তারা সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণ বংশীয়। যদিও ব্রাহ্মণ বংশীয় অধিকাংশ নারীও ছিলেন বিদ্যাচর্চায় অনগ্রসর। কিন্তু নীচের তলার অগণিত শূদ্র, যারা নানাভাবে সমাজের আর্থিক বিন্যাসকে সুরক্ষিত করতেন, তাদের এবং তাদের কন্যাদের শিক্ষার কোন সুযোগই ছিল না। শূদ্রদের জন্য শিক্ষার আকর গ্রন্থ বেদ শুধু পাঠ করাই নয়, বেদপাঠ শোনাও অপরাধ বলে গণ্য হওয়ায় শূদ্রবর্ণের

মানুষেরা, বিশেষত নারীরা, শিক্ষায় ছিলেন সর্বাপেক্ষা বঞ্চিত। ধর্মীয় রাজনীতির এরাই ছিলেন প্রধানতম শিকার।

উনিশ শতকের ধর্মসংস্কার এবং নবজাগরণের আলোকে যেসব মহান ব্যক্তিরা অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে এবং শূদ্রবর্ণের নারীশিক্ষার পথ উন্মুক্ত করতে এগিয়ে এসেছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন পুনের জোতিবা ফুলে। জোতিবা গোবিন্দরাও ফুলেকেই সম্ভবত নিম্নবর্গের নারীশিক্ষার জনক বলা যায়। কিন্তু যে সমাজ ব্যবস্থায় অস্পৃশ্য পুরুষদেরই শিক্ষার কোন সুযোগ ছিল না, সেখানে অস্পৃশ্য নারীদের শিক্ষার কথা ছিল সম্পূর্ণ অবান্তর। ভারত সরকারের দ্য কমিটি অন দ্য স্টেটাস অফ উইমেন-এর রিপোর্ট অনুসারে "Only a few thousand girls mostly belonging to urban upper and middle class families entered the formal system of education between 1850 and 1870." [১৪]

দেশের স্বাধীনতা, সংবিধান এবং জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণের ফলে সব বালক-বালিকার শিক্ষার পথ প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু গত ৫ দশকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা বিস্তারের বিষয়ে সম্ভবত সবচেয়ে বড় ত্রুটি ছিল বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের অসমতা। আশির দশকের প্রথমে একটি সরকারি রিপোর্টে এ বিষয়ে বলা হয়েছে, "There is still a wide gap between these communities (SCs and STs) and the rest of the population... The problem is especially more acute among a sizeable population of the communities living below the poverty line, and engaged mostly as agricultural labourers, collectors of minor forest produce, subsistence farmers and artisans."[১৫] দরিদ্র এই জনগোষ্ঠীর প্রতি রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসীন শাসকগোষ্ঠীর উপেক্ষাই এর প্রকৃত কারণ। অষ্টম পরিকল্পনার (১৯৯২-১৯৯৭) শুরুতে সারাভারতে মোট ৯১.৪৮ লক্ষ বালিকা এবং ১০৩.০৩ লক্ষ বালক নিম্নস্তরের (১-৮ শ্রেণী) শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং মোট ২৬৫.৬২ লক্ষ প্রাপ্ত বয়স্ক নরনারীকে সাক্ষর করা হয়েছিল।[১৬] আর তপশিলী জাতি/উপজাতি বালক বালিকাদের বিষয়ে এই পরিকল্পনার শেষের দিকে দ্য ন্যাশনাল পার্সপেকটিভ প্ল্যান বলেছে, "In the VI-VIII classes, 61.9% of girls in the general population are enrolled, whereas among the Scheduled Castes the proportion is only 29.9%"[১৭] নবম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায়

(১৯৯৭-২০০০) জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সব বালক-বালিকার শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করার নীতি সত্ত্বেও অসংখ্য বালক এবং বিশেষত বালিকা অশিক্ষার অন্ধকার থেকে মুক্ত হতে পারেনি। আর এই নিরক্ষর বালক-বালিকাদের মধ্যে তপশিলী জাতি/উপজাতি সহ সব নিম্নবর্গের বালিকার সংখ্যাই যে বেশি, তা সহজেই অনুমেয়। অনেক সময় গ্রামাঞ্চলে এবং শহরাঞ্চলেও নিম্নবর্গের পরিবারে পুত্রকন্যারা বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ায় সুযোগ পেয়েও শেষ পর্যন্ত, এমন কি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত, পড়াশুনা চালিয়ে যেতে অপারগ হয়। আর এদের মধ্যে কন্যার সংখ্যাই অধিক।

সন্দেহ নেই যে গত চার পাঁচ দশকে বেশ কিছু নারী শুধু সাধারণ উচ্চশিক্ষায়ই নয়, সেই সঙ্গে বিজ্ঞান, কারিগরি, আইন, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং, ব্যবসা পরিচালনা প্রভৃতি নানা বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেছেন। কিন্তু এরা প্রায় সকলেই উচ্চ কিংবা উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারভুক্ত। এ পর্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিক স্তরকে অতিক্রম করে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে উঠে আসা নিম্নবর্গের ছাত্রীর সংখ্যা যে নগণ্য, তা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে মুষ্টিমেয় কিছু নারীর উচ্চশিক্ষা অপেক্ষা সব নারীর অন্তত প্রাথমিক শিক্ষাই বেশী জরুরি। তাছাড়া, নিম্নবর্গের নারীদের আর্থিক স্বনির্ভরতার উদ্দেশ্যে যে কোন রকম বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জন্যও প্রাথমিক শিক্ষারই প্রয়োজন বেশি।

অর্থকরী পেশা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং দেশবিভাগের ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকট গত ৫০-৬০ বছরে কিছু উচ্চ ও মধ্যবর্গের নারীকে বিভিন্ন অর্থকরী পেশাতে টেনে এনেছে। দেশের স্বাধীনতাও সে সুযোগ এবং পরিবেশ তৈরী করতে অনেকখানি সাহায্য করেছে। সাম্প্রতিককালে এসব পরিবারের নারীরা শিক্ষাক্ষেত্র, চিকিৎসাক্ষেত্র, সরকারি ও বেসরকারি অফিস, আদালত, এমন কী উচ্চতর বিজ্ঞানের জগতকেও বেছে নিয়েছেন নিজেদের পেশা হিসেবে। উচ্চবর্গের কন্যারা শৈশব থেকেই শিক্ষা ও অন্যান্য ব্যাপারে পরিবারের মধ্যে যে বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন, প্রধানত তারই ফলশ্রুতি রূপে অর্থকরী বৃত্তিতেও এরা বিশেষ সুবিধাভোগী। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উপযুক্ত সামাজিক মর্যাদাও এরা পেতে শুরু করেছেন। কিন্তু এদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিম্নবর্গের নারীর বিরাট উৎপাদনশীলতা আজও

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই থাকে অলক্ষিত এবং উপেক্ষিত। অসংগঠিত অর্থনীতিতে নারীর অন্যতম ভূমিকা হল কৃষিতে। কিন্তু নারী কৃষি শ্রমিকদের অধিকাংশই হলেন তপশিলী জাতি/ উপজাতিভুক্ত। অনেক রাজ্যেই মধ্য এবং উচ্চবর্গের নারীরা কৃষি কাজের সাথে যুক্ত থাকলেও তারা সাধারণত মাঠে গিয়ে কাজ করেন না। চাষের কাজের জন্য প্রয়োজনে নিম্নবর্গের নারী শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। সেক্ষেত্রেও পুরুষ শ্রমিক অপেক্ষা নারী শ্রমিকের মজুরি হয় অনেক কম। তাছাড়া, অধিকাংশ নারী শ্রমিকের কাজও হয় অনিশ্চিত এবং অনিয়মিত। অনেকসময় চাষী পরিবারের পুরুষরা বিকল্প কাজে শহরাঞ্চলে নিযুক্ত থাকলে নারীরাই চাষ-আবাদ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। কিন্তু সেখানেও কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তাদের থাকে না। সিদ্ধান্ত নেন গৃহকর্তা নিজে। সংগঠিত ক্ষেত্রে শিল্পকারখানা, খনি এবং প্ল্যান্টেশন-এও সাধারণত তপশিলী জাতি/ উপজাতি নারী শ্রমিকেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লক্ষিত হয়। অন্যবর্গের নারীর ভূমিকা এসব ক্ষেত্রে প্রায় শূন্য। শিল্পকারখানার মালিকগণ সর্বোচ্চ মুনাফার স্বার্থে নারী শ্রমিকদের নিযুক্ত রাখেন শ্রম নিবিড় বিভাগে, যেখানে মজুরি হয় অপেক্ষাকৃত কম। আর নিয়োগের ব্যাপারেও নারীরা কর্তৃপক্ষের বৈষম্যমূলক ও দ্বিচারিতার শিকার হন। যন্ত্রায়নের খাড়াও প্রথমেই নেমে আসে নারী শ্রমিকের উপর।

অসংগঠিত অর্থনীতিতেও অসংখ্য গৃহভিত্তিক শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে নিম্নবর্গের নারীরা, বিশেষত তপশিলী জাতি ও আদিবাসী মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন সেই প্রাচীনকাল থেকে। আজও তার বিরাম নেই। এগুলির মধ্যে প্রধান হল দেশি, বিদেশি বাজারের জন্য তাঁত বস্ত্র, বিভিন্ন তৈরী পোশাক, বিড়ি, বাঁশ ও বেতের তৈরী নানা দৃষ্টিনন্দন গৃহোপকরণ, ধূপকাঠি, নানাবিধ ফলজাত দ্রব্য, আচার, পাঁপড়, প্রভৃতি। নিম্নবর্গের নারীরাই বহুবিধ শিল্পদ্রব্যকে পুরুষানুক্রমে বাঁচিয়ে রেখেছেন অসীম ধৈর্য, নিষ্ঠা ও সময় দিয়ে, আর সেই সঙ্গে দেশের অর্থনীতিরও সুরক্ষা করে চলেছেন। কিন্তু এরাই হলেন দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতম।[১৮]

প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ্য যে নিম্নবর্গের নারীর নিজস্ব উপার্জনের উপর এদের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে না। উপার্জনের বেশির ভাগ অর্থই যুক্ত হয় পারিবারিক আয়ের সাথে। সাধারণত দেখা যায় পরিবার যত দরিদ্র হয়, নারীর আয়ের তত বেশি অংশ ব্যয়িত হয় পরিবারের জন্য। অনেক সময় আবার এসব পরিবারে নারীর উপার্জিত অর্থের অনেকখানি ব্যয়িত হয় স্বামীর নেশার খরচ মেটাতে। বিপরীতে মধ্য এবং বিশেষত

উচ্চবর্গের নারীর নিজস্ব আয়ের উপর কর্তৃত্ব থাকে অনেক বেশী। এদের আয়ের অধিকাশংই সঞ্চিত হয়, অথবা ব্যয়িত হয় নিজেদের বিলাসিতার কারণে। আরও উল্লেখ্য যে আহার, পুষ্টি এবং চিকিৎসার ব্যাপারেও সাধারণত সব নারীই পুরুষের তুলনায় অবহেলিত হলেও নিম্নবর্গের নারীরাই এ বিষয়ে বিশেষভাবে বঞ্চিত। আর প্রাচীন ধারা বহন করে উচ্চ এবং নিম্নবর্গ নির্বিশেষে সব পরিবারেই এখনও নারীর নিঃশর্ত অভিভাবক হলেন স্বামী বা পরিবারের কর্তা। তিনিই নারীর বাসস্থান তথা আশ্রয়স্থলের মালিক। তাই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মালিকও তিনিই। তবে এ বিষয়ে নিম্নবর্গের নারীর অবস্থানই অনেক বেশি শোচনীয়।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে নারীর প্রতি সামাজিক অবিচারের শুরু হয় তার জন্ম মুহূর্ত থেকে, আর চলে সারাজীবন ধরে, নানা পর্যায়ে, নানাভাবে। অবহমানকাল থেকে এদেশের শাসক-শোষক শ্রেণী রাজনৈতিক কূটনীতির দ্বারা ইচ্ছাপূর্বক নারীর শিক্ষা ও স্বাধীন জীবিকার পথকে রুদ্ধ করে পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষমতা থেকে নারীকে বঞ্চিত করে রেখেছে। নারীশক্তিকে করে রেখেছে অবদমিত। আজও তার উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন ঘটেনি। নারী পুরুষের সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রণীত আধুনিক আইনগুলিও প্রধানত ধর্মীয় অনুশাসনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠার ফলে নারীকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুবিচার দিতে পারে না। অন্যদিকে গৃহস্বামীরা চিরদিন পরিবারের মধ্যেই শুধু প্রাধান্য ও আধিপত্য করেন নি, বাইরে বৃহত্তর সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রাধান্য ও আধিপত্য বিস্তার করার সময় এবং সুযোগ পেয়েছেন প্রচুর। এখনও সেই প্রবণতাই লক্ষিত হয় প্রায় সর্বত্র। আর নারী চিরদিন অবদমিত ও বঞ্চিত হয়ে থাকার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা স্বাধীনভাবে কাজ করার মতো আত্মপ্রত্যয় খুঁজে পান না আজও। পুরুষতান্ত্রিক শাসনের মূল প্রকরণগুলির এখনও বিশেষ কোন পার্থক্য ঘটেনি। আর এ বিষয়ে নিম্নবর্গের নারীরাই বিশেষ অসুবিধাভোগী। তারাই ঘরে এবং বাইরে বিশেষভাবে নির্যাতিত ও শোষিত। নিম্নবর্গের নারীরা শুধু নারীপুরুষ বৈষম্যেরই শিকার নন। সেই সঙ্গে আবার জাতিবর্ণ ও শ্রেণী বৈষম্যেরও শিকার।

সনাতন এই ঐতিহ্য নিয়ে আমরা ভারতীয়রা এতই গর্বিত যে আজ একুশ শতকের উত্তর আধুনিকতার সাথে বহুযুগের লালিত যুক্তিহীনতা ও ধর্মান্ধতার এক অদ্ভুত সমন্বয় সাধনের প্রয়াস চলেছে সর্বত্র। ধর্মমোহ থেকে আজও আমরা মুক্তির উপায় খুঁজে পাচ্ছি না। মার্কসবাদ বলে, ধর্ম হল আফিম যা মানুষকে অচেতন করে

রাখে। আর রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এ পর্যন্ত দেখা গেছে, যে রাজা প্রজাকে দাস করে রাখতে চেয়েছে, সে রাজার সর্বপ্রধান সহায় সেই ধর্ম যা মানুষকে অন্ধ করে রাখে। সে ধর্ম বিষকন্যার মতো ঃ আলিঙ্গন করে সে মুগ্ধ করে, মুগ্ধ করে সে মারে। শক্তিশেলের চেয়ে ভক্তিশেল গভীরতর মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে। কেননা তার মার আরামের মার।"[১৯] প্রাচীনকাল থেকে এদেশে শাসকগোষ্ঠীর ধর্মীয় রাজনীতির প্রয়োগ দ্বারাই নির্ধারিত হয়েছে, এবং এখনও অধিকাংশ ক্ষেত্রে হচ্ছে, সমাজের সর্বস্তরে নারীপুরুষের অসম অবস্থান। আর নারীপুরুষের এই অসম আর্থসামাজিক অবস্থানই অনেক রাজনৈতিক দ্বন্দ্বেরও মূল কারণ রূপে দেখা দিচ্ছে।

যে নারীশক্তিকে চিরদিন অবদমিত করে রাখা হয়েছে, যে নারীরা আজও আর্থসামাজিক কাঠামোর তলদেশে অবস্থান করছেন, দেশের রাজনীতিতে তাদের উচ্চমানের অবস্থান আশা করা যায় কি? সাধারণভাবে রাজনীতিতেও নারীর আর্থসামাজিক অবস্থানের প্রতিফলন ঘটাই তো স্বাভাবিক। পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে দেশের স্বাধীনতার কাল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত রাজনীতির বিভিন্ন স্তরে নারীর অবদান, অবস্থান, বিশেষ বিশেষ সময়ে রাজনীতিকে কেন্দ্র করে নারীশক্তির জাগরণ এবং ক্ষমতায়নের বিষয়ে আলোচনা করা হবে। এই আলোচনাতেই নারীর আর্থসামাজিক অবস্থানের সাথে রাজনৈতিক অবস্থানের সাযুজ্য ফুটে উঠবে।

পাদটীকা

(১) *মনুস্মৃতি*, পঞ্চানন তর্করত্ন, অনূদিত ও সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার। কলকাতা, ১৯৯৩ সংস্করণ, ৯/৩।

(২) *Aitareya Brahmana*, VII/III/iii/13. Translated by A. B Keith, Motilal Banarasidass, Harvard University Press, Vol. 25, p. 300

(৩) *বেদব্যাসী মহাভারত*, কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৮৫ সংস্করণ - ১/৫৯ ; ১২/২৪৩।

(৪) *মনুস্মৃতি*, ঐ, ৯ / ১৮

(৫) *ঐ*, ২/৫৭

(৬) *পুরোহিত দর্পণ*, পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন সংকলিত সত্যনারায়ণ লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৯৩, অস্টত্রিংশ সংস্করণ, পৃ. ২৩৪

(৭) *বাল্মীকি রামায়ণ*, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনূদিত, রিফ্লেক্ট পাবিলিকেশন, কলকাতা, ১৯৮৪ সংস্করণ, ২/১১।

(৮) *মনুস্মৃতি*, ঐ , ৯/১১

(৯) *ঐ*, ৫/১৫০

(১০) *ঐ*, ৯/১৩

(১১) *Report of the Backward Classes Commission (Mondal Commission)*, Government of India, New Delhi. 1980, Part 1, Vol 1, p 30.

(১২) *বায়ুপুরাণ*, ৩০ অধ্যায়, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৬।

(১৩) *মনুস্মৃতি*, ঐ , ৮/৪১৬ ; বেদব্যাসী মহাভারত, ঐ, ১/৮২।

(১৪) *Towards Equality · Report of the Committee on the Status of Women in India*, Government of India. Ministry of Education and Social Welfare, 1974, p. 238.

(১৫) *The Report of the Commission for Scheduled Castes and Schduled Tribes* 1979-81 (27the Report), Part I. p. 7.

(১৬) *Eighth Five year plan, 1992-97, Government of India, Planning Commission*, New Delhi, vol. II. p. 315.

(১৭) *The National Perspective Plan for Women , 1988-2000*, Report of the Core Group set up by the the Department of Women and Child Development, New Delhi, 1988, p. 25.

(১৮) বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, *নারী শ্রেণী ও বর্ণ*, ম্যানাস্ক্রিপ্ট ইন্ডিয়া, হাওড়া, ২০০০।

(১৯) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাশিয়ার চিঠি, সোভিয়েত ইউনিয়ান থেকে আমেরিকা যাবার পথে অতলান্তিক মহাসাগরে জাহাজ থেকে লেখা ৭নং চিঠি, অক্টোবর, ১৯৩০।

২

স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী

উনিশ শতকের প্রথমভাগে নবজাগরণ ও ধর্মীয় সংস্কারের আলোকে এদেশে নানাবিধ ধর্মীয় রীতিনীতি, প্রথা এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কয়েকটি আইন প্রণীত হয়। এগুলির মধ্যে অন্যতম হল ১৮২৯ সালের 'সতী নিবারক আইন' (Sati Prohibition Act, 1829), ১৮৫৬ সালের বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত আইন (Hindu Remarriage Act, 1856) এবং ১৯১৯ সালের ১০ বছর বয়সের নীচে বালিকাদের সহবাস সংক্রান্ত আইন (Age of consent Act, 1919)। আইন ও বাস্তবের মধ্যে প্রভূত ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও এই আইনগুলি তৎকালীন সমাজে নারীর দুর্দশা সম্বন্ধে সামাজিক সচেতনতার সাক্ষর বহন করছে। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বালিকাদের স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং ক্রমশ নারীশিক্ষা বিস্তারের ফলে বর্হিজগতের সাথে কিছু নারীর যোগাযোগের সূত্রপাত হয়। আর এই সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই বিশ শতকের প্রথমভাগে ভারতের রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের পটভূমি তৈরী হয়।

সংগ্রামের প্রেক্ষাপট

উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসনের কবল থেকে ভারতকে মুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা এদেশের মাটিতে দানা বাঁধতে শুরু করে। সেই সময় ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় এবং বাংলার বিপিন চন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি। তৎকালীন ভারতের রাজধানী রূপে বাংলাই হয়ে উঠেছিল রাজনৈতিক কার্যকলাপের কেন্দ্রভূমি। বিশ শতকের প্রথমভাগে বাংলায় কিছু ছাত্র যুব সংগঠন গড়ে ওঠে প্রধানত ছাত্র ও যুবকদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে। এই ক্লাব বা ব্যায়ামাগারগুলিতে নিয়ম করে যুবকদের লাঠি খেলা, ছোরা খেলা, ডন বৈঠক,

ড্রিল প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বীরত্ব ও দেশাত্মবোধেও এদের উদ্বুদ্ধ করা হতো। তাছাড়া, এই সময় কিছু পত্র-পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে, যেগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ইংরেজ শাসনের নীতি ও স্বরূপ ব্যাখ্যা করে তরুণদের মধ্যে স্বাধীনতা স্পৃহা ও সাহস সঞ্চার করা। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল অরবিন্দ ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত 'বন্দেমাতরম্' এবং বারীন ঘোষ ও তার বন্ধুবর্গ কর্তৃক সম্পাদিত 'যুগান্তর' পত্রিকা। এ বিষয়ে নারীরাও পিছিয়ে ছিলেন না। সরলা দেবী ঘোষাল (চৌধুরাণী) ১৮৯৭-১৮৯৯ সাল পর্যন্ত 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। সরলা দেবীর জন্ম এবং বৃদ্ধি ঘটেছিল ঠাকুর পরিবারের শিক্ষিত এবং মননশীল পরিবেশে। ১৮৮০ সনে তিনি কলকাতার বেথুন স্কুল থেকে বি. এ. পাশ করেন। 'ভারতী' পত্রিকার মাধ্যমে সরলা দেবী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও সাহস সঞ্চারের চেষ্টায় ব্রতী ছিলেন। অনুরূপে কুমুদিনী মিত্র 'সুপ্রভাত' পত্রিকার মাধ্যমে দেশপ্রেমের আদর্শ প্রচার করেছেন। ১৯০৭-১৯১২ সালে কুমুদিনী এই পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কুমুদিনী ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ এবং বারীন ঘোষের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া। অন্যান্যদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন 'বেনু' পত্রিকার সম্পাদিকা মীরা দাশগুপ্তা, যিনি পরে বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিলেন।

লাঠি খেলা, ছোরা খেলা ও পত্রপত্রিকা প্রভৃতি সম্পাদনার সাথে সাথে উনিশ শতকের প্রথমভাগে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের (১৯০৫-১৯১১) মাধ্যমেই মহিলারা প্রথম রাজনৈতিক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত হন। আর এই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন যখন ক্রমশ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত হয়, মহিলারাও স্বাভাবিকভাবেই তার অংশীদার হন। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের দিনটিকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এদেশের ঐক্যবদ্ধতার দিবস রূপে পালন করার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ 'রাখীবন্ধন'-এর ডাক দিলে মহিলারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তাছাড়া, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী এই ১৬ অক্টোবর দিনটিকে 'অরন্ধন' দিবস রূপে পালন করার আহ্বান জানালে ঘরে ঘরে নারীরা সেদিন রান্নাপর্ব থেকে নিজেদের বিরত রাখেন। কোন বাড়িতে সেদিন রান্নাঘরে উনুন জ্বলেনি। কলকাতায় বিভিন্ন স্থান থেকে সেদিন প্রায় পঞ্চাশ হাজার ধনী দরিদ্র, বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী পুরুষ কালীঘাটের মন্দির চত্বরে সমবেত হয়ে বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন। আর সেই সঙ্গে বিলেতি বস্ত্র বর্জনের শপথও গ্রহণ করেন। আর বহু নরনারী মিছিল করে

আপার সার্কুলার রোডে উপস্থিত হয়ে দুই বাংলার ঐক্য ও মিলনের প্রতীক রূপে অখণ্ড বঙ্গভবন নির্মাণের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।[১] সেদিনের সেই উন্মাদনাকর পরিস্থিতিতে নরনারী নির্বিশেষে সকলেই দেশাত্মবোধে আপ্লুত হন।

এর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই যখন সব রকমের বিদেশি দ্রব্য বর্জন করে দেশি দ্রব্য ব্যবহারের আহ্বান জানানো হয়, তখনও মহিলারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই আহ্বানে সাড়া দেন। বিদেশি দ্রব্য বর্জনে ঘরে ঘরে নারীরা এতটাই উদ্দীপিত হয়েছিলেন যে একটি ৬ বছরের বালিকাও কঠিন অসুখের সময় 'বিলেতী' ওষুধ খেতে অস্বীকার করে। সরলা দেবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' দেশি জিনিষ বিক্রি করার একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যখন ক্রমশ শুধু বিদেশি দ্রব্যই নয়, বিদেশি ভাষা এবং বিদেশি ভাবধারাকেও বর্জন করে স্বদেশি দ্রব্য, স্বদেশি ভাষা এবং স্বদেশি ভাবধারকে গ্রহণ করার আন্দোলনের রূপ নেয়, নারীরাও সর্বতোভাবে সেই আন্দোলনের শরিক হয়ে আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছেন। আর এই আন্দোলন যখন কালক্রমে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত হয়, নারীরা সেই আন্দোলনে শুধু অংশগ্রহণই করেন নি, অনেক নির্যাতনও অকাতরে সহ্য করেছেন। কেউ কেউ প্রাণও দিয়েছেন।

একথা সকলেরই জানা যে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের দুটি বিশেষ ধারা ছিল ঃ (১) অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ধারা ; এবং (২) সহিংস বিপ্লবাত্মক ধারা। এখানে আমরা এই দুটি ধারাতেই নারীর ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করব।

অসহযোগ আন্দোলনে নারীর ভূমিকা

এখানে উল্লেখ্য যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীর অংশগ্রহণ, ভূমিকা ও অবদান বিষয়ে এখনও বিস্তারিত তথ্যবহুল ইতিহাস রচিত হয়নি। অতি সাম্প্রতিক দু একটি প্রকাশনা অবশ্যই আছে।[২] তবে এগুলিও স্বয়ংসম্পূর্ণ ইতিহাস নয়। এ বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে। এই আলোচনাটি ভারতের সাধারণ স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, কিছু প্রবন্ধ এবং কিছু প্রক্ষিপ্ত উক্তির উপরই নির্ভরশীল।

প্রকৃতপক্ষে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের সময় (১৯২০-২২) থেকেই ভারতীয় রাজনীতিতে নারীর প্রত্যক্ষ এবং ব্যাপক অংশগ্রহণের সূচনা হয়। ১৯২০-৪০ এর মধ্যে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিতে এবং গান্ধীজির নেতৃত্বে সর্বপ্রথম ধর্ম জাতিবর্ণ ও শ্রেণী নির্বিশেষে সমস্ত স্তরের অসংখ্য নারীর

রাজনৈতিক জাগরণ ঘটে। গান্ধীজি তাঁর অহিংস আন্দোলনের সাথে এদেশের শিক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার বিষয়ে নিজের ভাবাদর্শকে যুক্ত করার ফলে অসংখ্য সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের মহিলারা অসহযোগ আন্দোলন ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনে শামিল হন। গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন যে "Woman is the companion of man gifted with equal mental capacities. She has the right to participate in the minutest details of the activities of man, and she has the same right of freedom and liberty as he...."।[৩] এই সময় সারা দেশে মহিলারা তাদের চিরাচরিত পর্দা প্রথাকে ছিন্ন করে দলে দলে মিটিং-এ, মিছিল-এ এবং বিদেশি দ্রব্য ও মদের দোকানের পিকেটিং-এ যোগদান করেছেন। বিদেশি বস্ত্র বর্জনের আহ্বানে অনেক উচ্চবিত্ত মহিলারাও এ সময় তাদের মূল্যবান বিদেশি পোশাক আগুনে পুড়িয়েছেন এবং বহুমূল্য অলংকার অকাতরে দেশের কাজে দান করেছেন। আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও একাত্মবোধ না থাকলে এ কাজ সহজ নয়। গান্ধীজি তার স্বদেশি আন্দোলনের রাজনৈতিক ভাবাদর্শের সাথে গ্রামীণ অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও নারীজাতির উন্নয়ন পরিকল্পনার এক সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করার ফলে সারাভারতে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, ঘরে ঘরে চরকায় কাপড় বোনার কাজে নারীশ্রমকে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গান্ধীজির বড় কৃতিত্ব ছিল এই যে তিনি সমকালীন সময়ে অগণিত নারীর মধ্যে নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করে সবাইকে তার গঠনমূলক কার্যক্রমের অংশীদার করতে পেরেছিলেন। বিদেশি কাপড় বর্জনের নেশায় ঘরে ঘরে সধবা, বিধবা, কুমারী নির্বিশেষে নারীরা নিজের হাতে তক্‌লিতে সুতো কেটে, চরকায় কাপড় বুনে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

জাতীয় নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ-এর পত্নী বাসন্তী দেবী কলকাতায় 'নারী সত্যাগ্রহ সমিতি' ও 'কর্ম মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন। এই কর্ম মন্দিরে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের নারীরা শুধু পরস্পরের সান্নিধ্যেই আসতেন না, একসাথে বসে চরকায় খাদি বস্ত্র প্রস্তুত করে প্রকাশ্যে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তা বিক্রিও করতেন। আর সেই সঙ্গে দিতেন বিদেশি কাপড় বর্জনের স্লোগান। বাসন্তী দেবী এবং চিত্তরঞ্জনের ভগিনী উর্মিলা দেবী প্রিন্স অফ ওয়েলস-এর কলকাতায় আগমনের দিনকে কেন্দ্র করে হরতাল-এর ডাক দিয়ে এবং রাস্তায় দাঁড়িয়ে খাদি কাপড় বিক্রি করে সম্ভবত প্রথম সরকারি আইন অমান্য করে কারাবরণ করেন।[৪] গান্ধীজি মনে করতেন, "Since resistance in satyagraha is offered through self suffering... it is a

weapon pre-eminently open to women...she can become the leader in satyagraha which does not require the learning that books give but does require the stout heart that comes from suffering and faith."[৫] অর্থাৎ পুঁথিগত বিদ্যার পরিবর্তে ত্যাগ স্বীকার করার ক্ষমতা ও কঠিন মানসিক শক্তির বলে নারীরা সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী, এই বিশ্বাস তৈরী করেই গান্ধীজি ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত নির্বিশেষে সব স্তরের নারীকে তার আন্দোলনে টেনে আনতে পেরেছিলেন।

সরোজিনী নাইডু (যার জন্ম এবং বৃদ্ধি হয়েছিল হায়দ্রাবাদী পরিশীলিত সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে এবং যিনি সেইকালে কেম্ব্রিজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন), কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় (যিনি দক্ষিণ কর্ণাটকের উচ্চশিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে হারীন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন), মতিলাল নেহেরুর স্ত্রী স্বরূপ রানি, জওহরলাল নেহেরুর স্ত্রী কমলা, জওহরলালের দুই ভগিনী বিজয়লক্ষ্মী ও কৃষ্ণা এবং নেহেরু পরিবারের দুই নিকট আত্মীয়া রামেশ্বরী নেহেরু ও উমা নেহেরু অন্যান্য মহিলাদের সাথে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবেই অংশগ্রহণ করেছিলেন। এরা প্রায় সকলেই মিটিং, মিছিল, পিকেটিং এ যোগদান করে পুলিশের নির্যাতন ভোগ করেছেন এবং একাধিকবার কারারুদ্ধও হয়েছেন। এদের মধ্যে সরোজিনী নাইডু, কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় এবং বিজয়লক্ষ্মী গান্ধীজির কার্যক্রমের নেতৃত্বও দিয়েছেন। মুসলিম নারীদের মধ্যে দুই আলি ভ্রাতার (মহম্মদ আলি ও সৌকত আলি) মা আবিদা বানু বেগম (বাই আম্মান) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আবিদা বানু বেগম বা বাই আম্মান রাওয়ালপিণ্ডি, গুজরানওয়ালা, কেশর (পশ্চিম পাঞ্জাব), সিমলা, বম্বে, পাটনা, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে ঘুরে খাদি প্রচার এবং হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির জন্য কাজ করেছেন। ইনি খিলাফৎ আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলেন। শ্রীমতী আবদুল কাদির নামে পরিচিত আরেকজন মুসলিম মহিলাও লক্ষ্ণৌ এবং অন্য কিছু স্থানে খাদি প্রচার ও প্রসার করেছেন।[৬]

১৯২৮ সালে বারদৌলী সত্যাগ্রহের সময় বম্বের এক কোটিপতি পারসি-র কন্যা মিঠুবেন পেটিট-এর নেতৃত্বে ভক্তিবেন দেশাই, মনিবেন প্যাটেল, সারদা মেহ্‌টা সহ অন্যান্য মহিলারা এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে কারাবরণ করেছেন। আর মিঠুবেন নিজে খাদি কাপড় পরিধান করে খাদি কাপড়ের বাণ্ডিল কাঁধে ঝুলিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরেছেন খাদি বিক্রির জন্য। এখানে লক্ষ্যণীয়

যে অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে শুধু এমন সব নারীরাই এই আন্দোলনের শরিক হয়েছিলেন যাদের পিতা/ভ্রাতা/স্বামী পুত্র প্রভৃতির মধ্যে কেউ না কেউ সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন অথবা কারারুদ্ধ হয়েছিলেন।

নারীদের অংশগ্রহণের দিক থেকে অসহযোগ আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় অথবা তিরিশ-এর দশকের আইন অমান্য আন্দোলনই বেশি উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় পর্যায়ের এই আন্দোলনে সাধারণ মধ্যবিত্ত, এমন কী কৃষক পরিবারের নারীরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর তাদের এই অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। অনেক সময় পুরুষ নেতাগণ কারারুদ্ধ হলে বিনা দ্বিধায় নারীরাই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। ১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ লবণ আইন ভঙ্গ করে লবণ তৈরীতে সরকারের একচেটিয়া অধিকার খর্ব করার উদ্দেশ্যে সবরমতী আশ্রম থেকে যে ডাণ্ডি মার্চ শুরু হয়, মহিলারা প্রথমে গান্ধীজির কাছ থেকে সেই মার্চে যোগদান করার অনুমতি পান নি। কিন্তু পরে মহিলারা এ ব্যাপারে লিঙ্গ বৈষম্যের সমালোচনা করলে কয়েকজন নারী মার্চে অংশগ্রহণ করার অনুমতি লাভ করেন। ১৯৩০ সালের ৬ই এপ্রিল লবণ আইন ভঙ্গ করে গান্ধীজি কারারুদ্ধ হওয়ায় সারাদেশ জুড়ে যে হরতালের ডাক দেওয়া হয়, দলে দলে সব স্তরের ও সব শ্রেণীর নারীরা পুরুষের সাথে প্রায় সমানভাবে তাতে অংশগ্রহণ করেন, এবং সেই সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রায় একটি জাতীয় আন্দোলনের রূপ নেয়। কৃষক পরিবারের নারীরাও লবণ সত্যাগ্রহ উপলক্ষ্যে মিছিলে যোগ দিয়ে দেশি লবণ বিক্রি করে অকাতরে কারাবরণ করেছেন। আর সেই সঙ্গে অবশ্যই ছিলেন পর্দানশীন মহিলারাও। এ বিষয়ে কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "[The women] who had been gently nurtured behind silken curtains, women who had never looked upon a strange face, stripped aside those silken curtains, threw off their gossamer veils and flung themselves into the blinding glare of day unshaded and unprotected... they who had been nurtured in the highest delicacies crunched bravely in tough jails roties." [৭]

উল্লেখ্য যে গান্ধীজির আদেশে সরোজিনী নাইডু ১৯৩০ সালের ৩১শে মে ২ হাজার নারী স্বেচ্ছাসেবীকে নেতৃত্ব দিয়ে মিছিল করে দর্শনা লবণ উৎপাদন কেন্দ্র আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে যান। পথে অবশ্য পুলিশের একযোগে লাঠি ও লাথির সামনে মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, আর সরোজিনী কারারুদ্ধ হন। প্রায় একইভাবে

কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়ও বম্বে শহরের কাছে একটি লবণ উৎপাদন কেন্দ্র অধিকার করতে গিয়ে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন।[৮] ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে কয়েকটি নারী স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্নভাবে আইন অমান্য আন্দোলনে এই সময় যোগদান করেছিলেন। এই স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল বাংলার 'নারী সত্যাগ্রহ সংঘ', বম্বের 'দেশ সেবিকা', কেরালার 'স্বয়ং সেবিকা সংঘ', গুজরাটের 'শ্রী স্বরাজ্য সংঘ', এলাহবাদের 'সেবিকা সংঘ', এবং বিহারের 'হিন্দুস্থান সেবা দল'। এই সব স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর নারীরাও আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে অত্যাচার ও কারাযন্ত্রণা ভোগ করেছেন। "About two thousand women including girls, expecting mothers and mothers with babies in their arms went to prison during the period 1930-32." [৯]

দলিত ও আদিবাসী নারীরাও দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে পিছিয়ে ছিলেন না। কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারের মতো স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসেও এই নারীরাই বেশি উপেক্ষিত। মহারাষ্ট্র সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'স্বতন্ত্র সৈনিক চরিত্র কোষ' Dictionary of Freedom Fighters) থেকে জানা যায় যে দলিত নারী চম্পুতাই ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার ফলে ৬ মাস কঠিন সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন।[১০] দলিত গোপিকা বাইও ১৯৩২ সালে মাদক দ্রব্য উৎপাদন কেন্দ্রে পিকেটিং করে ৩ মাস কারারুদ্ধ ছিলেন।[১১] এছাড়া ছিলেন শকুন্তলা ভালেরাও, যিনি তার বাবার সঙ্গে অনেক মিটিং ও পিকেটিং এ অংশগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তার জীবন কেটেছে মহারাষ্ট্রের সিয়ন কালিওয়াড়ার এক বস্তিতে।[১২] অস্পৃশ্য দলিত স্বাধীনতা সংগ্রামী নারীদের মধ্যে আরও ছিলেন ধুলিবেন সোলাংকি এবং সোনাল সোলাংকি। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ডাকে অনেক আদিবাসী, বিশেষত সাঁওতাল নারীরাও তাদের পুরুষদের সাথে একযোগে অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এসব নিম্নবর্গের নারীর কৃচ্ছ্রসাধন কোনক্রমেই উচ্চবর্গের নারীদের থেকে কম ছিল না। সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নারীর ভূমিকা সম্বন্ধে জওহরলাল নেহেরু লিখেছেন ঃ

"Our women came to the forefront and took charge of the struggle. Women had always been there, but now there was an avalanche of them... There were these women, women of the upper and middle classes, living sheltered lives in their homes, peasant

women, working class women, pouring out in their tens of thousands in defiance of government order and police lathi. It was not only that display of courage and daring, but what was even more surprising was the organizational power they showed."[১৩]

সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে হাজার হাজার নারী তাদের জীবন যৌবন ধন মান সব কিছু বিসর্জন দিতে তৈরী হয়েছিলেন দেশের স্বাধীনতার জন্য। পুরুষের সাথে প্রায় সমানভাবে নারীরা এই সময় পুলিশের বুলেটের সামনে দাঁড়িয়েছেন, কারাযন্ত্রণাও ভোগ করেছেন। আবার অনেক নারী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিজেদের গোপন আশ্রয়ে রেখে পুলিশের কবল থেকে তাদের রক্ষা করেছেন। এই সময়ের সংগ্রামী নারীদের মধ্যে দলিত শান্তাবাই ভালেরাও এবং তারাবাই কাম্বলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহারাষ্ট্রের তারাবাই কাম্বলে ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় কয়েকজন পলাতক পুরুষ সংগ্রামীকে গোপনে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন অনেকদিন। আর শান্তাবাই গোপন খবরাখবর ও চিঠিপত্র সর্বদাই স্থান থেকে স্থানান্তরে পৌঁছে দিয়েছেন, আর শেষের দিকে পোষ্ট অফিস ও পুলিশ চৌকিতে আগুন ধরাবার ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করেছেন বম্বের আর্থার জেলে।[১৪] সব জাতিবর্ণ ও শ্রেণীর নারীর এই প্রাণঢালা সহযোগিতা ও আত্মত্যাগ ছাড়া পুরুষ কর্মীদের কার্যক্রম অনেকাংশেই ব্যর্থ হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। যে সব নারী 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে নিজেদের অধিষ্ঠিত করেছেন, তাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন মেদিনীপুরের কৃষক পরিবারের ৭২ বছর বয়সের মাতঙ্গিনী হাজরা। ১৯৪২ সালের ২৯শে অক্টোবর মাতঙ্গিনী একটি স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতৃত্ব দিয়ে তমলুকের থানা অধিকার করতে যান। পুলিশের নির্বিচার গুলির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, কিন্তু শেষ নিঃশ্বাস থাকা পর্যন্ত ভারতের জাতীয় পতাকা তার হাতের মুঠিচ্যুত হয়নি। ভারত ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে নারী শক্তির এই জাগরণ না ঘটলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিঘ্নিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল।

বিপ্লবাত্মক কার্যক্রম

১৮৭৪ সাল থেকে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত 'আর্য দর্শন' পত্রিকায়

প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি বাংলার যুবকদের বিপ্লবী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করতে শুরু করে। ইটালির দেশপ্রেমীদের, বিশেষত ম্যাৎসিনির বীরত্বের কাহিনী, বাংলার যুবকদের কাছে বিশেষ প্রিয় হয়ে ওঠে। তারা বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীন ভারত গঠনের স্বপ্ন দেখে, এবং এই উদ্দেশ্যে বাংলা ও মহারাষ্ট্রে যথাক্রমে ১৮৭৫ এবং ১৮৭৬ সালে কিছু গুপ্ত সংগঠন গড়ে তোলে। মহারাষ্ট্র, বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং আরও কোন কোন রাজ্যে কিছু বিপ্লবী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলাই ছিল বিপ্লবাত্মক কার্যক্রমের কেন্দ্রভূমি। মহারাষ্ট্রের বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন বাসুদেও বলবন্ত ফারকে। তবে বাল গঙ্গাধর তিলক, প্রমথনাথ মিত্র, পুলিনবিহারী দাশ, অরবিন্দ ঘোষ, বিনায়ক দামোদর সাভারকর, হরদয়াল, মহম্মদ বরকতুল্লাহ, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, রাসবিহারী ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আসফাকুল্লাহ, সূর্য সেন, ভগৎ সিং এবং সুভাষ চন্দ্র বোস প্রভৃতি ছিলেন বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের প্রাণপুরুষ।

গুপ্ত সমিতি

উনিশ শতকের শেষভাগে যেসব গুপ্ত সংস্থা এদেশে গঠিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে অন্যতম হল ১৮৯৭ সালে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত 'আত্মোন্নতি' সমিতি। অন্যান্য গুপ্ত সমিতিগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল অনুশীলন সমিতির কলকাতার (১৯০১) ও ঢাকার (১৯০৫) শাখা, ময়মনসিংহের 'সুহৃদ সমিতি' এবং ঢাকার 'মুক্তি সংঘ'। উল্লেখ্য যে ১৯০৫ সাল অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্বেই স্থাপিত এই সব গুপ্ত সমিতিগুলির কোন নির্দিষ্ট নীতি ও কর্মসূচী ছিল না, যদিও সাধারণভাবে সদস্যারা বিপ্লবী ভাবধারায় দীক্ষিত হয়ে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জনচেতনা বৃদ্ধি র কাজে সচেষ্ট ছিলেন। প্রথমদিকে সমিতিগুলির প্রধান কাজ ছিল লাঠি, ছোরা, তলোয়ার প্রভৃতি নিয়ে যুদ্ধের মহরা দেওয়া এবং এসবের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করা। বাংলার নারীদেরও যে গুপ্ত সমিতির সাথে যোগাযোগ ছিল তার প্রমাণ আছে। সরলা দেবী তার 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' সংগঠনটি ১৯০৩ সালে ব্যায়ামাগার রূপেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কার্যত এটি ছিল বিপ্লবী তরুণদের মিলনক্ষেত্র। কিছু নারীও এখানে লাঠি, ছোরা, তলোয়ার ইত্যাদি খেলায় অংশগ্রহণ করতেন। সরলা দেবী নিজেও প্রকাশ্য স্টেজ-এ ছোরা নিয়ে যুদ্ধের খেলা দেখিয়েছেন।[১৫]

পরে ইংরেজের দমননীতির ফলে এই সংগঠনগুলি, যা আগে প্রধানত ব্যায়ামাগার রূপে গঠিত হয়েছিল, সশস্ত্র বিপ্লবাত্মক কার্যক্রমের গুপ্ত আস্তানা বা সমিতিতে

পরিণত হয়। এই বিপ্লবী বা সশস্ত্র সংগ্রামীরা যে কোন বৈপ্লবিক আর্থসামাজিক পরিবর্তনের আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন না, তা বলাই বাহুল্য। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল কিছু ইংরেজ বিরোধী কার্যক্রমের রূপায়ণ। বিশেষত কিছু ইংরেজকে হত্যা ও ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত রেললাইন, অফিস, আদালত ইত্যাদি ধ্বংস করে এদেশ থেকে তাদের চলে যেতে বাধ্য করা। উনিশ শতকের বিশ ও তিরিশ-এর দশকের বিপ্লবীরা প্রধানত কলকাতা ও ঢাকার অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর সমিতির বিভিন্ন শাখা, মুক্তিসংঘ অথবা বেঙ্গল ভলন্টিয়ার্স, চট্টগ্রাম বিপ্লবী দল ও ঢাকার শ্রী সংঘের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন।

এখানে উল্লেখ্য যে একদিকে স্বদেশি ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন আর অপরদিকে বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপের বাতাবরণের মধ্যে নারীরা স্বাভাবিকভাবেই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন, আর এদের মধ্যে অনেকেই দুটি ধারার উদ্ভবকাল থেকেই কোন না কোন একটি ধারার সাথে যুক্ত ছিলেন। কেউ কেউ পরবর্তীকালে একটি ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অপর ধারাটিকে বেছে নিয়েছিলেন। আরও উল্লেখ্য যে ১৯২০ সালের পূর্বে গুপ্তসমিতিতে কোন মহিলা সদস্য নেওয়া হতো না। এগুলির সদস্যপদ নির্দিষ্ট ছিল শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য। তাই নারীরা প্রথমদিকে বিপ্লবাত্মক কাজে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও অপ্রত্যক্ষ এবং অনেক সময় অলক্ষিতভাবেও এইসব কাজের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকতেন।

নারীর ভূমিকা

বিপ্লবাত্মক কার্যক্রমের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই অনেক নারী পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দান করা, তাদের খাদ্যবস্ত্র যোগানো, গোপন সংবাদ নিয়ে কুরিয়ারের কাজ করা, অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক পদার্থ লুকিয়ে রেখে পরে সেগুলি অন্যত্র পাচার করা প্রভৃতি কাজে লিপ্ত ছিলেন। আবার কেউ কেউ আর্থিক সাহায্যও করেছেন। যত নারী এসব কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন, তাদের সকলের নাম উল্লেখ করা অথবা তাদের কাজের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া এখানে উদ্দেশ্য নয়। বিপ্লবাত্মক কাজের প্রতি নারীর একনিষ্ঠতার প্রমাণ রূপে কিছু কাজের উদাহরণই শুধু এখানে তুলে ধরা হবে।

আগেই বলা হয়েছে যে পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয়দান করা ছিল নারীদের একটি প্রধান কাজ। বিপ্লবীদের পক্ষে গোপন আশ্রয় অত্যন্ত জরুরী হলেও মহিলাদের

পক্ষে কিন্তু আশ্রয় দান করা অনেক সময়ই খুব সহজ ছিল না। এজন্য বয়স্ক মহিলাদের অনেক সময় মায়ের ছদ্মবেশ নিতে হয়েছে এবং অল্পবয়স্ক নারীদের স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, বিধবা ক্ষিরদা সুন্দরী দেবী ১৯১৪-১৫ সালে ইন্দো-জার্মান দ্বন্দ্বের সময় 'যুগান্তর' দলের কয়েকজন বিপ্লবীর মা সেজে নিজের বাড়ীতে তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন।[১৬] চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর কুমারী সুহাসিনী গাঙ্গুলী নিয়মিত শাঁখা সিঁদুর পরে যুগান্তর দলের শশধর আচার্যের স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করে অনন্ত সিং, গনেশ ঘোষ, জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্তকে আশ্রয় দিয়েছিলেন বেশ কিছুদিন। ১৯১৫ সালের আগষ্ট মাসে কলকাতার শ্রমজীবি সমবায় সংগঠনে পুলিশের আক্রমণের পর বিধবা ননীবালা মুখার্জী তার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় অমরনাথ চ্যাটার্জী ও তার তিন বন্ধুকে আশ্রয় দেওয়ার কারণে নিজের পারিবারিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরে তাকেও পলাতক হয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। শেষে পেশোয়ার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে বেনারস জেলে বন্দি থাকতে হয়েছে অনেকদিন।[১৭] আর এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য সাবিত্রীদেবীর কথা, যিনি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের প্রধান নায়ক সূর্য সেন, এবং নির্মল সেন, অপূর্ব সেন ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে চট্টগ্রামের ধলঘাটে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে বিনিময়ে ভোগ করেছেন কারাদণ্ড ও সন্তান হারানোর দুঃখ। ১৯৩২ সালের ১৩ই জুন রাত্রে বিরাট পুলিশ বাহিনী বিপ্লবীদের এই গোপন আস্তানা ঘিরে ফেললে দুপক্ষের গুলি বিনিময়ের সময় নির্মল ও অপূর্ব সেনের মৃত্যু হয়। সূর্য সেন ও প্রীতিলতা কোন রকমে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। কিন্তু বিপদে পড়েন সাবিত্রী দেবী। সাবিত্রী দেবী ও তার পুত্র রামকৃষ্ণকে গ্রেপ্তার করে মেদিনীপুর জেলে রাখা হয়। একই জেলে থাকা সত্ত্বেও পুত্রের গুরুতর অসুস্থতার সময়ও সাবিত্রী দেবী তাকে একবার দেখবার অনুমতি পান নি। শেষে অবশ্য গরাদের বাইরে থেকে মৃত পুত্রকে দেখবার অনুমতি মিলেছিল।[১৮] এই মনোবল ও ত্যাগ কি পুরুষের প্রত্যক্ষ বিপ্লবাত্মক কাজ অপেক্ষা কোন অংশে কম মূল্যবান?

বিপ্লবীদের গোপনে আশ্রয় দান করা ছাড়াও অনেক মহিলা অস্ত্রশস্ত্র, বোমা, পিস্তল নিজেদের হেপাজতে লুকিয়ে রেখে সুযোগ মতো সেগুলি অন্যত্র স্থানান্তরিত করতেন। কখনও কখনও মহিলারাই অস্ত্রশস্ত্র অন্যত্র পৌঁছে দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ অথচ বিপদজনক কাজের দায়িত্বও নিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ, কমলা দাশগুপ্ত একটি মহিলা হস্টেলের সুপারিন্টেনডেন্ট থাকা কালে এক ঝুলি বোমা নিজের

কাছে লুকিয়ে রেখেছিলেন, আর হেলেন গুঁই এক গ্রাম্য গৃহবধূর ছদ্মবেশে কলকাতা থেকে একটি পিস্তল নিয়ে ঢাকায় পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন।[১৯] বোমা পিস্তল এবং বিস্ফোরক পদার্থ লুকিয়ে স্থানান্তরিত করার ব্যাপারে চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের কমলা চ্যাটার্জী ও অমৃতা সেনের নামও উল্লেখ্য। এদের মধ্যে অনেককে গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল। কলকাতার সমাজবাদী সমবায় সংগঠনের রামচন্দ্র মজুমদারকে গ্রেপ্তার করার সময় তিনি তার পিস্তলটি কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন তা কাউকে জানিয়ে যেতে পারেন নি। বিধবা ননীবালা মুখার্জী রঙ্গীন শাড়ি ও শাঁখা সিঁদুর পরে রামচন্দ্রের স্ত্রী সেজে জেলে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করেন, এবং অন্য অনেক কথার মাঝে সেই খবরটি সংগ্রহ করে আনেন।[২০] *কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা না থাকলে এ কাজ সম্ভব নয়।*

আন্দোলনের প্রথম দিকে বারীন ঘোষ ও তার বন্ধুরা যখন বোমা তৈরী করতে শুরু করেন, চন্দননগরে মতিলাল রায় এবং সাগরকলি ঘোষের বাড়িতে ছিল বোমা বানানোর প্রধান আস্তানা। এই সময় মতিলালের স্ত্রী রাধারাণী ও সাগরকলি ঘোষের ভাগ্নি নেত্রাক্ষি অতি দক্ষতার সঙ্গে বিভিন্ন রসায়ন পদার্থের সংমিশ্রণ তৈরী করে তা দিয়ে বোমা তৈরী করতেন বলে জানা যায়।[২১] আর আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের সদস্যরা যখন চট্টগ্রাম জেলের দেওয়ালে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে উড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে শক্তিশালী বোমা তৈরীর প্রস্তুতি নেন, কল্পনা দত্ত (যোশী) বোমা তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় গান-কট্‌ন তৈরীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন, আর এই গান-কট্‌ন তৈরীর ফরমূলা জেল থেকে কল্পনাকে পাঠান অনন্ত সিং ও গণেশ ঘোষ।[২২] এই প্রসঙ্গে অনুশীলন দলের পারুল মুখার্জীর নামও উল্লেখ্য। আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে পলাতক পারুল গোপনে দক্ষিণ ২৪ পরগণার টিটাগড়ে এক বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আর তার কাছে ছিল বোমা তৈরীর প্রয়োজনীয় ফরমুলা সমেত দলের কিছু গোপনীয় কাগজপত্র। ১৯৩৫ সালের ২০ শে জুলাই পুলিশ পারুলকে গ্রেপ্তার করার সময় তার সামনে আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছিল সেই ফলমূলা সমেত গোপনীয় সব কাগজপত্র। পারুলের ৩ বছর কারাদণ্ড হয়।[২৩]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বিশ-এর দশকের আগে মহিলাদের বিপ্লবী দলের সদস্য হওয়া নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু উত্তাল রাজনৈতিক বাতাবরণ, মহিলাদের ভোটাধিকার প্রাপ্তি, আর সেই সঙ্গে ছাত্রীদের উপর কিছু কালজয়ী উপন্যাসের প্রভাব সেই নিষেধকে হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে সে সময় কিছু শিক্ষিত মহিলা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ'-এর শান্তি এবং 'দেবী চৌধুরাণীর'

প্রফুল্লমুখী-র চরিত্র দিয়ে অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন। আর তরুণী মেয়েদের মনে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী'র ভারতী ও সুমিত্রার দেশপ্রেমের প্রভাবও যে কাজ করেছিল তা অস্বীকার করা যায় না। কিছু তরুণী শিক্ষিত মহিলা এ সময়ে বিপ্লবী সংগঠনের সদস্যপদ শুধু গ্রহণই করেন নি, সংগঠনকে শক্তিশালীও করেছেন। তবে এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে এই মহিলারা প্রায় সকলেই ছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারভুক্ত। আর দেশের রাজনীতির সাথে এইসব পরিবারের ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। পারিবারিক রাজনৈতিক উন্মাদনা স্বাভাবিকভাবেই এই মহিলাদের বিপ্লবী সংগঠনে নিয়ে এসেছিল।

১৯২৪ সালে লীলা নাগ(রায়) সর্বপ্রথম ঢাকা 'শ্রী সংঘ'-এর সদস্যা হন। ১৯৩২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করে সেই বছরই লীলা ঢাকায় 'দীপালী সংঘ' প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেশ্য ছিল মেয়েদের শিক্ষা ও শারীরিক শক্তির বিকাশ। কিন্তু লীলা বিপ্লবী সংগঠনের সদস্য হওয়ার পর 'দিপালী সংঘ'ও বিপ্লবাত্মক কাজের সাথে জড়িয়ে পড়ে। ১৯৩০ সালে 'শ্রী সংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ অনিল রায়ের মৃত্যুর পর তার এম. এ. ক্লাসের সহপাঠিনী ও স্ত্রী লীলা রায় 'শ্রী সংঘ'-এর সাংগঠনিক দায়িত্ব তুলে দেন।[২৪] অনুরূপে ১৯৩২ সালে কল্যাণী দাশ (ভট্টাচার্য) যুগান্তর দলে যোগদান করেন। ইনি আগেই গান্ধীজির আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। আর তারও আগে কল্যাণী তার দুই সহপাঠিনী কমলা দাশগুপ্ত ও সুরমা মিত্র সহ কয়েকজন ছাত্রীকে নিয়ে কলকাতায় 'ছাত্রী সংঘ' গড়ে তুলেছিলেন। কল্যাণী ১৯৩২ সালে যুগান্তর দলে যোগ দেওয়ার সময় দলের নেতারা বেশির ভাগই ছিলেন হয় জেলে অথবা এখানে ওখানে ছত্রভঙ্গ হয়ে। কল্যাণী এসব সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করে নিয়মিত সকলে গোপনে এক জায়গায় মিলিত হয়ে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছেন ও সেই সঙ্গে অস্ত্র জোগাড় করেছেন। যুগান্তর দলের সদস্যা কমলা দাশগুপ্তর সাংগঠনিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। 'ছাত্রী সংঘ'-এর সদস্যা রূপে কমলা অনেক ছাত্রীদের সংস্পর্শে আসতেন এবং ধীরে ধীরে তাদের প্রভাবিত করে দলের কাজে টেনে আনতেন।[২৫] একই পদ্ধতিতে মৈয়মনসিং-এর যুগান্তর দলের প্রাথমিক সদস্যা কমলা চ্যাটার্জী ও ইন্দুসুধা ঘোষ বিদ্যালয়ের নীচু ক্লাসের ছাত্রীদের প্রভাবিত করতেন।[২৬] অনুশীলন দলের নারী সংগঠকদের মধ্যে প্রফুল্ল ভদ্র, সরোজিনী দাস চৌধুরী এবং নির্মলা ও নিরুপমা কাহালি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা রংপুর, দিনাজপুর, ফরিদপুর, কুমিল্লা, বরিশাল,

খুলনা প্রভৃতি স্থানে অনুশীলন দলের মহিলা শাখার সংগঠনের কাজে যুক্ত ছিলেন।[২৭] এই সঙ্গে আরও উল্লেখ্য হলেন উজ্জ্বলা মজুমদার ও মীরা দাশগুপ্ত, যারা 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'-এর সাংগঠনিক কাজের সাথে জড়িত ছিলেন নানাভাবে।

বিশ-এর দশক থেকে কয়েকজন ছাত্রী প্রত্যক্ষ সন্ত্রাসের কাজেও এগিয়ে এসেছিলেন। সেই সময়ের রাজনৈতিক বাতাবরণ, যুবক ছাত্রদের সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম, কারাবরণ এবং সর্বোপরি দেশব্যাপী এক রাজনৈতিক উন্মাদনাই ছাত্রীদেরও সন্ত্রাসবাদী কাজে অনুপ্রাণিত করেছিল। কুমিল্লার ফৈজুন্নেষা বালিকা বিদ্যালয়ের দুই ছাত্রী ১৫ বছর বয়সী শান্তি ঘোষ ও ১৪ বছর ৬মাস বয়সী সুনীতি চৌধুরী ১৯৩১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর কুমিল্লার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সি. জি. বি. স্টিভেনস্‌কে খুব সামনে থেকে গুলি করেন। ম্যাজিস্ট্রেটের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। বিচারে অবশ্য শান্তি সুনীতির ফাঁসি হয়নি তাদের অল্পবয়সের কারণে। বিভিন্ন জেলে বন্দিদশা ভোগ করতে হয়েছে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত।[২৮] কলকাতার ডায়াসেশন কলেজের গ্রেজুয়েট ২১ বছর বয়সী বীণা দাশ ১৯৩২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে আচার্যরূপে ভাষণরত গর্ভনর স্টেনলি জেকসেনকে লক্ষ্য করে পর পর ৩টি গুলি ছোড়েন। কিন্তু অনভিজ্ঞতা বশত সেগুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। বীণাকে প্রথমে প্রেসিডেন্সি জেলে রেখে পরে বিভিন্ন জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।[২৯] উল্লেখ্য যে বীণা তার কাজের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন তার দিদি 'ছাত্রী সংঘ'-র কল্যাণী দাশ এবং চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের নির্মল সেনের সাহচর্য থেকে।

কল্পনা দত্ত (যোশী) ১৯২৯ সালে চট্টগ্রামের খাস্তগীর হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর সে বছরই চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলে যোগ দেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বিপ্লবী নেতারা যখন চট্টগ্রাম শহরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সরকারি কাজে অচলাবস্থা সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেন, কল্পনা মাটির তলায় রাখা একটি ডিনামাইট-এ ইলেকট্রিক সংযোগ ঘটিয়ে দেওয়ার দ্বায়িত্ব নেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা আগেই প্রকাশ হয়ে পড়ায় অন্যান্য বিপ্লবীদের সাথে কল্পনাও পলাতক হন। পরে তাকে গ্রেপ্তার করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।[৩০]

উজ্জ্বলা মজুমদার তার বাবার মাধ্যমে ছোটবেলা থেকেই ঢাকার বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স-এর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন। ১৯৩৪ সালের ১৮ই মে ২০ বছর বয়সী উজ্জ্বলা দার্জিলিং লেবং রেস কোর্সে বাংলার গভর্নর জন এণ্ডারসনকে গুলি করে হত্যা করার চেষ্টা করে অসফল হন।[৩১] তার ১৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ড সমেত

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। অবশ্য ১৯৩৯ সালে জেনারেল অ্যামনেষ্টিতে সব রাজনৈতিক বন্দির সাথে কল্পনাও মুক্তি পান।

বিপ্লবীদলের মহিলাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। চট্টাগ্রামের পুরসভার একজন সাধারণ কেরানি জগবন্ধু ওয়াদ্দেদারের কন্যা প্রীতিলতা কলকাতায় বেথুন কলেজে পড়ার সময় থেকে 'ছাত্রী সংঘ'-এর একজন নিরলস কর্মী ছিলেন। বেথুন কলেজ থেকেই ডিস্টিংশন নিয়ে বি.এ. পাশ করেন। বি.এ. পরীক্ষার পরেই প্রীতিলতা চট্টগ্রামে ফিরে গিয়ে বিপ্লবী দলের অবিসংবাদী নেতা সূর্য সেনের (মাষ্টারদা) সাথে দেখা করেন, এবং প্রীতির পীড়াপীড়িতে মাষ্টারদা প্রীতিকে পাহাড়তলিতে ইওরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করার দায়িত্ব দেন। এই আক্রমণের স্থান, লক্ষ্য এবং সময় সব কিছুই ঠিক করে দেন মাষ্টারদা। পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর ২১ বছর বয়সী প্রীতি ৭জন বিপ্লবীর একটি দল নিয়ে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ইওরোপীয়ান ক্লাব (পাহাড়তলি ইনস্টিটিউট অফ চিটাগাং হিলস্) আক্রমণ করেন। পুলিশের সাথে গুলি বিনিময়ে আহত প্রীতি নিজের পিস্তলটি অন্য একজনের হাতে তুলে দিয়ে সবাইকে নিরাপদে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন, আর নিজে ধরা পড়ার আগের মুহূর্তে পটাসিয়াম সায়নেড খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।[৩২] প্রীতিলতাই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম নারী শহীদ। এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে নারীর এই সাহস, কার্যাবলী ও আত্মত্যাগ অন্যান্য বিপ্লবীদের পাথেয় হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। নারীর এই রাজনৈতিক জাগরণ ছাড়া বিপ্লবীদের পথ অনেক বেশি কন্টকাকীর্ণ হতো।

হিন্দু জাতীয়তাবাদ

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১) থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের স্বাধীনতা সংগ্রামের অসহযোগে আন্দোলন (১৯২০-২২) এবং তিরিশিরে দশকের বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়েই মহিলাদের অমূল্য অবদান ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের দুটি ধারার মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বিপ্লবাত্মক ভাবধারায় দীক্ষিত নারীপুরুষরা এসেছিলেন সমাজের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। অতি উচ্চ অথবা নিম্নবর্গের মানুষের, বিশেষত নারীর, বিপ্লবাত্মক কাজের সাথে যোগযোগ ঘটেছিল বলে জানা যায় না। আসলে বিপ্লবী ধারাটি ছিল হিন্দু মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'দের দ্বারা পরিচালিত, যাদের অধিকাংশই ছিলেন ব্রাহ্মণ

এবং বৈদ্য। বৈশ্যও ছিলেন কিছু। উচ্চবিত্ত এবং 'ব্লু-কলার' কাজের সাথে যুক্ত দরিদ্র কৃষক শ্রমিক পরিবারের নরনারীকে এখানে পাওয়া যায়নি। আর দলিতরা প্রায় সবাই এই আন্দোলনের বাইরে থেকে গেছেন। এই কারণেই বিপ্লবাত্মক আন্দোলন কখনও জনসাধারণের আন্দোলনের রূপ নেয়নি। অনুমান করা যায় তিরিশের দশকের মধ্যভাগে এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাওয়ার এটিই ছিল অন্যতম কারণ। সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের অভাবের ফলেই বিপ্লবী নেতা ও কর্মীদের মধ্যে কারও কারও জেল, কারও কারও ফাঁসি এবং কেউ কেউ পলাতক হওয়ার পর এই আন্দোলন আর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তিরিশ-এর দশকের মধ্যভাগে ভেঙ্গে পড়া এই বিপ্লবী আন্দোলন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সাথে যোগাযোগহীন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত দ্বারা পরিচালিত যে কোন আন্দোলনের সীমাবদ্ধতাকেই প্রমাণ করে। বিপ্লবাত্মক এই আন্দোলন কোন স্তরেই জাতীয় আন্দোলন হয়ে উঠতে পারেনি।

বিপরীতে গান্ধীজির নেতৃত্বে অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে উচ্চ এবং নিম্নস্তরের সব মানুষেরই স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেওয়ার সুযোগ ঘটেছিল। এদের সকলকে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে টেনে আনাই ছিল গান্ধীজির বড় কৃতিত্ব। বিশেষত আইন অমান্য আন্দোলন এবং 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের পর্যায়ে দরিদ্র কৃষক শ্রমিক পরিবারের নারীরাও অনায়াসে এই আন্দোলনের শরিক হতে পেরেছিলেন। গান্ধীজি তথাকথিত অস্পৃশ্য অথবা 'হরিজন'দেরও এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত করার কাজটি সম্পন্ন করে স্বাধীনতা আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে গান্ধীজির কাজের বড় ত্রুটি ছিল এই যে আপাতদৃষ্টিতে গান্ধীজিকে নীচু জাতির প্রতি সহানুভূতিশীল মনে হলেও তিনি কখনও এই আন্দোলনের মাধ্যমে জাতিবর্ণগত বৈষম্য দূরীকরণের চেষ্টা করেন নি। চাতুর্বর্ণ্যে বিশ্বাসী গান্ধীজী তার প্রিয় 'হরিজন'দের হিন্দুধর্মের মধ্যে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করার আগ্রহ কখনও দেখান নি। ফলে জাতীয় আন্দোলনের সেই কালে ভারতীয় সমাজের জাতিবর্ণগত অসাম্যের মূলে কুঠারাঘাত করার একটি সুবর্ণ সুযোগ আমরা হারিয়েছি।

তাছাড়া স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা গান্ধীজি ছিলেন কট্টর হিন্দু। দেশবাসীকেও তিনি হিন্দু আদর্শে উদ্দীপিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। সবরমতী আশ্রমে তিনি প্রত্যহ গীতা পাঠের প্রচলন করেছিলেন। প্রতি ৩ দিনে সেখানে একবার গীতা পাঠ সমাপ্ত করা হতো। আর গান্ধীজির প্রত্যেকটি মিটিং শুরু হতো

'শ্রীরাম'এর জয়গান দিয়ে, যে গানের প্রতিলিপি হল ঃ

রঘুপতি রাঘব রাজারাম, পতিত পাবন সীতারাম।
ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম, সবকো সম্মতি দে ভগবান॥

অনুমান করা যেতে পারে যে গীতাপাঠ ও রঘুপতি রাঘবের জয়গান করে গান্ধীজি জনসাধারণের মধ্যে দেশপ্রেম ও বীরত্ব জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এদেশের মুসলিমদের পক্ষে রামকে তাদের আল্লা বলে মেনে নেওয়ার কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ ছিল কি? নিতান্ত শিশুও জানে যে রামায়ণের গল্পের রামসীতা এদেশে আদর্শ হিন্দু দেবদেবী তথা আদর্শ দম্পতি রূপে পূজিত। হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে কোন বিভেদ তৈরী করা গান্ধীজির উদ্দেশ্য না হলেও একথা বললে মনে হয় ভুল হবে না যে রামভক্তি দিয়ে জনসাধারণকে স্বাধীনতা আন্দোলনে টেনে আনার চেষ্টার ফলে মুসলিমরা আরও দূরে সরে গিয়েছিলেন। আর সেই রামসীতা ও হনুমানকে ব্যবহার করেই আজও কিছু মৌলবাদী রাজনৈতিক শক্তি নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টায় হিন্দুমুসলমান সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়েছে।

উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এদেশে যে হিন্দু জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটিয়েছিলেন, তার প্রভাব তো শ্রী অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন চন্দ্র পাল, বাল গঙ্গাধর তিলক প্রভৃতি জাতীয় স্তরের নেতাদের উপর ছিলই। তদুপরি গান্ধীজির প্রভাবও জাতীয় স্তরের বহু নেতা এবং কর্মীদের ধর্মীয়ভাবে আপ্লুত করেছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে শ্রী অরবিন্দ ঘোষ, যিনি পরে পণ্ডিচেরীর আশ্রমে জীবন কাটিয়েছেন, কলকাতায় গুপ্ত সমিতির সাথে যুক্ত থাকার সময় এবং পরে জেলেও নিয়মিত গীতা পাঠ করতেন। আর স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম নারী শহীদ প্রীতিলতার মৃত্যুর পর তার জামা কাপড়ের মধ্য থেকে কৃষ্ণের ছোট বাঁধানো ছবি আবিস্কৃত হয়েছিল। এছাড়া, আরও উল্লেখ্য যে গান্ধীজির অন্যতম শিষ্যা এবং ১৯২৭ সালে আইনসভার (মাদ্রাজ কাউন্সিলের) প্রথম ভারতীয় মহিলা সদস্য ডাঃ এস. মুঠুলক্ষ্মী রেড্ডি নারীশিক্ষার উন্নতি কল্পে নল-দয়মন্তি, সাবিত্রী-সত্যবান প্রভৃতির আদর্শ বিদ্যালয়ের অবশ্য পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।[৩৩] ভারতীয় নেতা ও কর্মীদের এই ধর্মীয় আতিশয্যের ফলেই দেশ বিভাগের মধ্য দিয়ে ভারতকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়েছে। আর স্বাধীনতা আন্দোলনের সেই কালে হিন্দু ধর্মীয় প্রাবল্যের ফলেই এ দেশে সাম্প্রদায়িকতার বীজ রোপিত হয়েছিল। সেই সময়ে এই প্রকট

ধর্মীয় মাত্রা বর্জন করতে পারলে এবং জাতিবর্ণ ও শ্রেণীগত বৈষম্য সম্বন্ধে একটু প্রগতিশীল মনোভাব গ্রহণ করতে পারলে স্বাধীনতা উত্তর রাজনীতিতে সংখ্যালঘু সহ সমস্ত সাধারণ নরনারীর অংশগ্রহণের পথ অনেকখানি সহজ হতো।

পাদটীকা

(১) বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, চতুর্থ খণ্ড, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পার্বিলাশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ৩১-৩৬।

(২) Nawaz B. Mody (ed), *Women in India's Freedom Struggle*, Allied Publishers Ltd. Mumbai, 2000 ; Tirtha Mondal, *Women Revolutionaries of Bengal*, 1905-1939, Minerva, Calcutta, 1991 ; "Kamala Devi Chattopadhyay, *Indian Women's Battle for Freedom*, Abinav Publications, 1983 ; কৃষ্ণকলি বিশ্বাস, স্বাধীনতা সংগ্রামের মঞ্চে ভারতের নারী, ফার্মা কে, লে এম, ১৯৮৭।

(৩) Mahatma Gandhi, *Young India*, 26. 2. 1918.

(৪) Radha Krishna Sharma, *Nationalism, Social Reform and Indian Women 1921-1937*, Janaki Prakashan, Patna, New Delhi, 1981, p. 198.

(৫) Mahatma Gandhi, *Young India*, 14. 1. 1932.

(৬) Alpana Basu "The Role of Women in the Indian Struggle for Freedom" in B. K. Nanda (ed.) *Indian Women · From Pardah to Modernity*, Radiant Publications, New Delhi, 1990, p.102.

(৭) Kamala Devi Chattopadhyay , "Struggle for Freedom" in Baig, Tara Ali (ed.) *Women in India*, Publication Division, Government of India, New Delhi, 1958, p. 19.

(৮) *Annual Report of Ninth AIWC*, 1934, p. 29 ; Raj Kumari Amrit Kaur, *Challenge to Women*, Allahabad, New Literature, 1946, p. 65.

(৯) O' Malley, LSS (ed),*Modern India and the West*, Oxford University Press, London, 1968, p. 476.

(১০) Nawaz B. Mody, *op. cit*, p. 291.

(১১) *ঐ*, ফুট নোট ৭.

(১২) *ঐ*, ফুট নোট ৯ এবং ১০।

(১৩) Jawaharlal Nehru, *Discovery of India*, Signet Press, Calcutta, 1946., p. 27.

(১৪) Nawaz B. Mody, *op. cit*, p. 2৬4.

(১৫) রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ঐ. পৃ. ৬।

(১৬) কমলা দাশগুপ্ত, *রক্তের অক্ষরে,* পৃ. ২৭৬-২৭৭।

(১৭) *Dictionary of National Bibliography*, Institute of Historical Studies, Calcutta, 1974, vol. I pp. 445-447

(১৮) Tirtha Mondal, *op cit,* p. 91 ; রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *ঐ,* পৃ. ৫৬৫-৫৬৬।

(১৯) কমলা দাশগুপ্ত, *রক্তের অক্ষরে,* পৃ. ২৯-৩১ এবং ৩৯-৪৩।

(২০) *ঐ,* পৃ. ৩৭।

(২১) Tirtha Mondal, *op. cit*, p. 66.

(২২) Kalpana Datta, *Reminiscences*, pp. 25-27.

(২৩) Tirtha Mondal, *op. cit,* p. 108 ; রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ঐ, পৃ. ৫৬৪।

(২৪) Short Career of Lila Roy, *Jayasree*, Lila Roy Birthday volume, p. 266.

(২৫) কমলা দাশগুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী,* পৃ. ৯১-৯৩।

(২৬) *ঐ,* পৃ. ১৪৩-১৪৪ ; Tirtha Mondal, op. cit, p. 70.

(২৭) Tirtha Mondal, Ibid, pp. 70-71.

(২৮) কমলা দাশগুপ্ত, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী,* পৃ. ১১৩ ;রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *ঐ,* পৃ. ৫৬৪।

(২৯) Tirtha Mondal, *op. cit,* p. 87; রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ঐ, পৃ. ৫৬৪।

(৩০) Ibid, p. 103 ; *ঐ* ।

(৩১) Ibid, pp. 103-104 ; *ঐ* ।

(৩২) Ibid ; *ঐ* ।

(৩৩) Prabha Rani, "The Women's Assoications and the Self-Respect Movement in Madras, 1925-1937 : Perceptions on Women" In Leela Kasturi and Vina Mazumdar (ed), *Women and Indian Nationalism*, Vikas, 1984, p. 95.



গণঅভ্যুত্থানে নারী

ভারতের অগণিত নারী শুধু বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামেই সক্রিয় অংশগ্রহণ করেননি, বিদেশি শাসকের মদত পুষ্ট বিভিন্ন জমিদার জোতদার মহাজনদের শাসন শোষণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন গণঅভ্যুত্থানে সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। তবে কৃষক শ্রমিক পরিবারের নারীরাই প্রত্যক্ষভাবে জমিদার তথা মহাজনদের শ্রেণী শোষণের এবং সেই সঙ্গে আবার যৌন অত্যাচারেরও শিকার ছিলেন বলে এসব জমিদার জোতদারদের বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভে অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আর এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে আদিবাসী রমণীদের কথা।

রামায়ণের যুগেও আমরা তাড়কা রাক্ষসীর রূপক কাহিনীর মধ্যে দেখতে পাই বনাঞ্চলে আর্য ডিকুদলের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে অরণ্যবাসী নারীর আপোষহীন প্রতিরোধ। আধুনিক যুগেও অরণ্যবাসী নারীর সেই প্রতিরোধের বিরাম নেই। ইংরেজ রাজত্বে এদেশে অরণ্যবাসী ও পর্বতবাসী উপজাতিদের অগণিত অভ্যুত্থান ও প্রতিরোধের ইতিহাস পাওয়া যায়। এসব গণপ্রতিরোধে ও গণসংগ্রামে আদিবাসী নারীদের ভূমিকা পুরুষের চেয়ে কম ছিল না। এসব আদিবাসী অভ্যুত্থানের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল ১৮৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ। বেশ কয়েক বছর স্থায়ী এই গণবিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা সংগ্রামের রূপ নিয়েছিল এবং বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্রিটিশ শাসনের বাইরে চলে গিয়েছিল। সৈন্যবাহিনীর ব্যাপক নৃশংস অভিযানের সাহায্যে এই বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত দমন করা হলেও এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আদিবাসীদের এই বিরাট ভূমিকার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। আর এই সংগ্রামে অগণিত সাঁওতাল নারী ঘরে বাইরে সমানভাবে অংশ নিয়েছিলেন। সাঁওতাল নারীদের কেউ কেউ বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করে 'সাঁওতাল ঠাকুরাণী'র উচ্চ সম্মানও লাভ করেছিলেন। উনিশ শতকের শেষার্ধে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে কৃষক শ্রমিক বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিতে থাকে, তাতেও নারীদের

এক সক্রিয় ভূমিকার কথা পাওয়া যায়। বাংলার বীরভূমের পাহাড়িয়া বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ এবং সাঁওতাল বিদ্রোহেও নারীদের অতুলনীয় ভূমিকা ছিল।

ওয়ারলি বিদ্রোহ ঃ ১৯৪৫-৪৭

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্বে বিদেশি শাসকদের সমর্থন পুষ্ট জমিদার জোতদার মহাজনদের বিরুদ্ধে সংগঠিত ১৯৪৫-৪৭ সালের মহারাষ্ট্রের ওয়ারলি বিদ্রোহেও অগণিত আদিবাসী ও ওয়ারলি নারী অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইংরেজ রাজত্বকালে এদেশের অনেক আদিবাসী নিজেদের জমি হারিয়ে ভূমিহীন কৃষক অথবা ভাগ চাষিতে রূপান্তরিত হন। জমির মালিকানা চলে যায় ইংরেজের ধামা ধরা উচ্চবর্ণের জমিদার মুৎসুদ্দিদের হাতে। আর ফলে অনেক জায়গায়ই পুঞ্জীভুত অসন্তোষ বিদ্রোহের আকার নেয়। এ রকমের একটি অসন্তোষই আত্মপ্রকাশ করেছিল মহারাষ্ট্রের থানে জেলার পার্বত্য অঞ্চলের ওয়ারলি বিদ্রোহে। ১৯৪১ সালে এই জেলার আদিবাসীদের মধ্যে ৪৮.৫ শতাংশ ছিলেন ওয়ারলি আদিবাসী। বহুদিন আগেই এরা নিজেদের জমি হারিয়ে পর্যবসিত হয়েছিলেন ভাগ চাষিতে। উনিশ শতকের মধ্যভাগে বম্বে শহর থেকে থানে পর্যন্ত প্রথম রেললাইন স্থাপিত হওয়ার (১৮৫৩) পর থানে জেলার কৃষি ও বনজ সম্পদ নিয়ে জমিদার তথা মহাজন শ্রেণী গড়ে তোলেন এক লাভজনক ব্যবসা। জমিতে ধান ও অন্যান্য খাদ্যশস্য ছাড়া আরও চাষ করা হতো পশুখাদ্য হিসেবে ঘাস। এই ঘাস উচ্চমূল্যে বিভিন্ন ডেয়ারীতে বিক্রি করে জমিদারের মুনাফা বাড়তো। তাছাড়া কাঠ এবং অন্যান্য বনজ সম্পদ নিয়ে কন্ট্রাক্টারদের অধীনে গড়ে উঠেছিল ফলাও ব্যবসা। এই সব কিছুতেই শ্রমিকের যোগান দিতেন আদিবাসীরা। জমিদার মহাজন কন্ট্রাক্টারদের লাভের অঙ্ক বৃদ্ধি পেয়েছে শোষিত আদিবাসী, বিশেষত ওয়ারলিদের, অশ্রু আর শোণিতের বিনিময়ে। শোষণের চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছিল দাস শ্রমিক প্রথার মাধ্যমে। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ, প্রভু এবং কিছু কুন্‌বি জমিদার স্থানীয় আদিবাসীদের কাছ থেকে বিনা পারিশ্রমিকে বাধ্যতামূলক শ্রম (ভেট) আদায় করতেন। যদিও নিয়মানুযায়ী ভাগচাষীদের উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশই ছিল প্রদেয় খাজনা। চাষের মরশুমে ওয়ারলিদের সাধারণত মাসে ১০ দিন এই 'ভেট' বা শ্রম দান করার রীতি প্রচলিত হলেও অনেক সময়ই জমিদারগণ প্রয়োজনানুযায়ী অনেক বেশি শ্রম আদায় করে নিতেন। ফলে ওয়ারলিরা নিজেদের জমিতে চাষ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতেন। আরও ছিল বিশেষ ধরনের 'বিবাহ-

দাস' বা 'লগন গারি', যার ফলে হত দরিদ্র এই আদিবাসীরা তাদের বিবাহের সময় অল্পকিছু খাদ্যশস্য ধার নিয়ে প্রায় সারাজীবনের জন্য স্ত্রী পুত্র নিয়ে দাস শ্রমিকে পরিণত হতেন। কারণ মহাজনের দুর্নীতির ফলে এই ধার শোধ করা সম্ভব হতো না কোনদিন। আর এই অবস্থা চলেছিল কয়েক প্রজন্ম ধরে।[১]

আদিবাসী নারীদের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়, প্রধানত তারা নারী বলেই। দাস শ্রমিকের স্ত্রী কন্যাকে মহাজনগণ নিজেদের সম্পত্তি বলেই মনে করতো। নিজেদের ভোগের জন্য, এমনকী, অতিথি আপ্যায়নের জন্যও যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করতো এইসব আদিবাসী মহিলাদের। জমিদার মহাজনের গুণ্ডারা যে কোন সময় যে কোন নারীকে ধরে নিয়ে যেতে পারতো। বাধা দেওয়ার অর্থ ছিল অকথ্য অত্যাচার ও মৃত্যু। আদিবাসী শোষণের রূপটি শুধু শ্রেণী শোষণ ছাড়াও নারী শোষণের এক বিশেষ মাত্রা পেয়েছিল।

নির্বিচার এই অন্যায় অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে ওয়ারলি নারীপুরুষদের মধ্যে যে ক্ষোভ দীর্ঘদিন ধরে ধূমায়িত হচ্ছিল, তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৪৫-৪৭ সালের বিদ্রোহে। মহারাষ্ট্রের থানে জেলার অন্তর্গত দাহানু ও উম্বারগাও তালুক ছিল এই বিদ্রোহের কেন্দ্রস্থল, যেখানে আদিবাসীদের মধ্যে ৫৫ শতাংশই ছিল ওয়ারলি। অবিভক্ত ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির কিষান সভার দ্বারা সংগঠিত এই ওয়ারলি বিদ্রোহের মূল দাবি ছিল তিনটি ঃ (১) বাধ্যতামূলক শ্রমদান বা 'ভেট' প্রথা বন্ধ করা ; (২) 'বিবাহ-দাস' এবং দাস শ্রমিক প্রথার উচ্ছেদ করা ; চাষের জমিতে ও জঙ্গলে মজুরি বৃদ্ধির মাধ্যমে শ্রমিকের কাজের উপযুক্ত মজুরির ব্যবস্থা করা। বিদ্রোহের প্রথম পর্যায়ে আদিবাসী নারীরা পুরুষের সাথে প্রায় সমানভাবে বিভিন্ন কনফারেন্স, মিটিং ও মিছিলে যোগ দিয়েছেন। এমন কি ছোট শিশু সন্তানকে সঙ্গে নিয়েও নারীরা মিটিংএ সমবেত হয়ে 'ভেট' প্রথার বিরুদ্ধে তাদের বিক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আন্দোলনের একটি স্তরে বিদ্রোহী নারী পুরুষের উপর জমিদারদের গুণ্ডা ও পুলিশের অত্যাচার নেমে এলে নারীরা বিস্ময়কর মানসিক দৃঢ়তা ও সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। এটাই ছিল তাদের প্রকৃত পরীক্ষার সময়। অনেক সময়ই পলাতক পুরুষদের সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে এদের মা ও স্ত্রীদের উপর অত্যাচারের মাত্রা সহ্য করার ক্ষমতাকে অতিক্রম করে যেত। নির্বিচারে প্রহারের পর গ্রেপ্তার করে এদের বিভিন্ন থানা হাজতে রেখে দেওয়া হতো দিনের পর দিন। কয়েকদিন ধরে অমানুষিক অত্যাচার ও অনাহার সহ্য করেও এসব নারীরা কিন্তু কখনও তাদের স্বামী পুত্রের

ঠিকানা জানিয়ে দেন নি। অন্যদিকে অনেক অনাত্মীয় নারীরাও পলাতক পুরুষদের নিজের গৃহে গোপনে আশ্রয় দান করেছেন। এদের মধ্যে অনেকে আবার প্রাণের ভয় তুচ্ছ করে জঙ্গলে পলাতক পুরুষদের জন্য ছোট ছোট খাবারের প্যাকেট সন্ধ্যার অন্ধকারে গাছের ডালে ডালে ঝুলিয়ে রেখে আসতেন রাত্রে পুরুষদের আহারের জন্য। পুলিশ এবং জমিদার মহাজনের গুণ্ডাবাহিনীর অকথ্য মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন সত্ত্বেও কিন্তু এই আদিবাসী নারীরা একজনও ভেঙ্গে পড়েননি অথবা নতি স্বীকার করেন নি। নারীদের এই কঠিন মনোবল এবং সক্রিয় সহযোগিতার ফলেই আদিবাসীদের পক্ষে জমিতে ও জঙ্গলে সমস্ত কাজকে অচল করে দিয়ে আন্দোলন সফল করা সম্ভব হয়েছিল। বিদ্রোহের একটি পর্যায়ে 'বিবাহ-শ্রমিক'রা মুক্তি লাভ করলে নারীরাই সকলের আগে জমিদারের চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে এসে মুক্তির আনন্দ উপভোগ করেছেন।[২]

আন্দোলনের আংশিক সাফল্যের পর ওয়ারলিরা বড় বিদ্রোহের দিকে এগিয়ে গিয়ে চাষের জমিতে ও জঙ্গলের কাজে লাগাতার হরতাল পালন করতে থাকেন। পুলিশের দমননীতির সামনে বহু ওয়ারলি পুরুষ এবং কিছু নারীও জঙ্গলের গভীরে গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নেন। বাড়িতে থাকেন বৃদ্ধ, শিশু ও তাদের পরিচর্যার জন্য নারী। সেখানেও নারীরা প্রয়োজনে লাঠি, বর্শা, বল্লম, কুড়ুল ইত্যাদি নিয়ে পুলিশ ও গুণ্ডাদের মোকাবিলা করেছেন। বিদ্রোহের শেষ দিকে ওয়ারলি নারীপুরুষ জমিদারদের খামারগুলি আক্রমণ করে খড়ের গাদায় ও সঞ্চিত খাদ্যশস্যের ভাণ্ডারে আগুন লাগিয়ে, ফলের বাগান ধ্বংস করে এবং সেই সঙ্গে দু একজন জমিদার মহাজনকে হত্যা করে বহুকালের অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়েছেন। পুলিশি দমননীতিও এই সময়ই চরম আকার ধারণ করে। ফলে বিদ্রোহ সফল হলেও বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত প্রায় সব পুরুষকেই এবং সঙ্গে কিছু নারীকেও দীর্ঘসময় বিনা বিচারে কারাবাস করতে হয়েছে।[৩] একাধারে শ্রেণী ও নারী শোষণের শিকার এই নারীদের রাজনৈতিক জাগরণ না ঘটলে এবং এই নারীরা পুরুষের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ না করলে আদিবাসী ওয়ারলি কৃষক শ্রমিকের এই বন্ধনমুক্তি সুদূর পরাহত হতো সন্দেহ নেই।

তেভাগা আন্দোলন

১৯৪০-এর দশকের শেষ দিকে (১৯৪৬-৪৭—১৯৫১-৫২) জাতীয় আন্দোলনের

সাথে আংশিকভাবে যুক্ত হয়ে সাম্রাজ্যবাদের মুৎসুদ্দি উচ্চবর্ণের জমিদার ও জোতদার শ্রেণীর সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তদানীন্তন বাংলার তেভাগা আন্দোলন নামে যে কৃষক অভ্যুত্থান ঘটে, সে অভ্যুত্থানের বিভিন্ন পর্যায়ে তপশিলী জাতি/উপজাতি এবং মুসলিম নারীদের সংগ্রামী ভূমিকা রচিত হয়েছিল তাদেরই অশ্রু আর রক্তে।[৪]

বাংলার ভূমিহীন ভাগচাষীরা উৎপাদনের সমস্ত ব্যয় বহন করেও ফসলের (ধান) অর্ধেক. গ্রামে অনাবাসী জমিদার ও জোতদারদের খোলান বা খামারে তুলে দিতে বাধ্য হতেন। আর চাষীর নিজের অর্ধাংশ থেকেও জোতদারের খোলা চাঁছা, গোলপুজো, মহলদারী, বরকন্দাজী, মণ্ডপ সেলামি, হাতিখোয়া, ঘোড়াখোয়া, সন্ন্যাসীখোয়া (এদের খাওয়ানোর খরচ), মাছ্ খাওয়ান, পালাপার্বণ, যাত্রাথিয়েটারের খরচ এবং কর্জ করা ধানে দেড় বা দুই গুণ সুদ বাবদ বাড়তি ধান দিতে হতো জোতদারকে। ফলে অনেক সময় চাষীর ভাগ্যে কিছুই জুটত না। তাকে কাটাতে হতো অর্দ্ধাহারে বা অনাহারে। আর ময়মনসিং জেলার হাজং আদিবাসী অধ্যুষিত সুসঙ্গ ও গাড়ো পাহাড় অঞ্চলে বর্গাদারির প্রচলিত টংকা নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক জমি থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল জোতদারের খামারে তুলে দেওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি অথবা অন্য কোন কারণে ফসল উৎপন্ন না হলেও এ থেকে কোন নিষ্কৃতি ছিল না। সেই সঙ্গে ছিল বর্গাচাষীর বেগার শ্রমদানের নিয়ম। বলা বাহুল্য, এই পরিস্থিতিতে চাষী পরিবোরের কর্মী মহিলারা ছিলেন নিদারুণভাবে শোষিত ও নিষ্পেষিত। সে ইতিহাস দীর্ঘায়িত না করে সংক্ষেপে বলা যায়, শুধু নিদারুণ দারিদ্রের চাপেই এরা নিপীড়িত ছিলেন না, জমিদার জোতদারের খামখেয়ালীপনায় পরিচালিত হতো এদের বিবাহিত জীবন, খোয়াতে হতো নারীত্বের মানসম্ভ্রম। জোতদারের শাসন, শোষণ, নির্বিচার নির্যাতন ও ধর্ষণের ফলে এই কৃষক রমণীদের মনে নীরবে যে ক্ষোভ দীর্ঘদিন ধরে ধূমায়িত হচ্ছিল, তারই কিছুটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে উঠেছিল তেভাগা অভ্যুত্থানের প্রেক্ষিতে।

পাকা ফসলের তিনভাগের দুইভাগ চাষীর, আর একভাগ জোতদারের, এই প্রধান দাবিতে ১৯৪৬-৪৭ সালে বাংলার ১৯টি জেলায় কৃষক ও জোতদারের বিরুদ্ধে চাষী পরিবারের মহিলারা যে আক্রমণাত্মক ও আত্মরক্ষামূলক ভূমিকা পালন করেছেন আন্দোলনের সমস্ত পর্যায়ে, তা তাদের রাজনৈতিক সচেতনতাই প্রমাণ করে। তখনকার অবিভক্ত ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির পরিচালনায় গড়ে ওঠা 'কিষান

সভা'র ডাকে পুরুষের সাথে নারীরাও লাঠি ও লাল ঝাণ্ডা কাঁধে নিয়ে মিছিল মিটিং-এ বক্তৃতা দিয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর গরু বাছুর চড়ানোর অছিলায় গ্রাম পাহারা দিয়েছেন এবং শঙ্খ, ঘন্টা, কাঁসর বাজিয়ে পুলিশের আগমন বার্তা জানিয়ে সবাইকে সতর্ক করেছেন। তিনভাগের দুইভাগ ফসলের দাবিতে জোর করে মাঠের ফসল কেটে নিজেদের গোলায় আনা এবং প্রয়োজনে লড়াই করে প্রাণ দেওয়ার জন্য নারীদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল 'ঝাঁটা বাহিনী', 'বঁটি বাহিনী', 'গাইন বাহিনী', 'প্রতিরোধ বাহিনী' এবং 'নারীরক্ষা বাহিনী'। পুরুষরা মাঠে ধান কাটতে শুরু করলে মেয়েরা তাদের সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় দা, বঁটি, ঝাঁটা, গাইন, লাঠি, ছুরি এবং প্রয়োজনে বল্লম নিয়ে আগ্নেয়াস্ত্রধারী পুলিশবাহিনীর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ ভাবে লড়াই করেছেন, মাঠের ধান কেটে গোলায় তুলেছেন। অনেক সময় আবার পুলিশের বন্দুক কেড়ে ভেঙ্গেছেন, পুলিশ ও জোতদারকে মেরে নিজেদের জীবনের হতাশা ও বঞ্চনার প্রতিশোধ নিয়েছেন, নিজেরাও প্রাণ দিয়েছেন। তেভাগা আন্দোলনের সাথে জড়িত অংসখ্য নারীদের মধ্যে উত্তর ময়মনসিংহের রাসমণি দেবী, যশোরের সরলাদি এবং মেদিনীপুরের বিমলা মাঝি সাহসিকতা ও বীরত্বে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছেন। এই অসফল আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে 'কিষান সভা' আন্দোলন থেকে সরে গেলে নারীরাই প্রায় পুরো নেতৃত্বের ভার নিয়ে নেন, আর সেই সঙ্গে প্রমাণ করেন তাঁদের শ্রেণীসংগ্রামের চেতনা।[৫]

তেভাগা আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি দিনাজপুর, যশোর, ময়মনসিং, জলপাইগুড়ি এবং মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা (কাকদ্বীপ ও মথুরাপুর) হলেও ১৯টি জেলার বহু জায়গাতেই এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে এই আন্দোলনে রাজবংশী, নমশূদ্র, হাজং, সাঁওতাল, ওরাওঁ এবং মুসলিম নারীরা জাত-পাতের বেড়া ভেঙ্গে ঐক্যসুত্রে বাঁধা পড়েছিলেন।[৬] দিনাজপুরের মহিলা সংগঠক শ্রীমতী রানী দাশগুপ্তের ভাষায় ঃ "শুধু হিন্দু মুসলমান ঐক্য নয়, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ইতিপূর্বের কোন পর্যায়েই গ্রামের বর্ণহিন্দু, রাজবংশী, বর্ণক্ষত্রিয়, নমশূদ্র, মাহিষ্য, সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডা, ওরাওঁ প্রভৃতি জাতি-উপজাতির কৃষকের দুর্লংঘ্য সামাজিক ব্যবধান দূর করা সম্ভব হয়নি। তেভাগা আন্দোলন এই ব্যবধানের বিলুপ্তি ঘটিয়েছিল।"[৭]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে উত্তরবঙ্গের তেভাগা (এবং পরবর্তীকালে নক্সালবাড়ি) কৃষক আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েই গড়ে উঠেছিল জলপাইগুড়ি ডুয়ার্স অঞ্চলের চা -বাগানের শ্রমিক আন্দোলন। প্রধানত তেভাগা আন্দোলন থেকে শক্তি

সঞ্চয় করে চা বাগানের পুরুষ ও নারী শ্রমিকরা পঞ্চাশ-এর দশক থেকে বর্ধিত মজুরি, বোনাস, অসুস্থতাজনিত ভাতা এবং কোরিয়া যুদ্ধের প্রেক্ষিতে মালিক শ্রেণীর বাড়তি লভ্যাংশের দাবিতে সোচ্চার ছিলেন। তেভাগা এবং পরে নক্সালবাড়ি কৃষক আন্দোলনের অনেক মিটিং ও মিছিলে চা-বাগানের শ্রমিক নারী পুরুষ শামিল হয়েছেন। আবার অনুরূপে চা বাগানের আদিবাসী শ্রমিক নারীরা তেভাগা আন্দোলনের কৃষক নারীদের সাথে ঐক্যসূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। দুটি আন্দোলনই ছিল মূলত শ্রেণীশত্রুর বিরুদ্ধে সর্বহারা বা প্রলেটেরিয়ানদের আন্দোলন। উত্তরবঙ্গের কৃষক আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়েই সেখানকার চা বাগানের আদিবাসী সাঁওতাল এবং ওরাওঁ নারীরা নিজেদের জন্য পুরুষের সমান মজুরি, বোনাস, অসুস্থতাজনিত ভাতা ইত্যাদি আদায় করে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। আরও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই যে আন্দোলনকারী আদিবাসী নারী শ্রমিকদের মধ্যে কিছু কিছু স্থানীয় নেতৃত্ব গড়ে উঠেছিল, আর এদের মধ্যে অনেকে শ্রমিক ইউনিয়ন-এর সদস্যও হয়েছিলেন।[৮]

তেলেঙ্গানা কৃষক বিদ্রোহ

তেভাগা আন্দোলনের সমকালেই হায়দ্রাবাদের নিজাম-এর সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থা, প্রজাস্বত্বহীন বর্গাদারদের নির্বিচার উৎখাত, বেআইনি খাজনা আদায় ও বাধ্যতামূলক বেগার শ্রমের বিরুদ্ধে 'কিষান সভা' ও 'অন্ধ্র মহাসভার' নেতৃত্বে তেলেঙ্গানায় কৃষকদের যে শ্রেণীসংগ্রাম হয়,[৯] তাতেও এই সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীর ভূমিকা পুরুষের অপেক্ষা বেশী ছাড়া কম ছিল না। তেলেঙ্গানায় বেগার শ্রমের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে প্রজাদের জাতিবর্ণ অনুযায়ী পুরুষানুক্রমিক বৃত্তিতেই তাদের এই শ্রমদান করতে হতো। হরিজনদের লাগানো হতো দেশমুখ ও জমিদারদের বাড়িতে বর্জ্য পদার্থ পরিষ্কার করানোর কাজে, ধোপার কাজ ছিল জামাকাপড় কাচা আর নাপিতের কাজও ছিল তার বৃত্তি অনুযায়ী। আর জমিদারের বাড়িতে নারী শ্রমিকদের বেগার শ্রমের পরিধি ছিল গৃহপরিচারিকা থেকে যৌনভোগ্যা পর্যন্ত। বহুকালের এই প্রতিকারহীন দিনযাপনের গ্লানির মধ্যেই প্রধানত সুপ্ত ছিল নারী বিদ্রোহের বীজ।

তেলেঙ্গানা আন্দোলনে শয়ে শয়ে নারী মিটিং-এ, মিছিলে সমবেত তো হতেনই, বক্তৃতাও দিতেন। অনেক সময় তাদের জঙ্গি মনোভাব পুরুষদেরও ছাড়িয়ে যেতো। এই সময় নারীদের মধ্যে থেকেই এক ধরনের নেতৃত্বও গড়ে ওঠে। আন্দোলনের

একটি পর্যায়ে বলপূর্বক বর্গাদারদের মধ্যে জমি বন্টন করে দেওয়ার সময় রাজাকার ও পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে নারীর প্রধান অস্ত্র ছিল লংকার গুঁড়ো ও পাথর। গেরিলা যুদ্ধের পর্যায়ে বহু নারী লাল অঞ্চল-এ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং রাজাকার ও পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধেও অবতীর্ণ হয়েছেন। প্রাণ নিয়েছেন এবং দিয়েছেনও। এক সময় জঙ্গল গেরিলা বাহিনী থেকে নারীদের সরিয়ে দেবার প্রশ্ন উঠলে তারা এর তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং অনেক বাধা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত এই বাহিনীতেই থেকে যান।[১০] পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের বাঁধন কেটে বেরিয়ে আসার এক ঐকান্তিক প্রচেষ্টাও মনে হয় তাদের মধ্যে ছিল। তারা এক মুক্তজীবনের স্বাদ অনুভব করেছিলেন এই রণপ্রাঙ্গণে। প্রায় শেষ পর্যায়ে 'কিষান সভা' যখন আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ায়, তেভাগার মতো এখানেও অনেক জায়গায় নারীরাই নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন। কিন্তু কঠোর সরকারি দমননীতির সামনে, সৈন্যদের মারাত্মক আক্রমণের সামনে সমস্ত প্রতিরোধ খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। আর অনেকদিনের ঘরছাড়া নারীরা শূন্যহাতে আবার ঘরে ফিরতে বাধ্য হন। কিন্তু সে ঘর কী আর তখন ঘর ছিল? সেদিনের রাজনীতি থেকে কত নারী যে কোথায় কিভাবে হারিয়ে গেলেন, তার খানিকটা মাত্র ইতিহাস সম্প্রতি বিবৃত হয়েছে ছাপার অক্ষরে।[১১]

নক্সালবাড়ি ও অন্যান্য কৃষক আন্দোলন

স্বাধীনতা উত্তর ভারতে কম্যুনিষ্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়ার (এম. এল) নেতৃত্বে উত্তরবঙ্গে (প্রধানত নক্সালবাড়ি, খড়িবাড়ি ও ফাঁসি দেওয়া) ও বিহারে যে নক্সাল আন্দোলন শুরু হয় (১৯৬৭)[১২], সেখানেও প্রথম থেকেই অসংখ্য নিম্নবর্গের মহিলা, বিশেষত রাজবংশী, তপশিলী জাতি ও উপজাতির ভাগচাষী, বর্গাদার ও ভূমিহীন শ্রমিক পরিবারের মহিলা এই আন্দোলনের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থেকে তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতার প্রমাণ রেখেছেন। এরা মিটিং-এ ও মিছিলে বর্গাদারদের উৎখাতের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন, পুরুষদের সাথে একসঙ্গে জোর করে মাঠের ধান কেটে এনে ঘরে তুলেছেন, জোতদারের জমি, পশু ও অন্যান্য সম্পত্তি দখল করতে সাহায্য করেছেন। একটা পর্যায়ে আত্মগোপনকারী নেতৃস্থানীয় পুরুষদের আশ্রয় দিয়েছেন, তাদের অন্নবস্ত্র জুগিয়েছেন, বিভিন্ন গুপ্ত আস্তানার মধ্যে কুরিয়ারের কাজ করে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছেন। আর সাধারণভাবে আত্মরক্ষা ও আক্রমণ, এই উভয় কাজের জন্যই ব্যবহার করেছেন পাথর, গরমজল, আর

লংকার গুঁড়া মেশানো ধুলো। শুধু এটুকু মাত্র নয়। অনেক অল্পবয়সী মেয়ে 'লাল-অঞ্চল'-এ গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং কতগুলি নির্ধারিত জঙ্গল এলাকা 'মুক্ত অঞ্চল' ঘোষিত হওয়ার সময় এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেয়েরাই অনেক সময় সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে জোতদার ও পুলিশের যৌথ বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছেন। অনেকে পুলিশের গুলিতে প্রাণও দিয়েছেন। তাছাড়া অনেক আদিবাসী মহিলা তীর-ধনুক ও কুড়ুল নিয়েও সংগ্রাম করেছেন। উচ্চবর্ণের অত্যাচারী জমিদার, জোতদার 'ভদ্রলোক'দের বিরুদ্ধে এই সব নিম্নবর্গের তথাকথিত 'চাষা' ও 'ছোটলোক' নারীদের দীর্ঘকালের সঞ্চিত ক্রোধ ও প্রতিশোধ স্পৃহাই তাদের রাজনীতিতে টেনে আনার পক্ষে সহায়ক হয়েছিল।

নক্সালবাড়ি আন্দোলনের সমকালেই পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণা ও মেদিনীপুরেও বেনামি জমি দখলের এক আন্দোলনে অসংখ্য তপশিলী জাতি ও আদিবাসী নারীরা পুরুষের সাথে প্রায় সমানভাবেই এগিয়ে এসেছিলেন। পঞ্চাশ-এর দশকে ভূমি সংস্কারের সময় জমিদার জোতদারদের দ্বারা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে অনেক চাষের জমিকে মাছ চাষের জন্য ব্যবহার করার বিরুদ্ধে ২৪পরগণায় (সোনারপুর, ভাংগর, ক্যানিং, সন্দেশখালি, মথুরাপুর) 'কিষান সভা'র নেতৃত্বে গঠিত কৃষক আন্দোলনে অনেক তপশিলী ও আদিবাসী কৃষক নারী মিছিল ও মিটিং-এ লাল ঝাণ্ডা নিয়ে উপস্থিত থেকেছেন। নারী পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই পুলিশ ও জমিদার জোতদারের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে ১৯৬৭-১৯৬৯ সালের মধ্যে ২৪পরগণায় ৮ হাজার একর বেনামি জমি গরিব চাষীদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল।

মেদিনীপুরে জমি দখলের লড়াই-এ কৃষক স্বেচ্ছাসেবীদের ২৫ শতাংশ ছিলেন নিম্নবর্গের নারী। এখানেও জমি দখলের ব্যাপারে আদিবাসী রমণীদের জঙ্গি মনোভাবের পরিচয় আছে। একবার জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে সংঘর্ষে কয়েকজন জমিদার মারা যাওয়ার পর জমিদার গৃহিণীরা বন্দুক হাতে এগিয়ে এলে আদিবাসী কৃষক নারীরা তীর ধনুক নিয়ে তাড়া করে তাদের ফিরে যেতে বাধ্য করেন। অনেক জায়গায় মাঠে ফসল কাটার সময় চাষী রমণীরা দলবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে জমিদারের লাঠিয়ালের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন।[১৩] নারীদের রাজনৈতিক জাগরণ ও সহযোগিতা ছাড়া এ আন্দোলন আংশিকভাবেও সফল হওয়া কঠিন ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেনামি জমি দখল, পতিত জমি উদ্ধার এবং 'অপারেশন বর্গা' প্রভৃতি থেকে প্রাপ্ত অনেক জমি কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হলেও নারীদের শূন্য হাত শূন্যই থেকে গেছে। পুরুষ কৃষকরাই হয়েছে জমি বন্টনের ভাগিদার ও মালিক।

চিপকো ও পরিবেশ দূষণ আন্দোলন

তৃণমূল স্তরে প্রাত্যহিক জীবনযন্ত্রণা প্রসূত নারী আন্দোলন যে কত শক্তিশালী ও অপ্রতিরোধ্য হতে পারে তার এক বিশেষ উদাহরণ হল উত্তরাখণ্ডের গাড়োয়াল ও কুমায়ুন পাহাড়াঞ্চলে নারীদের চিপকো আন্দোলন (১৯৭২-৭৮), অর্থাৎ গাছকে জড়িয়ে ধরে গাছ (বন) বাঁচানোর আন্দোলন। পাহাড় ও অরণ্যকন্যাদের দৈনিক জীবনধারণের সংগ্রাম থেকে উদ্ভুত এই আন্দোলন প্রাকৃতিক পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে 'বৃক্ষরোপন' ও 'বনসৃজন'-এর নীতির সাথে একাত্ম হয়ে গেছে।

গাড়োয়াল ও কুমায়ুনের পাহাড়ী রমণীরা জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে শিখেছিলেন যে গাছ ধ্বংস হলে মাটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, আর নদী তার গতিময়তা হারিয়ে দিক পরিবর্তন করে। এখানে নারীদের বহুদূর থেকে (প্রয়োজনে ২৫ কিলোমিটার) পানীয় জল বয়ে আনতে হয় (যেমন হয় আরও অনেক জায়গায়)। তাছাড়া, পারিবারিক পশুদের খাদ্য এবং জ্বালানির জন্যও (এও নারীকেই সংগ্রহ করতে হয়) গাছের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তাই গাছ বাঁচানোর আন্দোলনে পাহাড়ী নারীরা ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আর শেষের দিকে মাটি, জল ও শুদ্ধ বাতাসের দাবিও ছিল এই আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত। প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন জায়গায় (চামেলি জেলার গোপেশ্বর, কেদারঘাট, যোশিমঠের বেনি প্রভৃতি) ব্যবসায়ী কন্ট্রাকটারদের কুড়ুলের কোপ থেকে গাছ বাঁচানোর এ লড়াই-এ নারীকে পরিবারের পুরুষদের বিরোধিতার মোকাবিলাও করতে হযেছে। কারণ গাছকাটার শ্রমিক হিসেবে গ্রামের পুরুষদেরই সাধারণত নিয়োগ করা হতো বলে পুরুষের কাছে তাদের বেকারত্ব ঘোচানোর প্রশ্নই ছিল বড়। আর নারীর কাছে পানীয় জল, জ্বালানি ও পশুখাদ্য সংগ্রহ করা ছিল দায়। কিন্তু সব বাধাবিঘ্ন, বিরোধিতা, এমনকী কন্ট্রাকটরের ঘুষের প্রলোভন এবং ভয় দেখানোকেও অগ্রাহ্য করে 'মহিলা মঙ্গল দল'-এর নারীরা তেহেরি গাড়োয়ালের দেওয়াল ঘাঁটির আদবাণীতে প্রাদেশিক সশস্ত্রবাহিনীর মোকাবিলা করেছেন। পুলিশের রাইফেলের সামনে জীবন পণ করে গাছকে জড়িয়ে ধরে কুড়ুলের কোপ থেকে গাছ ও বনকে রক্ষা করেছেন (১৯৭৪)। বাঘের থাবা থেকে বাচ্চাকে রক্ষা করার মতো কুড়ুলের ঘা থেকে গাছকে রক্ষা করার জন্য নারীদের দলবদ্ধভাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছুটোছুটিও করতে হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের সাহস, দৃঢ়মন্যতা এবং দলবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলে সশস্ত্র বাহিনীকে ফিরে যেতে হয়েছে। আর পরিবারের পুরুষদেরও মন জয় করেছেন তারা। এর পরেও নগেন্দ্রপুর দুগামদার পট্টিতে (১৯৭৯) একই কার্যক্রম

অনুসৃত হয়েছে, আর আন্দোলনের ফলে অনেক নারী কারাবরণও করেছেন। ১৯৮০ সালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর হস্তক্ষেপের ফলে ১৫ বছরের জন্য গাছ কাটা বন্ধ থেকেছে।[১৪]

তবে গাছ বাঁচানোর আন্দোলন এখনও চলছে। 'মহিলা মন্ডল'-এর নারীরা এখনও যে শুধু ব্যবসার উদ্দেশ্যে গাছ কাটা ঠেকাচ্ছেন তাই নয়, পাহাড়ের ধাপে ধাপে অনেক পাইন ও ওক গাছের চাড়া লাগিয়ে পশুখাদ্য ও জ্বালানির সুরাহা করছেন। আবার অন্যদিকে পরিবেশকে দূষণমুক্তও রাখছেন।

পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার কাজে নিম্নবর্গের নারীরা অন্যভাবেও যুক্ত আছেন। আলমোড়ার খিরাকোটে সোপস্টোন খননের বিরুদ্ধে পাহাড়ী নারীরা সমানভাবে সোচ্চার হয়েছেন (১৯৭৫), খননের কাজে বাধা সৃষ্টি করেছেন, আর শেষ পর্যন্ত আদালতের দ্বারস্থ হয়ে খনন বন্ধ রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এখানেও শ্রমিকরূপে স্বামী পুত্র এবং নিজেদের কর্মসংস্থানের চেয়ে দূষণযুক্ত পাথরগুঁড়ো ও বালি থেকে চাষের. মাঠ ও মাঠের ফসলকে বাঁচানোর তাগিদ ছিল বেশি। প্রায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে দেরাদুন-এর অদূরে বারকোট এর লাইমস্টোন খননের সময়। খননকালের ৪০ বছরের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার অনেক পরেও মালিকের লোভের নিবৃত্তি নেই, অথচ ডিনামাইট-এর দূষণমুক্ত পাথরকণা ও বালিতে দূষিত হয়ে প্রাণ দিয়েছেন নারী পুরুষ সকলে। তাই প্রাণের তাগিদেই 'মহিলা মণ্ডল'-এর নারীরা এখানে 'যুবক মন্ডল দল'-এর সর্বোদয় কর্মীদের সাথে যৌথভাবে পর্যায়ক্রমে খনন কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের পথ আগলে বাধা দিয়েছেন, শান্তিপূর্ণ অবস্থান ধর্মঘট করেছেন, ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের দ্বারস্থ হয়ে কিছুদিনের জন্য খনন কার্য বন্ধ রাখতে সমর্থ হয়েছেন।[১৫] বাস্তব জীবনের কাঠিন্যই পাহাড়ী রমণীদের মনপ্রাণকে কঠিন করে রাষ্ট্রের উচ্চতম আইনের দরজা পর্যন্ত যেতে সাহায্য করেছে।

নারীরা খননের দূষিত পদার্থ থেকে পরিবেশকে রক্ষা করতে যেমন অগ্রণী হয়েছেন, তেমনি আবার কোথাও কোথাও শ্রমিক ইউনিয়নে যোগ দিয়ে প্রত্যক্ষ রাজনীতির শিক্ষা নিয়েছেন, আর সেই সঙ্গে নিজেদের বিশেষ দাবি দাওয়া আদায় করেছেন। মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী অধ্যুষিত ছত্রিশগড়ে 'ছত্রিশগড় মাইনস শ্রমিক সংঘ' এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী। ১৯৭৭ সাল থেকে 'ছত্রিশগড় মাইনস শ্রমিক সংঘ' পর্যায়ক্রমে ভিলাই স্টিল প্ল্যান্ট-এর অস্থায়ী শ্রমিক ছাঁটাই এর বিরুদ্ধে যে জঙ্গি আন্দোলনে ব্রতী হয়, তার সাফল্য অনেকখানি নারী শ্রমিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের

অবদান। ছত্রিশগড়ের আকরিক লোহাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে ভিলাই-এর ইস্পাত কারখানা। আর শিল্প কারখানার আশেপাশের চাষী পরিবারে যেসব নারীপুরুষ শুধু চুক্তি অনুযায়ী অস্থায়ীভাবে কাজ করতেন, তাদের অর্ধাংশই ছিলেন নারী। শিল্প কারখানায় আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টার ফলে সম্ভাব্য ছাঁটাই কর্মীদের মধ্যে প্রথমেই বলি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল অস্থায়ী নারী কর্মীদের। কিন্তু নারী শ্রমিকরা জঙ্গি আন্দোলনের মাধ্যমে শুধু ছাঁটাই রোধ করেননি, সেই সঙ্গে কর্তৃপক্ষকে মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং ক্রেশ-এর ব্যবস্থা করতেও বাধ্য করেছেন। শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্যে নারী শ্রমিকরা এখানে এতটাই ঐক্যবদ্ধ শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন যে আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে শ্রমিক সংঘের মধ্য থেকেই গড়ে ওঠে 'মহিলা মুক্তি মোর্চা'। শ্রেণী বৈষম্য এবং নারী পুরুষ বৈষম্যের পটভূমি থেকে গড়ে ওঠা 'মহিলা মুক্তি মোর্চা'র নারী সদস্যারা শুধু শ্রেণী শোষণের বিরুদ্ধে নয়, পরিবারের ভিতরে নারী শোষণের বিরুদ্ধেও সরব হয়ে ওঠেন। শ্রমিক সংঘের কার্যক্রমের মধ্য দিয়েই এখানে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনেও নারী পুরুষ বৈষম্য সম্বন্ধে নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়, এবং এ বিষয়ে তারা কিছুটা সাহসী পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হন।[১৬] নারী পুরুষ বৈষম্য সম্বন্ধে সচেতনতাই প্রকৃতপক্ষে নারী পুরষ সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান।

বোধগয়ায় মঠের জমি দখলের আন্দোলন

সকলেই জানেন, এদেশের অনেক মঠ ও মন্দির তাদের মালিকানাধীন বহু জমিতে সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ পরিচালনা করেন। এর বিরুদ্ধে 'ছাত্রযুব সংঘর্ষ বাহিনী'র নেতৃত্বে সত্তরের দশকে বিহারের বোধগয়ায় মঠের জমি জবরদখলের মাধ্যমে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন করে দেবার যে আন্দোলন গড়ে ওঠে, সে আন্দোলনেও শয়ে শয়ে গরিব কৃষক নারী শুধু পুলিশের লাঠি নয়, বন্দুকেরও মোকাবিলা করেছেন। আর এই আন্দোলনের এক বৈশিষ্ট্য ছিল যে নারীরা এখানে মঠের জমি দখল করার আন্দোলনের সাথে সে জমিতে নিজেদের মালিকানা প্রতিষ্ঠার দাবিতেও সোচ্চার হয়েছিলেন। অনেক নারীই অভিজ্ঞতা দিয়ে জেনেছিলেন যে বিধবা, বিবাহবিচ্ছিন্না অথবা স্বামী পরিত্যক্তা নারীরা তাদের দেবর, ভাসুর, ভাই, কাকা প্রভৃতি পুরুষ আত্মীয়ের জমিতে শ্রমিকরূপে কাজ করে দিনাতিপাত করতে বাধ্য হন। তাই 'মজুদুর-কিষান সমিতি'র পরিচালনায় ভূমিহীন নারী কৃষি শ্রমিকরা এখানে জমি বন্টনের ব্যাপারে পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার তীব্র প্রতিবাদ করে প্রচারপত্র

বিলি করেছেন, বক্তৃতা করে নিজেদের নামে জমির দাবিতে পরিবারের পুরুষদের বিরুদ্ধে এক নতুন লড়াই-এ অবতীর্ণ হয়েছেন। তাদের লাগাতার আন্দোলনের ফলে ১৯৮৭ সালে প্রায় ৫,০০০ একর জমি তারা স্বামীর সাথে যৌথ মালিকানায় পেতে সক্ষম হন। নিজেদের নামে জমি না পেলেও এ ব্যবস্থা ছিল মন্দের ভালো। তাছাড়া, আন্দোলন চালিয়ে নারীরা হাল-বলদ, সার বীজ প্রভৃতি কেনার জন্য ব্যাংক ঋণ নিজেদের নামেই আদায় করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। জমির একক মালিকানা তারা আদায় করতে পারেননি প্রধানত পরিবারের পুরুষদেরই বিরোধিতার ফলে। পুরুষদের এই বিরোধিতা পরিবারের মধ্যে তাদের প্রভুত্ব করার এবং নারীকে শাসনে রাখার প্রবল বাসনাকেই প্রমাণ করে। তবে কৃষক নারীদের এই জাগরণই ছিল এই আন্দোলনের প্রধান প্রাপ্তি।[১৭]

ঢুলিয়ার ভূমিমুক্তি আন্দোলন

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ইংরেজ রাজত্বকালে এদেশের অনেক জায়গায় আদিবাসী কৃষককে তাদের জমি থেকে উৎখাত করে অ-আদিবাসীরা জমিদার হয়ে বসেছিলেন। তখন এই আদিবাসী কৃষকরাই সেই জমিতে শুধু মজুরি শ্রমিক নয়, বেগার শ্রমিক হয়েও কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। অল্প কিছু জমি তাদের থাকলেও সেটুকু চাষ করার জন্যও গরিব চাষীদের জমিদারের কাছ থেকে ঋণ নিতে হতো। আর ঋণের বোঝা এভাবে বাড়তে বাড়তে একদিন সে জমিটুকুও জমিদারের কুক্ষিগত হতো। মহারাষ্ট্রের ঢুলিয়া জেলার ৪টি আদিবাসী অধ্যুষিত তালুক জুড়েও ছিল এ ধরনের শাসন ও শোষণের ব্যবস্থা। এসব তালুকে আদিবাসী নারীরা পারিবারিক জমি খুইয়ে বংশ পরম্পরায় শুধু দারিদ্রেই নিমজ্জিত ছিলেন না, উপরি পাওনা হিসেবে সহ্য করছেন অনেক সামাজিক অবিচার ও অত্যাচার। চাষী ঘরের নারীদের বিবাহের পর প্রথম রাত্রিটি ছিল জমিদারের জন্য নির্দিষ্ট। এসব শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভুত ক্ষোভ সত্তরের দশকের প্রথম দিকে 'ভূমিমুক্তি' আন্দোলনের (১৯৭২) রূপ নেয়। পরিচালনায় ছিল একটি বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন।

উল্লেখ্য যে এখানে 'ভূমিমুক্তি' আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে নারীরা বিশেষ একটা উৎসাহ দেখান নি। শুধু মাঝেমধ্যে লংকার গুঁড়ো ছিটিয়ে জমিদারের গুণ্ডাবাহিনীকে জব্দ রাখতেন। কিন্তু পরে নারীদের চাপেই তাদের বিশেষ সমস্যাগুলি (অনিশ্চিত ও অনিয়মিত কাজ, কম মজুরি, জমিদারের যৌন অত্যাচার প্রভৃতি) এই আন্দোলনের

সাথে যুক্ত হওয়ার পর অনেক আদিবাসী কৃষক নারী এগিয়ে আসেন। তাদের গঠিত 'শ্রমিক স্ত্রী মুক্তি সংগঠন'-এর (১৯৭৯) মাধ্যমে যেসব নতুন বিষয় এই আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাদের মধ্যে ছিল ঃ (১) দুর্নীতি দূর করা ; (২) অনাবৃষ্টি জনিত খরাত্রাণের ব্যবস্থা করা ; (৩) পুরুষদের মদ খাওয়ার বিরোধিতা করা ; (৪) স্ত্রীকে মারার বিরোধিতা করা এবং (৫) আত্মরক্ষা করা। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয় যে তেভাগা, তেলেঙ্গানা থেকে শুরু করে চিপকো পর্যন্ত সব আন্দোলনেই নারীরা স্বামীর মদ খাওয়া এবং স্ত্রীকে মারার বিরুদ্ধতা করেছেন। কিন্তু ঢুলিয়ার 'শ্রমিক মুক্তি সংগঠন' পরিবারের মধ্যে নারীর সব রকমের শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। আন্দোলনের একটি পর্যায়ে আদিবাসী নারীরা এখানে স্বামীর মার খাওয়ার পর ফিরে স্বামীকে শুধু মারতেনই না, উপরন্তু ক্ষমা চাইতেও বাধ্য করতেন। 'শ্রমিক স্ত্রীমুক্তি সংগঠন' কর্তৃক আয়োজিত 'স্ত্রীমুক্তি মেলা'য় (১৯৮১) ঢুলিয়া জেলার শহর ও প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আড়াই হাজারেরও বেশি নারী সমবেত হয়ে তাদের সকলের পারিবারিক জীবনের সাধারণ শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে নাচ-গানের মধ্য দিয়ে নিজেদের জীবনের দুঃখ দুর্দশাকে প্রতিফলিত করেছেন।[১৮]

ভূমিমুক্তি আন্দোলনের সাফল্য যাই হোক না কেন, কৃষক নারীর এই জাগরণ, প্রতিবাদ করার এই সাহস, যা থেকে জন্ম নেয় জঙ্গি রাজনীতি, বৃথা হয়নি। বরং বলা যায় তা ছিল অমূল্য। আর তেভাগা থেকে শুরু করে সব আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে দলীয় রাজনীতির সাথে যুক্ত শহরাঞ্চলের যে সব নারী গ্রামাঞ্চলে শ্রমিক কৃষক নারীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন, তাদের উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করেছেন, তাদের অবদানও অনস্বীকার্য। ঢুলিয়া রাজনীতির সাথে যুক্ত শহরাঞ্চলে নারীদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা ছিল ছাত্রীদের। এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে স্বাধীনতা আন্দোলনের কাল থেকে আজ পর্যন্ত ছাত্রীরা বৃহত্তর রাজনীতিতে, বিভিন্ন গণআন্দোলনে এক বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন। আর এ কাজ তারা করেছেন কোন রাজনৈতিক ক্ষমতার দরবারে প্রবেশের আশা না রেখেই। ভারতীয় রাজনীতি ও গণঅন্দোলনের ইতিহাসে ছাত্রীদের এ অবদান অবিস্মরনীয়।

উপরের আলোচনা থেকে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে কৃষক শ্রমিক আদিবাসী ও তপশিলী নারীরা এদেশের রাজনীতি ও গণআন্দোলনে যোগ না দিলে কোন

আন্দোলনই গড়ে উঠতে পারতো না। শহরের রাজনৈতিক দলের সদস্যারা গ্রামাঞ্চলে মহিলা সংগঠনের মাধ্যমে এদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন মাত্র। বর্তমানেও একথা প্রায় সমানভাবে সত্য। এখনও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যেসব গণআন্দোলন গড়ে ওঠে, তাতে নিম্নবর্গের নারীদের ভূমিকাই থাকে মুখ্য। কিন্তু রাজনীতিতে এদের অমূল্য অবদান সত্ত্বেও রাজনীতির ক্ষমতার আঙিনায় এদের প্রবেশাধিকার আজও অতি সামান্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা শুধু ব্যবহৃতই হন, নিজেরা থেকে যান যে তিমিরে, সেই তিমিরেই।

পাদটীকা

(১) Indira Munshı Saldaha, "Tribal Women in the Warli Revot: 1945-1947" in *EPW*, Vol xxi, No 17, April 26 1986, PP. WS 41-43

(২) *ঐ*

(৩) *ঐ*

(৪) তেভাগা আন্দোলনে নারীর ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য দেখুন, মনিকুন্তলা সেন, *সেদিনের কথা,* নয়া প্রকাশ, কলকাতা,১৯৮২ ; রেনু চক্রবর্তী, *ভারতীয় নারী আন্দোলনে কম্যুনিষ্ট মেয়েরা,* ১৯৪০-৫০, মনীষা, ১৯৮০ ; Sunıl Sen, *The Working Women and Popular Movements ın Bengal*, K.P. Bagchi, Calcutta 1985, chapter 3 and 4; and Peter Custers. *Women in the Tebhaga Uprising 1946-47*. Naya Prakash. Calcutta. 1987

(৫) Peter Custers. *ঐ,* PP. 131- 131

(৬) *ঐ,* p.130 and Sunil Sen, *ঐ,* Chapter.3

(৭) "তেভাগা আন্দোলনের সুবর্ণ জয়ন্তী ঃ ৪৮-৪৯ সালের দ্বিতীয় পর্যায়ের আন্দোলন," *কালান্তর,* ২০শে জানুয়ারী, ১৯৯৭।

(৮) sunil Sen. *ঐ,* Chapter 7, P77

(৯) তেলেঙ্গানা আন্দোলনে নারীর ভূমিকা বিষয়ে দেখুন, P. Sundarayya, *Telengana Peoples' Struggle and its Lessons*, National Book agency, Calcutta, 1972, vol.-II, pp. 328-53; Peter Custers, *ঐ,* chapter 7; and Stree Shakti Sangathan, *We were Making History: Life Stories of Women in the Telengana Peoples' Struggle,* New Delhi, Kali for Women, 1989.

(১০) Peter custer, *ঐ,* p.163

(১১) Stree Shakti Sangathan, ঐ,

(১২) Debal Sinha Roy, *Women in Peasant Movements. Tebhaga, Naxalite and After*, Manohar, New Delhi, 1992 ; and Debal Sinha Roy, "Peasant Movements and Empowerment of Rural Women," *EPW*, 16 September,1995, pp.2306-2311; and Sunil Sen, ঐ, PP. 59-67.

(১৩) Sunil Sen, ঐ, P. 55

(১৪) Bimala Bahuguna, 'Chipko Movement" lina Sen (ed.), *A Space within the Struggle*, Kali for Women, New Delhi, 1989 ; and Radha Kumar, *The History of doing : An Illustrated Account of Movement for Women Rights and Feminism ın India, 1800-1990*, Kali for Women, New Delhi, 1993, pp. 182-186.

(১৫) Radha Kumar, ঐ।

(১৬) Ilina Sen, "Workers' Struggles in Chhattisgarh" in Ilina Sen (ed), *A Space Within the Struggle*, ঐ, pp. 194-205.

(১৭) Govind Kelkar and Chetna Gala. "The Bodhgaya Land Struggle" in Ilina Sen (ed). ঐ, pp. 83-109.

(১৮) Nirmala Sathe, "Adivasi Struggle in Dhulia" in Ilina Sen (ed), ঐ, pp. 125-140.

৪

ক্ষমতায়নের পূর্বকথা

উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের প্রথম ভাগে কিছু তথাকথিত অভিজাত এবং শিক্ষিত (কেউ কেউ বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত) ভারতীয় নারীর বিদেশের সাথে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। আর এদের মধ্যে অনেকে এদেশের নারীর সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। উচ্চশিক্ষিত, রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বর্ধিত এবং রাজনৈতিকভাবে সচেতন এরকম কিছু নারীর প্রচেষ্টায় ১৯১৭ সালে ডরোথি জিনারাসারা-র সভাপতিত্বে মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত হয় Women's Indian Association (WIA) নামে একটি ভারতীয় মহিলা সংগঠন। এই সংগঠনের সদস্যারাই ভারতে হোমরুল-এর প্রেক্ষিতে প্রাথমিক পর্যায়ে নারীর ভোটাধিকারের দাবিতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। পরে ১৯২৫ সালে লেডি ডোরাব টাটা-এর নেতৃত্বে গঠিত হয় National Council of Women in India (NCWI), আর শ্রীমতী মার্গারেট কুজিনস এবং WIA -এর যৌথ উদ্যোগে ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় All India Women's Conference (AIWC)। ধীরে ধীরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই সংগঠনগুলির শাখা ছড়িয়ে পড়ে, আর এদের পাশাপাশি গড়ে ওঠে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। বিশ-এর দশকে ভারতীয় নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের আন্দোলনে WIA-র মুখ্য ভূমিকা থাকলেও পরে তিরিশের দশকে AIWC-র ভূমিকাই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই সংগঠনগুলি মূলত নারীশিক্ষা ও নারীর সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত হলেও সংগঠনগুলির কার্যাবলির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশের (WIA-র 'স্ত্রী-ধর্ম' এবং AIWC-র বুলেটিন) মাধ্যমে এবং বিভিন্ন সভাসমিতিতে বক্তৃতার মাধ্যমে মহিলাদের রাজনৈতিক দাবিগুলি তুলে ধরা, আর সেই সঙ্গে সাধারণ নারীর রাজনৈতিক চেতনাকে জাগ্রত করা।

WIA-র নেতৃত্বে মহিলাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই ১৯১৯ সালের আইন অনুযায়ী (Government of India Act, 1919) ভারতীয় নারীরা তাদের অন্যতম

রাজনৈতিক অধিকার অর্থাৎ ভোটাধিকার লাভ করেন, যা কার্যকর হয় ১৯২১ সালে। আমেরিকা ও পশ্চিম ইওরোপের মতো উন্নত দেশের নারীরাও যে সময় ভোটাধিকার লাভ করেন নি, সেই সময় ভারতীয় নারীর এই ভোটাধিকার অর্জন কম কৃতিত্বের পরিচায়ক ছিল না। ইংল্যাণ্ডের নারীরা ভোটাধিকার লাভ করেছেন ১৯২৮ সালে। পশ্চিম ইওরোপের বেশির ভাগ দেশেই নারীরা ভোটাধিকার পেয়েছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে। মানবাধিকারের জন্মভূমি ফ্রান্স-এর মহিলারা ভোটদানের অধিকার পেয়েছেন মাত্র ১৯৪৪ সালে। আর সুইটজারল্যাণ্ডে নারীর ভোটাধিকার প্রাপ্তি ঘটেছে মাত্র ১৯৭১ সালে।

মনে রাখা প্রয়োজন, ১৯১৯ সালে ভারতীয় নারীর ভোটাধিকার প্রাপ্তি সহজে ঘটেনি। অনেক কাঁটা বিছানো পথ অতিক্রম করেই ইংরেজ শাসিত ভারতে নারীকে তাদের ভোটদানের অধিকার এবং আইনসভাগুলিতে প্রতিনিধিত্বের অধিকার অর্জন করে নিতে হয়েছে। এজন্য প্রয়োজন হয়েছিল এক ধরনের সংগ্রাম, যে সংগ্রামে ব্রতী হয়েছিলেন কয়েকজন বিদেশিনীসহ অনেক ভারতীয় নারী। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রীমতী মার্গারেট কুজিনস, সরোজিনী নাইডু, হেরাবাই টাটা, মিঠান টাটা, রাজকুমারী অমৃত কাউর, মুঠুলক্ষ্মী রেড্ডি, অ্যানি বেসান্ত ও কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। এরা সকলেই উপরোক্ত সংগঠনগুলির সদস্যা ছিলেন। এই সংগঠনগুলির মাধ্যমেই মহিলাদের রাজনৈতিক অধিকারের দাবি ক্রমশ একটি পরিশীলিত আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে।

সীমিত ভোটাধিকার

ভারতের হোমরুল-এর বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে ১৯১৭ সালে তদানীন্তন সেক্রেটারী অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার ভারত সফরকালে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর নেতৃত্বে ১৪ জন মহিলা প্রতিনিধি ১৮ই ডিসেম্বর মাদ্রাজে মিঃ মন্টেগু এবং তদানীন্তন ভারতীয় গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড চেমসফোর্ডের সাথে সাক্ষাৎ করে নারীর ভোটাধিকারের দাবিতে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। ভোটাধিকারের ব্যাপারে ভারতীয় নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হবে এই অনুমানের উপর ভিত্তি করেই মহিলা নেত্রীগণ অতি স্বচ্ছ ভাষায় এই স্মারকলিপিতে তাদের রাজনৈতিক অধিকারের দাবি জানান। এই স্মারকলিপি লিখেছিলেন WIA-এর সেক্রেটারী আইরিশ মহিলা মার্গারেট কুজিনস, যিনি আগেই আয়ার্ল্যাণ্ডে নারীর

ভোটাধিকার অর্জনের লড়াই-এর সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। এই স্মারকপত্রে বলা হয় ঃ

"When the franchise is being drawn up, women may be recognized as 'people' and that it may be worded in such terms as will not disqualify our sex but allow our women the same opportunities of representation as our men."[১]

দেখা যাচ্ছে যে মহিলারা শুধু তাদের নারীত্বের বিশেষ সুযোগ রূপে এই রাজনৈতিক অধিকার দাবি করেন নি, নারীর বিরুদ্ধে সম্ভাব্য বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধেই ছিল এই দাবি।

নারীদের এই রাজনৈতিক দাবিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ছিল পূর্ণ সমর্থন। ১৯১৭ এবং ১৯১৮ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে নারীদের ভোটাধিকারের বিষয়ে প্রস্তাব পাশ করে মহিলাদের ভোটাধিকারের দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান হয়। ১৯১৭ সালে শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত-এর সভাপতিত্বে একটি প্রস্তাবে বলা হয় ঃ

"The same tests be applied to women as to men in regard to the franchise and the eligibility to all elective bodies concerned with Local Government..."[২] অনুরূপে বম্বেতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনেও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে সর্বসম্মতিক্রমে নারীর ভোটাধিকার ও প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে প্রস্তাব পাশ করা হয়। আর ১৯১৮ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনও এই মর্মে একটি প্রস্তাব পাশ করে যে "Women possessing the same qualifications as are laid down for men in any part of the scheme shall not be disqualified on account of sex."[৩] এভাবেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নারীর ভোটাধিকার ও প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে সহমতের সৃষ্টি হয়, এবং ফলে অনেক সাধারণ মহিলাদের মধ্যেও নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে চেতনার বিকাশ ঘটতে শুরু করে।

ইতিমধ্যে ভারতীয় নারীর ভোটাধিকারের প্রশ্নটি পর্যালোচনার জন্য ১৯১৮ সালে ইংজের সরকার কর্তৃক নিযুক্ত প্রথম ফ্র্যানচাইজ কমিটি বা সাউথবরো কমিটি ভারতে আসেন। আর তখন WIA-এর ৪০টি শাখা, মহিলা শাখা, বম্বের Women's Graduate Association, হোমরুল লিগ-এর মহিলা শাখা, ভারত স্ত্রী মণ্ডল এবং

সেই সঙ্গে আরও বিভিন্ন নারী সংগঠনের মহিলাগণ মিলিতভাবে সাউথবরো কমিটির নিকট মহিলাদের ভোটাধিকারের দাবিতে একটি আবেদনপত্র পেশ করেন। কিন্তু সাউথবরো কমিটি অনেক পরীক্ষা নিরিক্ষার পর এই দাবিপত্র সরাসরি নাকচ করে দেন। নারীর ভোটাধিকারের প্রশ্নে এই ফ্র্যানচাইজ কমিটির (সাউথবরো কমিটি) মন্তব্যের অংশবিশেষ ছিল নিম্নরূপ ঃ

"... We are satisfied that the social conditions of India make it premature to extend the franchise to Indian women at this juncture, when so large a proportion of male electors require education in the use of vote. Further, until the custom of seclusion of women, followed by many classes and communities, is relaxed, female franchise would hardly be a reality."[৪]

অর্থাৎ বিভিন্ন জাতিবর্ণ সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং অশিক্ষায় পীড়িত ভারতীয় সমাজে, বিশেষত নারীরা যেখানে বর্হিজগতের সাথে সম্পর্কশূন্য হয়ে অন্দর মহলেই আবদ্ধ থাকে, সেখানে নারীর ভোটাধিকারের উপযুক্ত সময় এখনও হয়নি, এই অজুহাত দেখিয়ে সাউথবরো কমিটি ভারতীয় নারীর ভোটাধিকারের দাবি বাতিল করে দেন। রাজনৈতিকভাবে সচেতন মানুষের মধ্যে এই কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ১৯১৯ সালের ২রা জুলাই বম্বেতে মহিলারা একটি বিরাট মিটিং করে এই কমিটির সুপারিশের নিন্দা ও প্রতিবাদ করে একটি প্রস্তাব পাশ করেন। আর সেই সঙ্গে WIA-র পক্ষ থেকে তদানীন্তন ভারত সরকার ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট ভোটদানের ব্যাপারে নারী পুরুষের বৈষম্যের প্রশ্নটি পুনর্বিবেচনা করার ("to consider the question removing sex disqualifications")[৫] আবেদন জানানো হয়।

এবার মহিলাদের দাবি-প্রস্তাবে স্বচ্ছভাবে বলা হয় যে তারা শুধু ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও সুবিচার ("right and justice") প্রার্থী, অনুকম্পার প্রার্থী নন। সুতরাং ভোটাধিকারের ব্যাপারে কোন নারীবিরোধী আচরণ ভারতের রাজনীতিতে ভয়ঙ্কর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে।[৬] এরকম সাবধান বাণী উচ্চারণ করার সাথে সাথে ১৯১৯ সালের আগষ্ট মাসে বম্বেতে অনুষ্ঠিত একটি সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে ভারতীয় মহিলাদের প্রতিনিধি হয়ে শ্রীমতী হেরাবাই টাটা, তার কন্যা তথা ব্যারিষ্টার মিঠান আর্দেশির টাটা, সরোজিনী নাইডু এবং অ্যানি বেসান্ত জয়েন্ট পার্লামেন্টারি

কমিটিতে জোরালো ভাষায় তাদের বক্তব্য পেশ করার সাথে সাথে ইংল্যাণ্ডের Women's Freedom Liague, Women's International League এবং আরও দু-একটি মহিলা সংগঠনের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের সমর্থন লাভে সক্ষম হন। অন্যদিকে বম্বের WIA-র মহিলারা সেক্রেটারি অফ সেস্ট ফর ইন্ডিয়ার সাথে দেখা করে তাদের কাছে নারীর ভোটাধিকারের জন্য আবেদন জানান। এবার অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়। ভারতীয় মহিলাদের ভোটাধিকারের ব্যাপারটিকে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় ("domestic subject") রূপে গণ্য করা হয় এবং এই বিষয়টির নিষ্পিত্তির ভার মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারের অন্তর্গত প্রভিন্সিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের উপর দিয়ে দেওয়া হয়, অর্থাৎ ভারতীয় নারীর ভোটাধিকারের বিষয়টি ভারতের প্রাদেশিক সরকারের কাছে স্থানান্তরিত করা হয়। এই সিদ্ধান্তটিই ভারতীয় নারীর কাছে আশীর্বাদ রূপে দেখা দিয়ে তাদের ভোটাধিকারের পথকে সুগম করে। এখানে উল্লেখ্য যে ইংরেজ সরকারের এই নমনীয় সিদ্ধান্তের পেছনে কয়েকজন নারীর অমূল্য অবদান ছিল। এ বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত, সরোজিনী নাইডু, হেরাবাই টাটা এবং মিঠান টাটা। এদের সকলের মিলিত আবেদন এবং বিশেষত ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ব্যারিষ্টার মিঠান টাটার জোরালো, অকাট্য এবং হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য ইংরেজ সরকারের পূর্বেকার অনমনীয় মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল।

বিষয়টি প্রভিন্সিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে স্থানান্তরিত হওয়ার পর ১৯২১ সালের এপ্রিল মাসে সর্বপ্রথম মাদ্রাজ প্রভিন্স-এ নারীরা তাদের ভোটাধিকার প্রাপ্ত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মাদ্রাজেই অবস্থিত ছিল WIA-র কেন্দ্রিয় কার্যালয়। ই ভি আর নায়েকারের প্রভাবে, বিশেষত তার সেল্ফ-রেসপেক্ট আন্দোলনের ফলে, এই রাজ্যে নারীশিক্ষা ও নারীর রাজনৈতিক সচেতনতা ছিল অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি। মাদ্রাজের নারীরা ভোটাধিকার পাওয়ার পর সেই বছরই বম্বের নারীরা তাদের ভোটদানের অধিকার লাভ করেন। বাংলার নারীরা ভোটাধিকার পান ১৯২৫ সালে। আর ১৯২৯ সালের মধ্যে সব রাজ্যেই পুরুষের সাথে সমান শর্তে নারীদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু ১৯১৯ সালের আইন অনুযায়ী এই ভোটাধিকার ছিল অত্যন্ত সীমিত। কারণ 'No taxation without representation"-এর নীতি অনুসরণ করে নারীপুরুষ সকলের জন্যই সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু ভারতীয় সমাজে, বিশেষত সেকালে, খুব অল্প

সংখ্যক মহিলারই সম্পত্তি থাকা সম্ভব ছিল। ফলে খুব স্বল্প সংখ্যক নারীই এই ভোটাধিকার পেয়েছিলেন। এই আইনে মাত্র .৪৬ শতাংশ অথবা সংখ্যার হিসেবে মাত্র ৩ লক্ষ ১৫ হাজার নারী ভোটদানের অধিকার লাভ করেন। আর পুরুষ ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ৬৭ লক্ষ ৯২ হাজার ৮২১ জন।[৭] তথাপি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এই সীমিত ভোটাধিকারই ছিল নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পরবর্তীকালে এই পথ ধরেই ভোটাধিকার অন্দোলন আরও এগোতে পেরেছে। তাছাড়া, মহিলারা তখনও প্রভিন্সিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অথবা ইম্পিরিয়াল লেজিসলেচার-এ প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারী ছিলেন না। সে ছিল আরেক লড়াই-এর ইতিহাস। তবে সন্দেহ নেই যে এই সীমিত ভোটাধিকারই ইংরেজ শাসন ব্যবস্থায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের দাবিকে শক্তিশালী করেছিল।

রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব

১৯২৪ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে WIA -র মহিলা সদস্যাগণ বম্বের একটি মিটিং-এ প্রস্তাব পাশ করে দাবি করেন যে শাসন সংস্কার আইনের সংশোধন করে মহিলাদের জন্য রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের পথ খুলে দিতে হবে। ১২ জন মহিলা প্রতিনিধি এই প্রস্তাবটি গভর্নরের কাছে পেশ করেন। আর সেই বছরই বম্বের একটি মিটিং-এ বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের সদস্যার মিলিতভাবে একটি প্রস্তাব পাশ করে গভর্নরকে অনুরোধ করেন প্রস্তাবটি ভাইসরয় ও সেক্রেটারী অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়ার নিকট সুপারিশ করে পাঠাবার জন্য। আগষ্ট মাসে মহিলারা আবার সিমলাতে অনুরূপভাবে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে বৈষম্যমূলক নীতির তীব্র সমালোচনা করে এই বিষয়ে আইনি সংশোধন দাবি করেন। এইসব ছাড়াও মহিলারা দেশের বিভিন্ন স্থানে সভা সমিতিতে ও পত্র-পত্রিকায় আলোচনার মাধ্যমে এই বিষয়ে জনমত তৈরী করতে থাকেন। ইতিমধ্যে ১৯২৫ সালে NCWI এবং ১৯২৬ সালে AIWC প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধানত এই মহিলা সংগঠনগুলির বিরামহীন প্রচেষ্টার ফলেই ১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে শাসন সংস্কারের আইনি সংশোধন করে মহিলাদেরও লেজিসলেটিভ কাউন্সিল-এর সদস্যা হবার অধিকার দেওয়া হয়।

শাসন সংস্কার বিষয়ক আইনি সংশোধনির পর মাদ্রাজ, পাঞ্জাব ও সেন্ট্রাল প্রভিন্স-এ এ বিষয়ে নতুন আইন পাশ করা হয়। ভোটাধিকারের মতো মহিলাদের

প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারেও মাদ্রাজ প্রভিন্সই এগিয়ে থাকে। শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় মাদ্রাজের সাউথ কানাড়া কনস্টিটিউয়েন্সি থেকে একজন পুরুষ প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এছাড়া, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসনে নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন অফ মাদ্রাজ-এর সচিব শ্রীমতী হাওয়ান এঞ্জেলো একজন পুরুষ প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই দুজন মহিলা প্রার্থীর পরাজয় অবশ্য পূর্বনির্দিষ্টই ছিল। কমলাদেবী তার পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট ৫১৫ ভোটে পরাজিত হন।[৮] কিন্তু এতে মহিলাদের হতোদ্যম হওয়ার কোন কারণ ঘটেনি। দেশের শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের অধিকারই তাদের মধ্যে এক নতুন আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। পরে ১৯২৭ সালে মহিলাদের ক্রমাগত চাপের মুখে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েট ও সমাজসেবী শ্রীমতী এস মুঠুলক্ষ্মী রেড্ডি নমিনেশনে-এর মাধ্যমে মাদ্রাজ লেজিসলেটিভ কাউন্সিল-এর সদস্যা পদ লাভ করেন। মুঠুলক্ষ্মী ছিলেন ভারতের ইংরেজ শাসন ব্যবস্থায় প্রথম মহিলা প্রতিনিধি।[৯] পরে মুঠুলক্ষ্মী রেড্ডি এই কাউন্সিলের ডেপুটি সভাপতির আসনও অলংকৃত করেছিলেন।

১৯৩৫ সালের আইনে রাজনৈতিক অধিকার

তিরিশ-এর দশকে ভারতের নতুন সংবিধান তৈরীর প্রেক্ষিতে দুটি প্রধান রাজনৈতিক অধিকারের দাবিতে তিনটি মহিলা সংগঠনের সদস্যরা তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যান। এই দাবি দুটি ছিল (১) মহিলাদের ভোটাধিকারের সম্প্রসারণ এবং (২) আইন সভাতে তাদের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের এই সংগ্রাম ছিল আরও কঠিন। আর তিনটি সংগঠনের মহিলা সদস্যদের মধ্যে, এমনকী নারীদের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের দাবিতে পথিকৃৎ WIA-র সদস্যাদের মধ্যেও মতবিরোধের ফলে এই সংগ্রাম হয় আরও জটিল এবং সমস্যাসংকুল।

বিশ এবং তিরিশ-এর দশকে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারের প্রেক্ষিতে নারীর রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্নটির সাথে সাথে দলিত কৃষক শ্রমিক আদিবাসী ও অনগ্রসর শ্রেণীর রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্নটিও উঠে আসে। তাছাড়া, দ্বিতীয় দশকে রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার ফলেও মন্টেগু-

মহিলারা সংরক্ষণের ভিত্তিতে অনেকদিন পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। দ্বিতীয় দশকের শেষভাগ থেকে জাতিবর্ণ ও সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে মহিলা সংগঠনের সদস্যাগণ দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একটি সংরক্ষণশীল গোষ্ঠী (উদাহরণ স্বরূপ সরোজিনী নাইডু, রাজকুমারী অমৃত কাউর) কোন রকম সংরক্ষণবিহীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের পক্ষে ছিলেন, আর অন্য গোষ্ঠীটি (মুঠুলক্ষ্মী রেড্ডি, বেগম শাহ নাওয়াজ, রাধাবাই সুব্বারায়ান) ছিলেন সংরক্ষণসহ প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের পক্ষে।

শ্রীমতী মুঠুলক্ষ্মী রেড্ডি প্রথম থেকেই মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন। সমাজে নারীর হীনাবস্থা, পারিবারিক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের অভাব, আর্থিক পরনির্ভরতা, বিবাহ বিষয়ক আইনের সংস্কার, দেবদাসী প্রথার উচ্ছেদ প্রভৃতির জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কারণে মুঠুলক্ষ্মী মহিলাদের সংরক্ষণ দাবি করেছিলেন "to represent the women's point of view." মুঠুলক্ষ্মী শোষিত অনগ্রসর (depressed) শ্রেণী এবং সংখ্যালঘুদের ("Adi-Dravira brothers and Mohammedans") উল্লেখ করে ১৯৩০ সালে লিখেছিলেন যে অনগ্রসর শ্রেণী এবং সংখ্যালঘুদের অনগ্রসরতা থেকেও হিন্দু নারীর অনগ্রসরতা অনেক বেশী।[১০] অর্থাৎ মুঠুলক্ষ্মীর কাছে মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্নটি তাদের সামাজিক উন্নতির প্রশ্নের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল। আর এই কারণেই তিনি মহিলাদের জন্য পৃথক নির্বাচনি ব্যবস্থারও (electorate) বিরোধিতা করে বলেছিলেন, যে দেশে এখনও অধিকাংশ নারী অশিক্ষা বশত ভোটদান এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের গুরুত্ব বুঝতে সক্ষম নন, সে দেশে নারীদের পৃথক নির্বাচনি ব্যবস্থা শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় উচ্চশ্রেণীর জন্য সুযোগ সৃষ্টি করবে। অর্থাৎ তিনি মনে করেছিলেন যে সংরক্ষণবিহীন একক নির্বাচনি ব্যবস্থায় দেশের অধিকাংশ অনগ্রসর নারী রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মুঠুলক্ষ্মী রেড্ডির জন্ম হয়েছিল একটি দেবদাসী পরিবারে।

সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিমণ্ডলে বর্ধিত WIA-র আরেক জন প্রখ্যাত নেত্রী এবং গান্ধীজির অন্যতম ভক্ত শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু কিন্তু নারীদের মধ্যে একতায় বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯৩০ সালে বম্বেতে অনুষ্ঠিত AIWC-র সভায় তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে ভোটদান এবং প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে কোন বিশেষ সুবিধা নারীদের সামাজিক হীনাবস্থানকেই প্রমাণ করবে এবং তাদের মধ্যে সামাজিক বিভাজন তৈরী করবে। এ

সময় সরোজিনী নারীদের মধ্যে একতাবোধ এবং ঐশ্বরিক শক্তির (divinity) উল্লেখ করে নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপিত করেন। তার কথায়, "The queen and the peasant are one, and the time has come when every woman should know her own divinity."[১১] নারীদের ভোটাধিকার সম্পর্কিত দাবিতেও সরোজিনী নারীদের ঐশ্বরিক শক্তি (spirituality) এবং একতার প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। অন্যান্য সদস্যারাও এরকম মতবিরোধের উর্ধ্বে ছিলেন না। কিন্তু মুঠুলক্ষ্মী সহ সকলকেই শেষ পর্যন্ত নমিনেশন অথবা সংরক্ষণের দাবি থেকে সরে এসে "একতা"র নীতিকেই সমর্থন করতে হয়েছিল। আর এ বিষয়ে গান্ধীজির ছিল এক বড় ভূমিকা। কিন্তু ইতিমধ্যে ঘটে গেছে আরও অনেক ঘটনা, যেগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে প্রয়োজন।

মহিলাদের ভোটাধিকার সম্প্রসারণের দাবির ফলে ১৯২৭ সালে গঠিত সাইমন কমিশন ৩টি শর্তের উল্লেখ করেন ঃ (১) নারীকে অন্যূন ২৫ বছর বয়স্ক হতে হবে; (২) শিক্ষিত হতে হবে ; এবং (৩) তাকে জীবিত অথবা মৃত স্বামীর সম্পত্তির অধিকারী হতে হবে। প্রথম দুটি শর্ত এখানে নতুন যুক্ত করা হয়। ১৯২৯ সালে প্রথম রাউণ্ড টেব্‌ল কনফারেন্স-এ WIA-র পক্ষ থেকে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, মুঠুলক্ষ্মী রেড্ডি এবং ব্রিজলাল নেহেরুকে মহিলা প্রতিনিধি রূপে মনোনীত করা হয়। কিন্তু এই সময় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রথম রাউন্ড টেব্‌ল কনফারেন্স বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে WIA-কেও সেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। পরে ১৯৩০ সালে মনোনীত ৩ জন সদস্যের পরিবর্তে বেগম শাহ নওয়াজ ও শ্রীমতী রাধাবাই সুব্বারায়ন প্রতিনিধিত্ব করেন। এই প্রতিনিধিদ্বয় প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার দাবি করলেও অস্থায়ী ব্যবস্থা রূপে নারীদের জন্য বিশেষ ভোটাধিকার দাবি করেন। আর সাইমন কমিশন কর্তৃক উল্লেখিত নারীর ভোটাধিকারের বয়স ২৫ থেকে নামিয়ে ২১ করার আর্জি পেশ করেন। কিন্তু WIA-র সাধারণ সদস্যাগণ এ ব্যাপারে সহমত হতে পারেন নি। ফলে ১৯৩১ সালে WIA, NCWI এবং AIWC, এই তিনটি সংগঠনের সদস্যাগণ সম্মিলিতভাবে এক যৌথ স্মারকলিপিতে কোন বিশেষ ভোটাধিকার, সংরক্ষণ অথবা বিশেষ নির্বাচন ব্যবস্থার নিন্দা করেন এবং ৩টি বিষয় দাবি করেন। এগুলি হল ঃ (১) প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার ; (২) যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা ; এবং (৩) নমিনেশন অথবা সংরক্ষণ ছাড়া সরাসরি সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব।[১২] ১৯৩১ সালে জাতীয় কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনেই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা

হয়। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত মহিলাদের মধ্যে কয়েকজন ২০ শতাংশ সংরক্ষণের কথা বললেও ১৯৩১ সাল থেকে তারা সকলেই গান্ধীজীর মতানুসারী হন।[১৩]

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে ১৯৩০ সালে গান্ধীজির লবণ সত্যাগ্রহের সময় থেকেই তিনি ভারতীয় নারীদের একাংশের হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন এবং সেই নারীরা তার অন্ধ ভক্ত রূপে পরিণত হয়েছিলেন। গান্ধীজির প্রভাবেই ১৯৩১ সালে ৯ জন মহিলা প্রতিনিধি দ্বিতীয় ফ্র্যানচাইজ কমিটি বা লোথিয়ান কমিটির সামনে উপস্থিত হয়ে প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকার দাবি করেন। লোথিয়ান কমিটি কিন্তু এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অসম্ভব বলে বাতিল করে দেন। কিন্তু এর অল্প কিছুদিন পরেই প্রকাশিত একটি হোয়াইট পেপার-এ এই কমিটি নারীর ভোটাধিকার সম্পর্কে একটি নীতির কথা উল্লেখ করে বলেন, "Wives and widows of voters to qualify for franchise, for only property owners could exercise the vote and this right was now to be extended to their spouse."[১৪] স্বভাবতই নারীদের মধ্যে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, এবং তারা একটি নতুন আবেদনপত্র পেশ করেন, যাতে বলা হয় ঃ

(a) "We women wish to be citizens in our own rights, independent of any male relations...
We do not think that woman's rights as a citizen should depend upon her marriage, and

(b) We do not wish that the voters of the propertied class should be doubled by giving the right to vote to the wife of the property-qualified man as it will place the poor labouring class at a disadvantage, and will place more power at the hands of the rich and capitalist classes."[১৫]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মহিলারা স্বতন্ত্র নাগরিক হিসেবে তাদের রাজনৈতিক অধিকার দাবি করার সাথে সাথে দরিদ্র শ্রমিক শ্রেণীর নারীদের কথাও মনে রেখেছিলেন। কিন্তু নিজ গোষ্ঠীর স্বার্থে নারীদের "একতা"র নামে রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের দাবিতে কোন বিশেষ সুবিধাকে পরিহার করে চলতে চেয়েছেন। তবে মহিলাদের উপর গান্ধীজির প্রভাবের পূর্ণ প্রকাশ ঘটে ১৯৩২ সালের শেষে র‍্যামসে ম্যাকডোল্যান্ড কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ডকে কেন্দ্র করে গান্ধীজির অনশনের প্রক্ষিতে।

কম্যুনাল অ্যাওয়ার্ডে বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় (মুসলিম, খ্রিষ্টান, শিখ ও অ্যাংলো -ইণ্ডিয়ান) এবং শোষিত শ্রেণীর (অস্পৃশ্য দলিত) জন্য বিশেষ সুবিধাদানের উল্লেখের ফলে গান্ধীজি অনশন শুরু করেন। গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন যে অস্পৃশ্যদের জন্য সংরক্ষণের দ্বারা হিন্দুধর্মের মধ্যে বিভাজনের সৃষ্টি হবে, হিন্দুধর্মের একতার স্বার্থেই সব রকম সংরক্ষণের বিরুদ্ধতা করা প্রয়োজন। এ বিষয়েই ছিল গান্ধীজির সাথে বি. আর. আম্বেদকরের প্রধান মত পার্থক্য। আম্বেদকার তথাকথিত অস্পৃশ্য সমেত সমস্ত অনগ্রসর শ্রেণীর জন্যই তাদের সংরক্ষণ প্রয়োজন বলে মনে করতেন। জাতীয় আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা গান্ধীজির অনশনের ফলে দেশ থেকে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের নীতি গ্রহণ করার সাথে সাথে বিখ্যাত পুনা প্যাক্ট-এ অস্পৃশ্যদের জন্য সংরক্ষণও নীতিগতভাবে স্থান পায়। কিন্তু হিন্দুধর্মের এবং জাতীয় অন্দোলনের ঐক্যবদ্ধতার স্বার্থে গান্ধীজি মহিলাদের সংরক্ষণের বিরোধিতা করেন। ফলে দেশের সমস্ত নেত্রীস্থানীয় মহিলারাও (মুঠুলক্ষ্মী রেড্ডি সহ) এই কম্যুনাল এ্যাওয়ার্ডের নিন্দা করে সংরক্ষণের বিরোধিতা করেন। এই সময় মহিলারা যে কোন মূল্যে "একতা" এবং "সমান অধিকার"-এর যুক্তিকেই আবার প্রচার করেছেন নূতন গুরুত্ব দিয়ে। রাজকুমারী অমৃত কাউরের মতে "There is no question as to the reality of unity amongst us women. We want to send our best women and ... men to the councils—therefore we do not want the canker of communalism amongst us. Once we are divided into sects and communities all will be lost."[১৬]

১৯৩২ সালে দ্বিতীয় রাউণ্ড টেব্‌ল কনফারেন্সের প্রাক্কালে তিনটি মহিলা সংগঠনের সদস্যারাই দ্বিতীয় ফ্র্যানচাইজ কমিটির কাছে সম্পত্তি এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার, যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা এবং কোন আসনে নমিনেশন অথবা সংরক্ষণ ব্যতীত প্রতিনিধিত্বের দাবি করে স্মারকপত্র পেশ করেন। কিন্তু অধিকাংশ ভারতীয় নারীই ভোটাধিকার পাওয়ার উপযুক্ত নন, এই যুক্তিতে তাদের প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের দাবি অগ্রাহ্য করা হয়। শুধুমাত্র শহরাঞ্চালের নারীরাই ভোটাধিকার পান। মহিলা নেত্রীদের মত অনুযায়ী ভোটদাতাদের সংখ্যার গুরুত্বের সাথে তাদের গুণগত মানের প্রতিও সমান গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনেই শুধু শহররাঞ্চলের নারীদের ভোটধিকার দেওয়া হয়। শিক্ষাগত (গুণগত) যোগ্যতার প্রয়োজন ছিল "to co-ordinate the women's vote on the right lines.[১৭] তবে আসন সংরক্ষণের বিরোধিতায় তারা শেষ পর্যন্ত অনড় ছিলেন।

১৯৩৫ সালের আইনে মহিলাদের অনেক দাবিই পূর্ণ হয়নি। এই আইনে শিক্ষা এবং সম্পত্তির যোগ্যতা সমেত ২১ উর্ধ্ব বয়সী শহরাঞ্চলের মহিলারা ভোট দানের অধিকার প্রাপ্ত হন। তবে এই সময় ভোটাধিকার প্রাপ্ত মহিলার সংখ্যা ১৯২১ সালের ৩ লক্ষ ১৫ হাজার থেকে বেড়ে ৬০ লক্ষ দাঁড়ায়।[১৮] ১৯৩৫ সালের আইনে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ৪১ জন নারীর জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করা হয়। পুরুষদের মধ্যে ৪৩ শতাংশ আর মহিলাদের মধ্যে ৯ শতাংশ ভোটাধিকার প্রাপ্ত হন। ১৯৩৭ সালের প্রথম নির্বাচনে ৫৬ জন মহিলা প্রাদেশিক আইন সভাগুলিতে প্রবেশ করেন। এর মধ্যে মাত্র ১০ জন সাধারণ আসনে নির্বাচনের মাধ্যমে এবং ৫ জন নমিনেশন-এর মাধ্যমে এসেছিলেন।[১৯] সুতরাং বলা যায় যে ইংরেজ শাসিত ভারতীয় আইন সভায় কংগ্রেস দলের সাধারণ নারীদের কোন স্থান হয়নি। এ বিষয়ে শ্রীমতী মেরী জন যথার্থই বলেছেন, "If it was Gandhi who had been the most vociferous advocate against reserved seats for women,the congress has now had little room for any women candidates other than those who were staunch party workers in any case"[২০]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কিছু 'এলিট' শ্রেণীর মহিলা নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার বলে ভোটদানের এবং প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা লাভ করেন। আসলে সব মহিলার ভোটদানের অধিকার "একতা"র নামে অধিকার করে নেন মুষ্টিমেয় কিছু নারী। অনগ্রসর শ্রেণী বা সংখ্যালঘু মহিলা সহ গ্রামাঞ্চলের মহিলারা এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। আর স্বাধীনতা উত্তর কালে কংগ্রেসের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধির বিশেষ কোন চেষ্টা করা হয়নি। ফলে কংগ্রেস একটি পুরুষ প্রধান দলেই পরিণত হয়।

পাদটীকা

(১) Muthulakshmi Reddi (ed.), *Mrs Margaret Cousins and Her work in India*, Indian Women's Association, 1956, p. 85.

(২) Pattabhai Sitaramayya, *The History of Indian National Congress : 1885-1935*, The Working Committee of the Congress, 1935, p. 87.

(৩) *Proceedings of the thrity-third session of the Indian National Congress*, p.5.

(৪) *Report of the Franchise Committee*, London. 1918, pp. 4-14 . see Shyam Kumari (ed). *Our cause* Allahabad. Kitabistan. undated. p 353

(৫) Muthulakshmi Reddi, *op cit*. pp 15-16

(৬) ঐ.

(৭) A. B Keith. *A Constitutional History of India 1600-1935*, London. Mathuen & Co. 1937. p. 314.

(৮) Radha Krishna Sharma. *Nationalism, Social Reform and Indian Women*, Janaki Prakashan, New Delhi. 1981, p. 87.

(৯) Muthulakshmi Reddi. *Autobiography . A Pioneer Woman Legislator*, Madras, 1964, p.47.

(১০) Muthulakshmi Reddi, *My Experiences as a Legislator*, Current Thought Press. Triplicane. Madras, 1930. pp. 123 and 155

(১১) Muthulakshi Reddi, *Autobiography, op cit*, p. 124.

(১২) Kamala Devi Chttopadhyay, *Indian Women's Battle for Freedom*, Abhinav Publications, 1983, pp. 100-101.

(১৩) Geraldine H. Forbes, "Votes for women . The Demand for Woman's Franchise in India, 1917 - 1937" in Vina Mazumdar (ed), *Symbols of Power*, Allied Publication, Bombay. 1979 p. 11.

(১৪) Kamala Devi Chattopadhyay, *op cit*, p.99

(১৫) *Ibid*

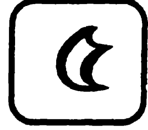
(১৬) *All India Women's Conference*, 1932-35. p.51.

(১৭) *Ibid*

(১৮) A. B. Keith, *op. cit*, p.359.

(১৯) Mary E. John, "Alternative Modemities ? Reservations and Women's Movement in India." *EPW*, 24 October, 2000, pp. 3822-3829.

(২০) Mary E. John. ঐ, p.3827



পঞ্চায়েতে ক্ষমতায়ন ঃ মহারাষ্ট্র কর্ণাটক ও কেরালা

ভারতে স্থানীয় স্ব-শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস অনেক পুরানো। তবে স্বাধীনতার পরে ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রে পঞ্চায়েতের অপরিসীম গুরুত্ব উপলব্ধি করেই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কাঠামো এবং কার্যক্রমের আমূল পরিবর্তন করা হয়। প্রয়োজনানুযায়ী পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন ক্রমাগতই ঘটে চলেছে।

গ্রামভিত্তিক স্থানীয় স্ব-শাসন

ভারতের মতো গ্রামভিত্তিক দেশে, যেখানে জনসংখ্যার শতকরা ৭৫ জনেরও বেশি মানুষ এখনও গ্রামে বাস করেন, স্থানীয় স্তরে স্ব-শাসন ব্যবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করেই ভারতীয় সংবিধানের (৪০ ধারা) নির্দেশাত্মক বিধিতে রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেওয়া হয় "to organise village panchayats and endow them with such power and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-sovegnment." এই গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের মানুষের হাতেই গ্রামের শাসন ও উন্নয়নের ভার তুলে দেওয়া। গ্রামই হল ভারতীয় পঞ্চায়েত বা স্থানীয় স্ব-শাসন ব্যবস্থার ভিত্তিভূমি। সুতরাং এখানে পঞ্চায়েতের আলোচনা প্রধানত গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যেই সীমিত থাকবে।

রাজ্যস্তরের নীচে স্থানীয় জনসাধারণের উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা (Community Development Project) ও জাতীয় সম্প্রসারণ পরিষেবার (National Extension Service) সূত্রপাত হয়। আর ১৯৫৭ সালে গঠিত বলবন্তরাই মেহ্‌টা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫৯ সালে ত্রি-স্তর ভিত্তিক নতুন স্থানীয় স্ব-শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। এই পরিচ্ছেদে আমরা গণতান্ত্রিক ও বিকেন্দ্রিকৃত এই

স্ব-শাসন ব্যবস্থায় নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়ে আলোচনা করব। প্রসঙ্গত অবশ্যই অন্যান্য দুর্বলশ্রেণীর আলোচনাও এখানে কিছুটা এসে যাবে।

স্থানীয় জনগণের দ্বারা গঠিত স্থানীয় জনগণের জন্য স্থানীয় জনগণের এই শাসনব্যবস্থার সফল কার্যকারিতা স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। ভারতের মতো নানা ধর্ম, শ্রেণী ও জাতিবর্ণে বিভক্ত দেশে সব গোষ্ঠীর মানুষেরই অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্ব এবং ক্ষমতায়ন বাঞ্ছনীয়। এদের মধ্যে আবার যুগযুগান্তর ধরে বংশ পরম্পরায় পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর নারী ও দুর্বলশ্রেণীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতালাভ একান্ত জরুরি। সমাজের প্রায় অর্ধাংশ নারী এবং আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে দুর্বল, অনগ্রসর দলিতদের অংশগ্রহণ ব্যতীত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রহসন মাত্র। আর এই প্রত্যয় থেকেই বলবন্তরাই মেহ্‌টা কমিটির সুপারিশ ছিল যে পঞ্চায়েতের প্রত্যেক স্তরে এমন অন্তত ২ জন মহিলাকে কো-অপ্ট করে নিতে হবে যারা মহিলা এবং শিশুদের উন্নতিকল্পে কাজ করতে উদ্যোগী হবে। এছাড়া, তপশিলী জাতি ও উপজাতির জন্যও আলাদা কো-অপশন-এর ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু নারী ও দুর্বলশ্রেণীর জন্য সংরক্ষণের কোন উল্লেখ ছিল না। কো-অপশনের জন্য কোন ব্যক্তিগত গুণ বা যোগ্যতা প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় কোন শক্তিশালী গোষ্ঠীর সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা। ফলে কো-অপশনের মাধ্যমে অল্প কিছু নারী ও দুর্বলশ্রেণীর মানুষ পঞ্চায়েতে প্রতিনিধিত্ব লাভ করতে পারলেও তাদের পক্ষে ক্ষমতা অধিকার করা সম্ভব নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৯৭৪ সালে দ্য কমিটি অন দ্য স্টেটাস অফ উনমেন পঞ্চায়েতে মহিলাদের সংরক্ষণের বিরুদ্ধতা করে "মহিলা পঞ্চায়েত" গঠনের সুপারিশ করেছিল।[১] পরবর্তীকালে নারী এবং তপশিলী জাতি/ উপজাতি সহ সমস্ত দুর্বলশ্রেণীর পক্ষে কো-অপশনের মাধ্যমে পঞ্চায়েতে প্রতিনিধিত্ব ও ক্ষমতা লাভের পথে নানা প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালে অশোক মেহ্‌তা কমিটির দ্বি-স্তর ভিত্তিক পঞ্চায়েতরাজের প্রত্যেকটি স্তরে দুটি করে আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত রাখার সুপারিশ করা হয়েছিল। এই সুপারিশ-এ আরও বলা হয়েছিল যে এই দুটি আসনে মহিলারা নির্বাচিত হতে ব্যর্থ হলে প্রত্যেক স্তরে ২ জন নারীকে কো-অপ্ট করে নিতে হবে। তপশিলী জাতি/উপজাতির জন্যও অনুরূপ সুপারিশ ছিল। আর এই কমিটি পঞ্চায়েতের সব স্তরের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের গুরুত্বের কথাও

উল্লেখ করেছিলেন। প্রকারান্তরে এই কমিটিতে রাজনৈতিক দলভিত্তিক নির্বাচনের সুপারিশই ছিল। কার্যত ভারতের মতো বিরাট এবং বিভিন্ন জাতি বর্ণ ধর্ম সমন্বিত বিচিত্র দেশের স্থানীয় স্ব-শাসন ব্যবস্থার প্রথমদিকে পঞ্চায়েতের কাঠামো, প্রকৃতি, স্তর, কার্যক্রম ও প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে সব রাজ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা স্বাভাবিক কারণেই সম্ভব হয়নি। স্থানীয় জনসংখ্যা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন পঞ্চায়েত। নারী এবং অন্যান্য দুর্বলশ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব বিষয়েও রাজ্যগুলির মধ্যে ছিল বিভিন্নতা। বেশির ভাগ রাজ্যেই পঞ্চায়েতে নারীদের কো-অপ্ট করে নেওয়ার নিয়ম প্রচলিত হয়। কোন কোন রাজ্যে আবার আশির দশকেই নারী এবং অবর শ্রেণীর জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এসব ছাড়াও পঞ্চায়েতগুলিকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারি অর্থানুকূল্যের উপর নির্ভর করতে হওয়ার ফলে এদের কার্যক্রম ও শাসন ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। নানা কারণে অনেকগুলি রাজ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আশির দশক পর্যন্ত তাদের নির্জীবতা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। কতগুলি রাজ্যে আবার পঞ্চায়েতের কার্যক্রম শুরুই হয় নব্বইয়ের দশকে। এই পরিস্থিতিতে সব রাজ্যে স্থানীয় স্ব-শাসন ব্যবস্থায় একটি সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সুতরাং সব রাজ্যে রাজ্য স্তরের নীচে পঞ্চায়েত রাজকে (১) অর্থিক স্বাধীনতা দিয়ে একটু সুস্থ পরিবেশ তৈরী করা; (২) পঞ্চায়েত রাজ-এ একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ কাঠামো ও কার্যক্রম প্রণয়ন করা ; এবং (৩) সেইসঙ্গে নারী ও অবর শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব বাড়িয়ে সামাজিক ন্যায় এবং সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে সংবিধানের ৭৩ তম সংশোধনি বিলটি পাশ করা হয়। রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর সহ বিলটি ১৯৯৩ সালের ২৪শে এপ্রিল ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনি আইনে পরিণত হয়। স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতালাভের ব্যাপারে এই ৭৩তম সংবিধান সংশোধনি আইনটির গুরুত্ব এতই বেশী যে ২৪ শে এপ্রিল দিনটিকে নারীর ক্ষমতায়নের দিন (Women's Empowerment Day) বলে গণ্য করা হয়।

এই ৭৩ তম সংশোধনি আইন অনুসারে সাধারণভাবে পঞ্চায়েতের তিনটি স্তর (গ্রাম স্তর, ব্লক বা সমিতি স্তর এবং জেলা স্তর) থাকা বাধ্যতামূলক হয়। তবে কোন রাজ্যের মোট জনসংখ্যা অনধিক ২০ লক্ষ হলে সেখানে মধ্যস্তরটি বাধ্যতামূলক নয়। প্রতিটি স্তরে প্রতি ৫ বছর অন্তর সব আসনে দলীয় ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের নীতি গৃহিত হয়। তবে এই আইনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল নারী ও

তপশিলী জাতি/উপজাতি প্রভৃতি সমাজের অগ্রসর শ্রেণীর মানুষের জন্য সংরক্ষণ বিষয়ক ঃ (১) প্রত্যেক স্তরে মোট আসনের অন্যূন এক তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য (তপশিলী জাতি/উপজাতি মহিলাসহ) সংরক্ষিত রাখা হয়, এবং বিভিন্ন নির্বাচন এলাকার মধ্যে এই সংরক্ষিত আসনগুলি আবর্তিত হওয়ার (Rotate) নীতি গৃহীত হয় ;

(২) কোন এলাকায় মোট জনসংখ্যার মধ্যে তপশিলী জাতি এবং উপজাতির জনসংখ্যার অনুপাতে এদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়, আর এই সংরক্ষিত আসনের অন্যূন এক তৃতীয়াংশ নির্দিষ্ট থাকে এই গোষ্ঠীর নারীদের জন্য ;

(৩) অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর (ওবিসি) প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি রাজ্য সরকারের উপর ন্যস্ত করে বিধান দেওয়া হয় যে রাজ্যসরকার বাঞ্ছনীয় মনে করলে এদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারেন ;

(৪) প্রত্যেক স্তরে পঞ্চায়েত প্রধান-এর মোট আসন সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ নারীদের জন্য (তপশিলী জাতি/উপজাতি নারী সহ) সংরক্ষিত থাকবে, এবং এই সংরক্ষিত আসনগুলি বিভিন্ন নির্বাচন এলাকার মধ্যে আবর্তিত হবে ; আর

(৫) গ্রাম ও ব্লক স্তরে সাধারণ সদস্য এবং প্রধানের আসনে সংরক্ষণের বাইরেও নির্বাচনে নারীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার স্বীকৃত হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে ১৯৮৮ সালে দ্য ন্যাশনাল পার্সপেক্টিভ প্ল্যান-এ পঞ্চায়েতের প্রতিটি স্তরে মহিলাদের জন্য ৩০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের এবং সম্ভাব্যস্থলে দলিত আদিবাসী ও দুর্বল শ্রেণীর জন্য প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছিল।[২] ১৯৯২ সালের ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনি আইনে মহিলাদের জন্য ৩০শতাংশ আসন সংরক্ষণের সুপারিশ গৃহীত না হলেও সাধারণ নারী, তপশিলী জাতি/উপজাতি নারী এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের জন্য রাজনৈতিক ন্যায় ও বিচারের পথ কিছুটা খুলে দেওয়া হয়। এখন প্রশ্ন হল, নারী সহ সমস্ত অবর শ্রেণীর পক্ষে কি বাস্তবে এই সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে? নারী, তপশিলী জাতি/উপজাতি এবং অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষেরা তৃণমূল স্তরে কতখানি রাজনৈতিক ও আর্থিক .ক্ষমতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন? আর ক্ষমতালাভ করলেও সেই ক্ষমতার কি তারা সদ্‌ব্যবহার করছেন? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে আমাদের বিভিন্ন রাজ্যের দিকে তাকাতে হবে।

সব রাজ্যের পঞ্চায়েতগুলি নিয়ে এখানে আলোচনা করা সম্ভব হবে না। রাজ্য

ভিত্তিক আলোচনার প্রধান অন্তরায় হল তথ্যের অভাব। পঞ্চায়েতের গুরুত্ব এবং কার্যকারিতার দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত অন্য কয়েকটি রাজ্যকে দুটি পরিচ্ছেদে ভাগ করে সেখানে নারীর অবস্থান বিষয়ে আলোচনা করা হবে। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি আলোচিত হবে আলাদা দুটি পরিচ্ছেদে। এই পরিচ্ছেদে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও কেরালা রাজ্যে নারীর ক্ষমতায়নই প্রধানত আলোচ্য। সেইসঙ্গে অনিবার্যভাবে অন্যান্য দুর্বল শ্রেণীর ক্ষমতায়নের বিষয়টিও আলোচনায় কিছুটা স্থান পাবে। এই তিনটি রাজ্যেই সংবিধান সংশোধনির আগে থেকেই মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল।

মহারাষ্ট্র

১৯৬১ সালের পঞ্চায়েত আইন অনুসারে ১৯৬২ সালে মহারাষ্ট্রে পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মহিলাদের সাধারণভাবে পঞ্চায়েতের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই অধিকার ভোগ করবার সুযোগ তারা পেতেন না। কারণ খুব বিশেষ কারণ ছাড়া মহিলাদের নির্বাচনের টিকিটই দেওয়া হত না। সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের (কংগ্রেস) কো-অপশন/নমিনেশন নিয়েই পঞ্চায়েতের প্রত্যেক স্তরে দুজন করে নারী প্রতিনিধিত্ব করতে পারতেন। শ্রীমতী হেজেল ডি লিমা কর্তৃক ১৯৭৮ সালের একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা অনুসারে মহারাষ্ট্রে ২৪টি জেলার চারটি বিভিন্ন অঞ্চলের ১৪৪ জন জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির মহিলা সদস্যের মধ্যে মাত্র ৬ জন ছিলেন নির্বাচিত। বাকি সকলকেই কো-অপ্ট করে নেওয়া হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত পুরুষদের আত্মীয়রাই কো-অপশন/নমিনেশন পেতেন। আর প্রায় সকলেই ছিলেন উচ্চবিত্ত ও উচ্চবর্ণ মারাঠা পরিবারভুক্ত। অনেক সময় নির্বাচনে আংশিক ব্যয়ভার বহন করতে ইচ্ছুক শিক্ষিত মহিলাদের পক্ষেও নির্বাচনে টিকিট পাওয়া ছিল কঠিন। শ্রীমতী রোহিনী গাওয়াস্কার মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্র সমীক্ষার পরে লিখেছেন, "It is only when the party in majority is quite sure about the victory of a particular woman is a particular area and there is no hope of getting a man elected there, only then the ticket is offered to a woman for a general seat."[৩]

দরিদ্র নিম্নবর্ণের মহিলাদের পক্ষে পঞ্চায়েতে স্থান পাওয়া ছিল অতি কঠিন।

শ্রীমতী ডি লিমার সমীক্ষার অন্তর্গত ১৪৪ জন মহিলার যে বর্ণ ও শ্রেণীগত চিত্র পাওয়া যায়, তাতেও ধনী ও উচ্চবর্ণের মহিলাদের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। সারণি-১ অনুসারে ১৪৪ জন মহিলা প্রতিনিধির মধ্যে ৭৪ জন বা ৫১ শতাংশ ছিলেন মারাঠা ক্ষত্রিয় এবং কুনবি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। উচ্চবর্ণের ক্ষত্রিয়রা ছিলেন প্রধানত ভূমি মালিক, আর বর্ণচাষী কুন্‌বিরাও ছিলেন জমির মালিক ও চাষী পরিবারভুক্ত। ফলে এই ক্ষত্রিয় এবং কুন্‌বিরাই জেলায় এবং ব্লকে উচ্চ সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এখানে ব্রাহ্মণ পরিবারগুলির (৮ শতাংশ) কোন সামাজিক

সারণি—১

পঞ্চায়েত সদস্যাদের বর্ণগোষ্ঠী

		বর্ণগোষ্ঠী	সংখ্যা	শতাংশ
১.		অগ্রসর (ব্রাহ্মণ)	১২	৮
২.		মধ্যম ঃ		
	(ক)	মারাঠা ক্ষত্রিয় মারাঠা কুন্‌বি	৭৪	৫১
	(খ)	গুজার, লাভা পাতিল, লিঙ্গায়েত, মাড়ওয়ারি, অহিন্দু ইত্যাদি	২৫	১৮
৩.		অনগ্রসর (ধাঙর, মালি, তেলি ধোবি ইত্যাদি)	২০	১৪
৪.		তপশিলী জাতি/উপজাতি (মাহার, মাং ইত্যাদি)	১৩	৯
		মোট	**১৪৪**	**১০০**

সূত্র ঃ HAZEL D' LIMA, *Women in Local Government : A Study of Maharastra*, Concept publishing co. New Delhi, 1983, p.39.

মর্যাদা ছিল না, অর্থনৈতিকভাবে এরা ছিলেন পরগাছা। আর গুজার, লেভা পাতিল, লিঙ্গায়েত, মারওয়ারি এবং অহিন্দু মহিলারা ১৮ শতাংশ আসন অধিকার করলেও আর্থিক কারণে কোন মর্যাদার অধিকারী ছিলেন না। সমীক্ষকের মতে "numerical superiority, high land owning status and traditional position of

authority give the Maratha (Khatriya and Kunbi) group the status of the dominant caste in Maharastra, and it is from this complex that the largest number of women representatives on panchayat Samitis and Zilla Parishads are selected."[৪] তপশিলী জাতি/উপজাতির যে ১৩ জন মহিলা (৯ শতাংশ) প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, তাদের মধ্যে ৮ জন ছিলেন আদিবাসী, বাকী পাঁচ জন ছিলেন মাহার ও মাং বর্ণের অন্তর্গত নববৌদ্ধ। আরও লক্ষ্যণীয় যে উচ্চ ও মধ্যবর্ণের প্রতিনিধিদেরই ছিল সংখ্যাধিক্য (৬৯ শতাংশ)। তপশিলী জাতি/উপজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীর (ওবিসি) মোট প্রতিনিধিত্ব ছিল ২৬ শতাংশ।

মহিলা প্রতিনিধিদের পারিবারিক জমির মালিকানা, আয়ের উৎস এবং স্বাধীন পেশা দিয়ে তাদের একটি শ্রেণীগত চিত্রও পাওয়া যায়। অন্যান্য রাজ্যের মতো মহারাষ্ট্রেও গ্রামীণ জনসাধারণের অধিকাংশই ক্ষুদ্র চাষী এবং ভূমিহীন শ্রমিক। কিন্তু জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির অধিকাংশ মহিলারা এসেছিলেন বহুজমির মালিকানা সম্পন্ন পরিবার থেকে। সমীক্ষক ডি লিমা দেখিয়েছেন যে ১৪৪ জন প্রতিনিধির মধ্যে ৭০ জনের (৪৮.৬২শতাংশ) পারিবারিক জমির পরিমাণ ছিল ৫-২০ একরের মধ্যে। আর ২৬ (১৮.০৫ শতাংশ) জনের পারিবারিক জমির পরিমাণ ছিল ৫-২০ একরের মধ্যে। কিন্তু সব পরিবারগুলি কৃষি নির্ভর ছিল না। ১১৭টি পরিবারের জীবিকা ছিল প্রধানত কৃষি নির্ভর। কিন্তু এদেরও পারিবারিক আয়ের অন্য উৎস ছিল ছোটখাট ব্যবসা, শিক্ষকতা ইত্যাদি। আর যে ৬টি পরিবারের কোন জমি ছিল না, তাদের মধ্যে ৪টি পরিবারের আয়ের উৎস ছিল ছোট খাট ব্যবসা ও বিবিধ পেশা। দুজন মহিলা ছিলেন সম্পূর্ণরূপে কৃষি শ্রমিক। এদের মধ্যে একজন ছিলেন তপশিলী জাতির এবং অন্যজন তপশিলী উপজাতির।[৫] এই ১৪৪ জন মহিলা প্রতিনিধির বর্ণ ও শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করার পর সমীক্ষক লিখেছেন, "There is a significant, positive relationship between caste and land holdings. These factors still continue to form a basis for power in rural areas. The traditional combination of caste and economic superiority seems to determine the family backgrounds of the majority of PS/ZP members. The rural poor consists pre-dominantly of agricultural labour households and small landholders

with cultivated holding of less than 5 acres and particularly less than 2.5 acres. These classes have a comparatively low representation in the sample of ZP/PS women members,"[৬]

নানাবিধ রাজনৈতিক গোলযোগের ফলে মহারাষ্ট্রে প্রায় ১২ বৎসর ২৯টি জেলা পরিষদ এবং ২৯৮টি পঞ্চায়েত সমিতিতে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নি। ১৯৯০ সালে মহারাষ্ট্র সরকার অনেকগুলি জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতি ভেঙ্গে দিয়ে এগুলিকে প্রশাসকের শাসনাধীনে নিয়ে আসেন। আর এ বছরই এ রাজ্যে পঞ্চায়েত স্তরের নির্বাচনে শতকরা ৩০ ভাগ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। উল্লেখ্য যে আশির দশকের মধ্য ভাগ থেকে এ রাজ্যে 'শেতকারী সংগঠন' পঞ্চায়েতে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের দাবি করে আসছিলেন, এবং বিভিন্ন সংগঠনের পরিচালনায় বেশ কয়েকটি "মহিলা পঞ্চায়েত"ও গঠিত হয়েছিল।

আশির দশকে মহারাষ্ট্রে সাধারণভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন বিশেষ অনুষ্ঠিত না হলেও এই দশকের মধ্যভাগ থেকে এই রাজ্যে বেশ কয়েকটি মহিলা গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ে উঠেছিল। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি গড়ে তুলতে সাহায্য করে 'শেতকারী সংগঠন', 'সমগ্র মহিলা আগাধি' , 'স্ত্রীমুক্তি সংগঠন' ও 'সংঘর্ষ বাহিনী' প্রভৃতি কয়েকটি মহিলা সংগঠন। মহিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সূত্রপাত হয় ১৯৮৪ সালে ইন্দাপুর তহশিল-এর অন্তর্গত মাউজে রাই গ্রামকে কেন্দ্র করে। ক্রমশ এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত এখানে ১২টি মহিলা গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছিল।[৭]

এই মহিলা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি সবই অবস্থিত ছিল অনুন্নত এলাকায়, আর সদস্যাদের অধিকাংশই ছিলেন দলিত শ্রেণীভুক্ত। এই পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ঃ ইয়াভটমাল জেলার মেটিখেড়া, আমেদনগর জেলার রেলেগাঁও, জলগাঁও জেলার ভিন্টার, অমরাবতী জেলার ইরাংগাঁও ও সালোর ও ওয়ার্ধা জেলার ইয়েনেরা এবং পুনে জেলার ব্রাহ্মণগড়। এগুলির মধ্যে অন্তত ৫টি 'শেতকারি সংগঠনের' অন্তর্গত এলাকায়, আর এদের মধ্যে অন্যতম হল ভিন্টার পঞ্চায়েতটি। তাপ্তি নদীর ধারে একটি প্রত্যন্ত গ্রাম ভিন্টারকে কেন্দ্র করেই এই মহিলা পঞ্চায়েত। ১৯৮৯ সালে 'শেতকারী সংগঠনের' সহায়তায় এখানে গুজার ও কোলি পরিবারের একটি মহিলা প্যানেল নির্বাচিত হয়। মহারাষ্ট্রের অন্যান্য জেলার গুজাররা সাধারণত সম্পদশালী হলেও ভিন্টার-এর গুজাররা ছিলেন দরিদ্র কৃষক। আর কোলিরা অনগ্রসর দরিদ্র কৃষক ও দিনমজুর। কোলি ও গুজার নারীরা এখানে সমান প্রতিনিধিত্ব লাভ

করেন, আর একজন কোলি নারী পঞ্চায়েত প্রধানের পদে নির্বাচিত হন। এই পঞ্চায়েতের সদস্যারা স্থানীয় পানীয় জলের সমস্যার সমাধান এবং পুরুষদের মদ খাওয়া রোধ করা ছাড়াও নানা রকম সমাজকল্যাণ মূলক কাজের সাথে যুক্ত থেকেছেন।[৮] এদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হল মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার ও অর্থকরী জীবিকার জন্য লড়াই। 'শেতকারী সংগঠনের' নেতৃত্বে এই পঞ্চায়েতের পরিচালনায় "লক্ষ্মী মুক্তি" পরিকল্পনার মাধ্যমে ১৭৬টি পরিবার জমির মালিকানা নারীদের নামে হস্তান্তরিত করতে বাধ্য হয়েছে। আর এই উদাহরণে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং 'শেতকারী সংগঠন' ও 'মহিলা আগাধীর' সদস্যাদের প্রচেষ্টার ফলে আশেপাশের প্রায় ২০ হাজার কৃষক পরিবারের আনুমানিক ৫০ হাজার একর জমি ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে নারীদের নামে হস্তান্তরিত হয়েছে।[৯]

'শেতকারী সংগঠনের' সহায়তায় ১৯৮৯সালে মেটিখেরা গ্রাম পঞ্চায়েতেও ৯ জনের একটি মহিলা প্যানেল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করে। কিন্তু জয়ের জন্য এদের অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ৯ জন এর এই প্যানেলের মধ্যে ২জন ছিলেন আদিবাসী, ১ জন দলিত, ২ জন যাযাবর আদিবাসী (নোমাডিক ট্রাইব), ২ জন কুন্‌বি এবং ২ জন ব্রাহ্মণ। ২ জন ব্রাহ্মণ মহিলার মধ্যে একজন হলেন মায়া ওয়াংখেড়ে, যিনি এই নির্বাচনে মহিলাদের নেতৃত্ব দেন। মায়া এবং তার অনগ্রসর জাতিভুক্ত স্বামী চন্দ্রকান্ত ওয়াংখেড়ে অনেকদিন আগে থেকেই 'শেতকারী সংগঠনের' সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মহিলা প্যানেলের ক্ষমতাবান পুরুষ প্রতিপক্ষ ছলে বলে কৌশলে মায়ার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে, এমনকী মহিলাদের আর্থিক লোভ দেখিয়েও শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে জয়লাভ করতে ব্যর্থ হয়।[১০] এই পঞ্চায়েতের মহিলা সদস্যারা নানাবিধ স্থানীয় উন্নয়নমূলক কাজ, বিশেষত মহিলাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির কাজে যুক্ত আছেন।

উপরোক্ত মহিলা পঞ্চায়েত দুটি ছাড়া আরও কয়েকটি মহিলা পঞ্চায়েত এ রাজ্যে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে। উদাহরণস্বরূপ, রোলেগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতটি নানা হাজারে নামে এক দীর্ঘকালের সামাজিক কর্মীর নেতৃত্বাধীনে নানারকম উন্নয়নমূলক কাজে ব্যাপৃত আছে। বিরাটগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের নেতৃত্ব দিয়েছেন একজন গ্রাম সেবক।[১১] আরও উল্লেখ্য যে ব্রাহ্মণগড়ে গ্রামের পুরুষরা প্রায় সবাই চাকরি উপলক্ষ্যে বম্বেতে চলে যাওয়ায় মহিলারাই এলাকার উন্নতির জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে 'স্ত্রীমুক্তি সংগঠনের' পরিচালনায় সাতরা জেলার ইন্দোলী গ্রাম

পঞ্চায়েতের নির্বাচনে নিম্নবর্গের একটি মহিলা প্যানেল দেওয়া হয়েছিল। এই প্যানেলের উদ্দেশ্য ছিল "To challenge the corrupt,wealthy casteists who think that pilitics is their exclusive birthright and also to challenge the culture of male domination in polities."[১২] কিন্তু উচ্চ বর্ণের পুরুষ প্রতিপক্ষের কাছে এই মহিলা প্যানেলের সবাই পরাজিত হন। অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল সাতরা জেলারই মান তালুকের পালসি গ্রাম পঞ্চায়েতে। তবে ক্ষমতা পেলে নারীরাও যে তার সদ্‌ব্যবহার করতে পারেন ধুলিয়া জেলার কুরুঙ্গি গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান তা প্রমাণ করেছেন। গ্রামের পুরুষরা পঞ্চায়েত থেকে একটি টেলিভিশন দাবি করেছিলেন। কিন্তু তার পরিবর্তে ব্যক্তিত্বময়ী এই মহিলা প্রধান গ্রামে দুটি কূপ খনন করিয়েছেন, ১টি দলিত এলাকায় আর ১ টি আদিবাসী এলাকায়। আর দুমাসের মধ্যে তার নেতৃত্বে ওই পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় সব মদের দোকান ও জুয়া (মটকা) খেলার আড্ডা বন্ধ হয়েছে। তবে ধুলিয়া শ্রমিক সংগঠন, পুনের স্ত্রীমুক্তি সংঘর্ষ পরিষদ এবং মহিলা মণ্ডল-এর সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতার ফলেই পঞ্চায়েতের প্রধান ইন্দুবাই-এর পক্ষে এ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল।[১৩]

১৯৯২ সালে ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনির পরে মহারাষ্ট্রের নতুন সংশোধনি আইন অনুসারে ১৯৯৫ সালে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরেই এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য (তপশিলীজাতি/উপজাতির নারীসহ) সংরক্ষিত রাখা হয়। আর আইননের বিধান অনুযায়ী তপশিলী জাতি/উপজাতিকে তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে সংরক্ষণ দেওয়া হয়। অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত হয় ২৭ শতাংশ আসন।

মহিলারা সংরক্ষণের বাইরে সাধারণ আসনেও কেউ কেউ নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন। আর সংরক্ষিত আসনে একাধিক মহিলা অনেকসময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। অর্থাৎ ১৯৯২ সাল থেকে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহেই অনেক বেড়েছে। কিন্তু এ রাজ্যে মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যরা সব সময় সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেন নি। আসলে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলি পুরুষ সদস্যদের হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার ফলে পুরুষরা মহিলা সদস্যদের সহজে মেনে নিতে পারেন নি, যদিও অধিকাংশ সময় তাদেরই স্ত্রী, কন্যা, মা, বোনেরাই নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন। বিশেষত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান-এর পদে আসীন মহিলারা যে অনেকক্ষেত্রে অত্যাচারিত হয়েছেন তার প্রমাণও আছে। উদাহরণস্বরূপ, পুনে শহর থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরত্বে খেরা

পুরন্দর গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত মহিলা প্রধান রত্নপ্রভা সাহেব রাও চিনে তার পরাজিত মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বীর পুরুষ সমর্থকদের দ্বারা শারীরিক নিগ্রহের শিকার হয়েছেন।[১৪] অনেক সময় আবার অশিক্ষা, সরলতা ও অনভিজ্ঞতার দরুণ মহিলা প্রধানেরা প্রতারিতও হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, পুনে জেলার ভোসলেওয়ারি তালুকের একটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একজন কন্ট্রাকটার মিথ্যে পরিচয় দিয়ে মহিলাপ্রধান ছাবু তাইকে দিয়ে কিছু কাগজপত্র সই করিয়ে নিয়েছিলেন।[১৫] স্থানীয় রাজনীতিতে মহিলাদের প্রবেশাধিকাররের প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু অসম্মান ও দুর্ভোগ তাদের প্রাপ্তি হলেও আশার কথা এই যে ধীরে ধীরে এই অবস্থা তারা কাটিয়ে উঠছেন।

কর্ণাটক

বলবন্তরাই মেহ্টা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৬০ সালেই কর্ণাটকের পঞ্চায়েত গঠিত হয়। কিন্তু বেশ কয়েকবছর পর্যন্ত এখানকার জনসাধারণের একটি বড় অংশের বিশেষত অনগ্রসর ও দুর্বল শ্রেনীর মানুষের, পঞ্চায়েত বিষয়ে কোন জ্ঞান ছিল না। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার তাৎপর্য তারা অনুধাবন করতে পারতেন না। শুধু নির্বাচনের সময় ভোট দেওয়াই তাদের একমাত্র কাজ বলে মনে করতেন। পঞ্চায়েত প্রধানকেই তারা গ্রামের পরিচালক মনে করলেও অনেকেই প্রধান-এর নামও জানতেন না। এমতাবস্থায় পঞ্চায়েতের নির্বাচন মাঝে মাঝে অনুষ্ঠিত হলেও তালুক ডেভেলপমেন্ট-এর ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই নানাবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনার উপকারভোগী ছিলেন।[১৬] দরিদ্রদের জুটত না কিছুই।

সাধারণভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে নারীরা পঞ্চায়েতি শাসন ব্যবস্থায় প্রবেশ করতে অপারগ হতেন বলে ১৯৮৩ সালের আইনে ২৫ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়। তবে ১টি মাত্র আসন নির্দিষ্ট রাখা হয় তপশিলী জাতি/উপজাতির জন্য। ১৯৮৩ সালের নির্বাচনে জেলা পরিষদ ও মণ্ডল পরিষদে যথাক্রমে ২৬.২৫ শতাংশ এবং ২৪.৪ শতাংশ মহিলা নির্বাচিত হয়েছিলেন। অনুমান করা যায় জেলা পরিষদে সংরক্ষণের বাইরেও সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই কয়েকজন নারী জয়লাভ করেছিলেন। সত্তরের দশকের তুলনায় আশির দশকের পরিস্থিতি অনেকখানি উন্নতির পরিচায়ক। তবে এখানেও পঞ্চায়েতে উচ্চবর্ণ মহিলাদেরই ছিল প্রাধান্য। ইনস্টিটিউট অফ স্যোশাল সাইন্সেস পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে জেলা পরিষদে

নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের মধ্যে ৬০ শতাংশ ছিলেন লিঙ্গায়েত ও ভোক্কালিগা, অর্থাৎ উচ্চবর্ণভুক্ত (dominant caste), যারা সংখ্যাধিক্য এবং রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষমতার বলে সমাজে প্রাধান্য করতেন। পুরুষ সদস্যদের মধ্যেও ছিল এদেরই সংখ্যাধিক্য। রাজ্য সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ১ জন তপশিলী জাতি/উপজাতির নারীও নির্বাচিত হয়েছিলেন।[১৭]

৭৩ তম সংবিধান সংশোধনির পর ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসেই প্রথম এই রাজ্যের পুরানো আইন সংশোধিত হয়। এই আইনে তপশিলী জাতি/উপজাতি এবং অনগ্রসর শ্রেণীর নারীসহ সব নারীর জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। কিন্তু এই বছরই ডিসেম্বর মাসের নির্বাচনে সংরক্ষিত আসনের বাইরেও অনেক সাধারণ আসনে মহিলারা নির্বাচিত হয়ে আসার ফলে মণ্ডল পঞ্চায়েতগুলিতে (গ্রাম পঞ্চায়েত) ৪৩.৬ শতাংশ আসনে নির্বাচিত মহিলারা প্রতিনিধিত্ব করেন।[১৮] তবে উল্লেখ্য যে নির্বাচিত মহিলাদের শতকরা ৮০ শতাংশেরই কোন পূর্ব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছিল না। এরা ছিলেন পূর্ণমাত্রায় গৃহবধূ এবং গৃহকাজেই মনপ্রাণ নিবেদিত। কোন রাজনৈতিক দলের পুরুষ সদস্যদের স্ত্রী, বিধবা, বোন অথবা মা হওয়াই ছিল এদের একমাত্র যোগ্যতা। এ বিষয়ে ইনস্টিটিউট অফ স্যোশাল সাইন্সেস-এর অধিকর্তা জর্জ ম্যাথু লিখেছেন, "During the election campaign, these women were always projected as someone's wife, mother, sister or widow...they attributed their victory in the elections to the political party or its leaders or the status of the male member in the family. None mentioned their own potential or promises. By and large, these women candidates were unknown to their constituencies."[১৯] যে দেশে শত শত বছরের সামাজিক ঐতিহ্যে নারীর একমাত্র পরিচয় ছিল কোন পুরুষের স্ত্রী, বিধবা, মা অথবা বোন রূপে, যেখানে নারীর নিজস্ব কোন ব্যক্তিগত স্বাধীন সত্তা থাকতে দেওয়া হয়নি কোনদিন (প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচিত), সেখানে স্থানীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে এরকম হওয়াটা কিছু আশ্চর্য নয়। বরং খুবই স্বাভাবিক। নারী প্রতিনিধিদের মধ্যে ২০ শতাংশ ছিলেন কিছুটা রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। এদের মধ্যে ২ জন প্রাদেশিক আইন সভায় এবং বাকিরা জেলা ও তালুক স্তরে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই পুরুষের তুলনায় নারীদের শিক্ষার মান ছিল অনেক নীচে। জেলা পরিষদে নির্বাচিত

পুরুষদের ২০ শতাংশ প্রথাগত শিক্ষা ও কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, কারও কারও স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষাও ছিল। আর নারীদের মধ্যে স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষা সমেত সাধারণ প্রথাগত শিক্ষা ছিল মাত্র ৫ শতাংশের।[২০]

যুগ যুগান্তর ধরে পরিবারের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ এবং বাইরের জগৎ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ নারীদের রাজনৈতিক চেতনা ও অভিজ্ঞতা কম হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। আর ঠিক এই কারণেই নির্বাচিত হওয়ার পরেও প্রাথমিকভাবে পঞ্চায়েতরাজ-এ নারীদের অংশগ্রহণ ছিল খুবই সীমিত। শুধু মিটিং উপলক্ষ ছাড়া অধিকাংশ মহিলাই পঞ্চায়েত অফিসে বিশেষ যেতেন না। আর মিটিং-এর মধ্যেও নারীরা সাহস করে তাদের বক্তব্য পেশ করতে ব্যর্থ হতেন। পুরুষ সদস্যদের অনুপস্থিতিতে অধ্যক্ষ অথবা উপাধক্ষের নিকট নিজেদের বক্তব্য পেশ করতেন। এ বিষয়ে জর্জ ম্যাথু যথার্থই বলেছেন, "The social distance in the presence of men and the relative inexperience and uncertainty as to whether what they say would be acceptable or not, often came in the way of the women's participation in the meetings."[২১] কিন্তু খুব দ্রুত এ অবস্থার পরিবর্তন লক্ষিত হয়েছে। ২ বছরের মধ্যেই নারীদের রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয়েছে, মিটিং-এর মধ্যেই তারা অনেক প্রশ্ন তুলতে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে শুরু করেছেন। ম্যাথুর মতে "A qualitatively improved participation in terms of the contents of their comments was... evident."[২২] মহিলারা যে তাদের অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে ক্রমশই সচেতন হয়ে উঠেছেন তার প্রমাণ আরও আছে। ১৯৯৯ সালে ব্যাঙ্গালোর জেলা পরিষদের মিটিং-এ মহিলারা তাদের বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বাধা পেয়ে মিটিং-এর মধ্যেই রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তারা একযোগে সভায় পুরুষ আধিপত্যের সমালোচনা করেছেন, আর একথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে মিটিং-এ এসে নীরব শ্রোতা হয়ে বসে থাকার কোন অর্থ নেই। এ রকম হলে তারা ভবিষ্যতে পঞ্চায়েতের সব মিটিং বর্জন করবেন বলে ভয়ও দেখিয়েছেন।[২৩]

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, নিম্নবর্গের নারীরাই জাতিবর্ণ বিদ্বেষ ও রাজনৈতিক দলাদলির শিকার হয়েছেন বেশি। বিশেষত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান-এর পদে আসীন নিম্নবর্গের নারীই বেশি সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছেন। কনকপুরা তালুক-এ হুকুন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতে তপশিলী জাতি/উপজাতি নারীর জন্য সংরক্ষিত ১টি আসনে ১জন

তপশিলী উপজাতি মহিলা কংগ্রেসের সমর্থনে প্রধান-এর পদে নির্বাচিত হন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা দলের সদস্যরা প্রথম থেকেই এই আদিবাসী মহিলার বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা অভিযোগ আনতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করান।[২৪] এরকম তথ্য আরও আছে। ১৯৯৯ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস দলের সমর্থনে মান্ডা জেলার বেসাগারহাল্লি গ্রাম পঞ্চায়েতে তপশিলী জাতির আদি আম্মা প্রধান-এর পদে নির্বাচিত হন। কিন্তু কংগ্রেসের নির্দেশ মতো আদি আম্মা এরপরও তার নিজস্ব পেশা (কৃষি শ্রমিক তথা স্থানীয় পুলিশ চৌকির শৌচাগারের ঝাড়ুদার) ত্যাগ করতে অস্বীকার করেন, আর নতুন উদ্যোগে গ্রাম পরিষ্কার রাখার কাজে নিযুক্ত হন। দলের শিখণ্ডী রূপে আদি আম্মাকে দিয়ে কাজ করাতে না পেরে তার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে তাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। আদি আম্মা তারপরেও নিজস্ব পেশায় নিযুক্ত আছেন, এবং পরবর্তী নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্যও তিনি বদ্ধপরিকর।[২৫] আশা করা যায় নারীদের অপমানিত সত্তাই অচিরে তাদের আরও দক্ষতার পথে এগিয়ে দেবে।

কেরালা

১৯৬০ সালের কেরালা পঞ্চায়েত আইনানুসারে এ রাজ্যে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। নারীশিক্ষা, কর্মসংস্কৃতি এবং সামাজিক অগ্রসরতার দিক দিয়ে যে কেরালা রাজ্য অগ্রণী স্থান অধিকার করে আছে, সেখানে বহু নারী পঞ্চায়েত নির্বাচনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই জয়লাভ করে আসছেন। ১৯৯১ সালে কেরালার ৪টি জেলা কাউন্সিল-এ মহিলাদের জন্য ৩০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকা সত্ত্বেও বামপন্থী দলের প্রতিনিধি হিসেবে অনেক নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই জয়লাভ করেছিলেন। ফলে নারীরা এখানে মোট আসন সংখ্যার ৩৫ শতাংশ অধিকার করেছিলেন।[২৬] অনুমেয় যে এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক তপশিলী জাতি/উপজাতি নারীও ছিলেন, কারণ ১৯৬০ সালের আইন অনুযায়ী এখানে কোন এলাকার ভোটারদের অন্যূন ৫ শতাংশ তপশিলী জাতি/উপজাতি হলে যথাক্রমে ১টি করে আসন তপশিলী জাতি/উপজাতির পুরুষদের ও নারীদের জন্য নির্দিষ্ট রাখার নিয়ম ছিল।

এখানে মহিলা প্রতিনিধিদের মধ্যে অধিকাংশই গৃহবধূ হলেও এদের অনেকেই অল্পবয়স থেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। আর এদের মধ্যে ৩ শতাংশের কিছু না কিছু নিজস্ব পেশাও ছিল। বিভিন্ন বর্ণ ও সম্প্রদায়

ভিত্তিক কেরালা রাজ্যে পঞ্চায়েতেও বর্ণ ও সম্প্রদায়ের বিভিন্নতার প্রতিফলন ঘটাই ছিল স্বাভাবিক। হিন্দু, মুসলিম ও খ্রিষ্টান, এই ৩টি হল কেরালার প্রধান রাজনৈতিক শক্তির প্রতিভূ। এই ৩টি গোষ্ঠীর মানুষই আলাদা আলাদাভাবে সংগঠিত। একটি সমীক্ষা অনুসারে ১৫টি জেলায় পঞ্চায়েতের শতকরা ৬৪ ভাগ নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধি ছিলেন হিন্দু, তারপর দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন খ্রিষ্টান নারীরা। আর মুসলিম প্রতিনিধিরা ছিলেন মাত্র ১০.৭ শতাংশ।[২৭] অন্য দুটি ক্ষেত্রে গবেষণা অনুযায়ী নারী প্রতিনিধিদের ৩০ শতাংশ ছিলেন অনগ্রসর বর্ণ/সম্প্রদায়ভুক্ত নায়ার ও খ্রিষ্টান। আর ৮ শতাংশ ছিলেন অনগ্রসর বর্ণ/সম্প্রদায়ভুক্ত এজভ, বৈষিয়ম, নাদার, ল্যাটিন ক্যাথলিক ও মুসলিম। তপশিলী জাতি মহিলাদের (চেরুমার বা চামার) প্রতিনিধিত্ব ছিল মাত্র ২.৪ শতাংশ।

আমরা এই নারী প্রতিনিধিদের শুধু বর্ণই নয়, শ্রেণী সম্বন্ধেও কিছুটা সংবাদ পাই। সাধারণত স্থায়ী সম্পত্তি, অর্থাৎ বাড়ি ঘর ও জমির মালিকানা এবং পারিবারিক আয়কে শ্রেণীর নির্ণায়ক রূপে ধরা হয়। কিন্তু নারীদের যেহেতু স্থায়ী সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব খুবই কম, পারিবারিক আয়কেই শ্রেণীর নির্ণায়ক হিসেবে ধরে দেখা গেছে যে তপশিলীভুক্ত প্রতিনিধিরাই দরিদ্রতম। এদের বাৎসরিক পারিবারিক আয় ২০ হাজার টাকার নীচে। আর ১৩ শতাংশের বাৎসরিক আয় ৩০-৫১ হাজার টাকার মধ্যে। এই ৩০-৫১ হাজার টাকা আয়ের পরিবারগুলির ৮ শতাংশ অনগ্রসর বর্ণ/সম্প্রদায়ভুক্ত। সুতরাং বলা যায় যে কেরালার মতো প্রগতিশীল রাজ্যেও পঞ্চায়েতে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত বর্ণ হিন্দু নারীদেরই ছিল সংখ্যাধিক্য (১৪ শতাংশ)। তার পরের স্থান ছিল নিম্নবিত্ত অনগ্রসর বর্ণ/সম্প্রদায়ের। সর্বাপেক্ষা কম সংখ্যায় ছিলেন তপশিলী জাতির মহিলারা (২.৪ শতাংশ)। কেরালায়, যেখানে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় নারীশিক্ষার হার অনেক বেশি, নারী প্রতিনিধিদের অনেকেই স্কুলস্তর অতিক্রম করেছিলেন। কেউ কেউ স্নাতকও ছিলেন। শিক্ষায় তপশিলী জাতির নারীরাই ছিলেন বেশি অনগ্রসর।[২৮] অনুমান করা যায় যে আর্থিক ও শিক্ষাগত দুর্বলতাই তপশিলী নারীদের পঞ্চায়েতে সর্বনিম্ন প্রতিনিধিত্বের কারণ।

নারী প্রতিনিধিদের অধিকাংশই ছিলেন কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য (প্রধানত সি পি আই এম এবং কংগ্রেস)। বিভিন্ন নারী সংগঠনের সাথে যোগাযোগই মহিলাদের পঞ্চায়েতে নির্বাচনের ব্যাপারে সাহায্য করেছে। এ রাজ্যে যেসব সংগঠনের সাথে মহিলারা সাধারণভাবে যুক্ত ছিলেন, সেগুলি হল ঃ (১) কংগ্রেস (আই) এর

মহিলা শাখা, (২) সর্ব ভারতীয় গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি (সি. পি. আই. এম.), এবং কেরালা মহিলা সংঘ (সি. পি. আই)। এগুলি ছাড়া আরও অনেক ছোট ছোট রাজনৈতিক দলের মহিলা শাখাও রাজ্য এবং জেলা স্তরে সংগঠনের কাজে যুক্ত ছিল। তাছাড়া এই রাজ্যে নারী প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে আরও একটি বিষয় কাজ করেছে। কেরালা কৃষিভিত্তিক রাজ্য হলেও সমীক্ষায় দেখা গেছে যে মহিলা প্রতিনিধিদের মাত্র ১২ শতাংশের স্বামী/পিতার জীবিকা ছিল কৃষি নির্ভর। অধিকাংশের স্বামী/পিতা (৫৪.৮ শতাংশ) যুক্ত ছিলেন পরিষেবা ক্ষেত্রে (করণিক, শিল্প শ্রমিক ইত্যাদি), আর ১৯ শতাংশ যুক্ত ছিলেন ব্যবসায়ের সাথে। স্বামী পিতা পরিষেবার ক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকার ফলে এই মহিলাদের শ্রমিক ইউনিয়নের সাথে নিয়মিত যোগযোগ ছিল। আর নির্বাচনের ক্ষেত্রে তা অনেকখানি সহায়ক হয়েছে। আরও একটি প্রয়োজনীয় কথা হল এই যে নির্বাচিত নারীদের মধ্যে অনেকেই আগে কোন না কোন ভাবে বিক্ষোভমূলক রাজনৈতিক আন্দোলনে (agitational politics), যেমন জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে, উপযুক্ত জল সরবরাহের দাবিতে এবং বিদ্যুৎ ও বেকারভাতা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে আন্দোলনে, শামিল হয়েছিলেন। অনেকে আবার স্থানীয় রাস্তাঘাট নির্মাণ, কূপ খনন, যানবাহনের অভাব দূরীকরণ ইত্যাদির দাবিতে পিকেটিং, মিটিং ও মিছিলে যোগদানও করেছেন। তবে উল্লেখ্য যে বিভিন্ন সময়ে বহু নারী নানা গণআন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকলেও শুধু এমন নারীরাই নির্বাচনে অগ্রাধিকার পেয়েছেন যাদের স্বামী/পিতা/ভ্রাতা কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য অথবা ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন।[২৯] সুতরাং এখানেও অভিযোগ উঠেছে যে পরিবারের পুরুষ সদস্যদের অথবা রাজনৈতিক দলের চাপেই মহিলারা পঞ্চায়েতে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাদের কাজকর্মেও পুরুষদের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে।

৭৩ তম সংবিধান সংশোধনি আইন অনুসারে কেরালাতে ১৯৯৪ সালের ২৩ শে এপ্রিল নতুন রাজ্য পঞ্চায়েতি আইন প্রণীত হয়। তপশিলী জাতি/উপজাতি সহ সব নারীদেরই পঞ্চায়েতে প্রবেশাধিকার বাধ্যতামূলক হলেও মহিলাদের কাজের ক্ষমতা এখনও সীমাবদ্ধই আছে। ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনি আইনে পঞ্চায়েতগুলি পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি প্রশাসনিক, আর্থিক এবং কার্যকরী ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় (অন্তত আইনানুসারে) পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রকৃত স্ব-শাসনের দিকে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। আর এই সময় মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলি ছেড়ে

দেওয়ার অর্থ হল তৃণমূল স্তরের রাজনীতিতে এসব আসনে পুরুষদের ক্ষমতা হারানো। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে পুরুষরা এখন প্রার্থী হতে না পারার ফলে অধিকাংশ স্থলে তাদের পরিবর্ত রূপে পরিবারের নারীদেরই এগিয়ে দিয়েছেন। তাই আপাতদৃষ্টিতে নারীদের কিছুটা ক্ষমতায়ন হলেও প্রকৃত ক্ষমতা ধরে রেখেছেন পুরুষরাই। ক্ষমতার স্থায়ী হস্তান্তর পুরুষরা হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে মেনে নিতে পারেন নি। তাছাড়া নারীদের অশিক্ষা, অনভিজ্ঞতা ও সরলতা প্রভৃতি অন্তরায় তো ছিলই। একথা বিশেষভাবে সত্য দুর্বল শ্রেণীর ক্ষেত্রে। নিম্নবর্গের মহিলা পঞ্চায়েত প্রধানদের নিগ্রহের ঘটনা থেকেই তা প্রমাণিত হয়। রাজনৈতিক দলগুলিও এজন্য অনেকখানি দায়ী। উদাহরণ রূপে বলা যায় যে উত্তর কেরালার কাসারগড় জেলার পুথিগে গ্রাম পঞ্চায়েতে (এখানে জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ মুসলিম) প্রধান নির্বাচিত হন ফতিমা সুরহা। কিন্তু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ফতিমা একটি রাজনৈতিক দলের নীতি কার্যকর করতে অস্বীকৃত হওয়ার ফলে দলের বিরাগভাজন হন। ফতিমার অভিযোগ ছিল যে তার দল বিপক্ষ দলের এলাকাতে উন্নয়নমূলক কাজে বাধা সৃষ্টি করেছেন এবং বে-আইনিভাবে দলের কার্যকরী সমিতির একজন সদস্য তাকে দিয়ে চেক এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজ সই করিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। ফতিমা অস্বীকৃত হওয়ার ফলে তার পদত্যাগ দাবি করা হয়। তার বাড়ি ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং তার স্বামী কেরালা সরকারি শিক্ষক সমিতির সক্রিয় সদস্য এইচ এ সালামকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। ফলে অবশ্য মুসলিম প্রধান এই গ্রামে দলটির ভাবমূর্তি কিছুটা নষ্ট হয়, আর ফতিমাও তার পদে দৃঢ়ভাবে আসীন থাকেন।[৩০] সন্দেহ নেই, নারীদের এই মানসিক দৃঢ়তাই তাদের চলার পথে বড় পাথেয়।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক এবং কেরালা, এই তিনটি রাজ্যেই সংবিধান সংশোধনির পূর্বেই নারীদের জন্য পঞ্চায়েতে সংরক্ষণের নিয়ম প্রচলিত ছিল। কিন্তু সংরক্ষণের মাধ্যমে উচ্চবিত্ত এবং উচ্চতর শ্রেণীর নারীরাই পঞ্চায়েতে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছেন বেশি। তপশিলী জাতি/উপজাতি নারীর প্রতিনিধিত্ব ছিল প্রতীকি মাত্র। তাছাড়া যেসব নারী প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছিলেন, তারাও কেউ-ই প্রকৃত অর্থে ক্ষমতালাভ করতে পারেন নি। সংবিধান সংশোধনের পরও এই অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি, যদিও পঞ্চায়েতের

তিনটি স্তরেই অন্যূন এক তৃতীয়াংশ আসন নারীর জন্য সংরক্ষিত রাখা বাধ্যতামূলক হয়। পঞ্চায়েতে নির্বাচিত হওয়ার জন্য রাজনৈতিক দলের সমর্থন আবশ্যক, আর পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরাই রাজ্য স্তরের নীচে রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষমতার ধারক ও বাহক। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে কোন রাজনৈতিক দলের নেতা অথবা দলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত পুরুষদের আত্মীয়রাই মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার এবং জয়লাভ করবার সুযোগ পেয়েছেন। এখানেও স্বাভাবিক কারণেই উচ্চ এবং নিম্নবর্গের মধ্যে দেখা দিয়েছে সংঘাত। কারণ এই তিনটি রাজ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতার সমীকরণে উচ্চবর্গই বেশি শক্তিশালী। ক্ষমতার এই দ্বন্দ্বে তাই প্রধানত আক্রমণের শিকার হয়েছেন নিম্নবর্গের মহিলা সদস্যারা, বিশেষত গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিলা প্রধানরা। জর্জ ম্যাথু এবং রমেশ নায়েক তাদের সমীক্ষার পর যথার্থই বলেছেন, "A convenient way to retain power in the hands of the traditionally powerful is to put up proxy candidates in accordance with the letter of the law but keep the control in the hands of the dominant castes, landlords, always men. Men are the main actors in wards reserved for women or in panchayats even where the *sarpanches* are women."[৩১] আর একথা বিশেষভাবে সত্য নিম্নবর্গের মহিলা সরপঞ্চদের (গ্রাম প্রধানদের) ক্ষেত্রে। নিম্নবর্গের মানুষকেই চিরদিন শাসন শোষণের মাধ্যমে অবদমিত করে রাখা হয়েছে। তাই এখন হঠাৎ গ্রামীণ রাজনীতিতে ক্ষমতার প্রতীক গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানদের আসনটিতে কোন নিম্নবর্গের মানুষকে, বিশেষত নারীকে মেনে নিতে, তার অধীনে কাজ করতে পুরুষরা, বিশেষত উচ্চবর্গের পুরুষরা মনে হয় অপমানিত বোধ করেন। তাই প্রধান-এর পদে আসীন নিম্নবর্গের নারীকেই প্রকট বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। কখনও কখনও শারীরিক নির্যাতনও ভোগ করতে হয়।

পরিশেষে এই তিনটি রাজ্যের আলোচনা থেকে একথা বলা যায় যে অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও সাধারণভাবে নারীদের রাজনৈতিক চেতনা ও গণতান্ত্রিক অধিকারবোধ ধীরে ধীরে জাগ্রত হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে নারীদের চলার পথে এটুকুই কম মূল্যবান প্রাপ্তি নয়।

পাদটীকা

(১) *Towards Equality Report of the Committee on the Status of Women in India,* Government of India, Ministry of Education and Social Welfare, New Delhi, 1974, p.30

(২) *National Perspective Plan for Women 1988-2000,* Report of the Core Group set up by the Department of Women and Child Development, Government of India, New Delhi, 1988, p.46

(৩) Rohini Gawaskar, " The Political Face of Stree Shakti in Maharastra" (in Marathi), Aditya Publication House Bombay, 1986; as quoted in Simrita et al, "Participation of Women in Electoral Politics in Maharastra," in *Women in Politics . Forms and Processes,* Har-Anand Publications, New Delhi, Friedrich Elbert stifting, 1993, p.80

(৪) Hazel D'Lima, *Women in Local Government : A study of Maharastra,* concept Publishing Co, New Delhi, 1983, P.41

(৫) ঐ, PP. 52-55

(৬) ঐ, P.55

(৭) বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন Bishakha Datta (ed), *And Who Will Make the Chapatis ? A study of All-Women Panchayats in Maharastra,* stree, Calcutta, 1998.

(৮) Bidyut Mohanty," Panchayati Raj, 73rd Contitutional Amendment and Women," *EPW*, 30 December, 1995, PP. 3346-3350

(৯) *The Indian Express,* 21 December, 1990.

(১০) Gail Omvedt, "Women, Zilla Parishads and Panchayat Raj : Chandwad to Vinter," *EPW*, 4 August, 1990. pp. 1687-1680.

(১১) ঐ,

(১২) Indumati Patankar "Comfronting Male Power : An All Women Panel Contests Panchayat Election." *Manushi,* No. 25, 1984.

(১৩) Friedrich Elbert Stifting, *Women in Politics : Forms and Processes*, Har Anand Publication, New Delhi, 1993, p. 74.

(১৪) *The Indian Express,* 20 September, 1996.

(১৫) ঐ

(১৬) U. Gurumurthy, *Panchayati Raj and the Weaker Sections,* Ashish publication House, New Delhi. 1987. p. 166

(১৭) George Mathew, *Panchayati Raj . From Legislation to Movement*, Concept Publishing Company, 1994, p 131.

(১৮) George Mathew, *Liberal Times*, April, 1999, p.11

(১৯) George Mathew, *Panchayati Raj : From Legislation to Movement* *op. cit.* p. 132.

(২০) ঐ,

(২১) ঐ,

(২২) ঐ, p.133

(২৩) *Panchayat Update*, January, 1999, p.4.

(২৪) *The Indian Express*, 20 September, 1996.

(২৫) *Panchayat Update*, July, 1999, p. 4.

(২৬) Susheela Kaushik, *Women in Panchayati Raj*, Har Anand Publication, New Delhi, 1993, pp. 27-28.

(২৭) Manu Bhaskar, "Woman Panchayat Members in Kerala : A Profile," *EPW*, April 26-May 2, 1997, WS 13-20.

(২৮) ঐ,

(২৯) ঐ,

(৩০) *The Indian Express*, 2 September, 1997.

(৩১) George Mathew and Ramesh Chandra Nayak "Panchayat at Work : What it Means for the Oppressed ?" *EPW*, 6 July, 1996, pp. 1765-1771.



পঞ্চায়েতে ক্ষমতায়ন ঃ অন্য কিছু রাজ্যে

মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও কেরালার পর এই পরিচ্ছেদে আমরা আরও কয়েকটি রাজ্যের স্থানীয় স্ব-শাসন ব্যবস্থায় নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে আলোচনা করব। এই রাজ্যগুলি হল মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, হরিয়ানা এবং বিহার।

মধ্যপ্রদেশ

মধ্যপ্রদেশ সরকার ১৯৯৩ সালের ২০ শে ডিসেম্বর নতুন পঞ্চায়েতি আইন পাশ করলেও কোন কোন বিষয়ে ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনি আইনের থেকে এই আইনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই আইনে সাধারণভাবে নারীদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত হলেও কোন এলাকায় জনসংখ্যার অনধিক ৫ শতাংশ তপশিলী জাতি/উপজাতি হলে, তাদের জন্য পঞ্চায়েতে ১টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়। আর কোন স্থানে মোট সংরক্ষিত আসন ৫০ শতাংশ বা তার কম হলে, সেখানে ২৫ শতাংশ আসন অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য রাখা হয়। তবে কোন এলাকায় তপশিলী জাতি/উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষ না থাকলে এই আসনগুলিকে অসংরক্ষিত রাখার নীতি গৃহীত হয়। ১৯৯৪ সালের মে-জুন মাসে এই নতুন আইন অনুযায়ী পঞ্চায়েতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সব রাজ্যে সব সময় পঞ্চায়েতের কার্যক্রম যে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় না এবং তপশিলী জাতি/উপজাতির এবং মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে যে কত গোলযোগ উপস্থিত হয়, তার প্রমাণ পাওয়া যায় মধ্যপ্রদেশে। গ্রামাঞ্চলে, বিশেষত অনুন্নত অঞ্চলে অবস্থিত গ্রামগুলিতে নারী পুরুষ, ধনী দরিদ্র এবং উচ্চ ও নিম্নবর্ণের বৈষম্য যে কি পঙ্কিল রূপ ধারণ করতে পারে, বিশেষত তা যখন রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের প্রশ্নের সাথে জড়িত থাকে, তারই কিছু চিত্র জর্জ ম্যাথু এবং

রমেশ নায়েক তুলে ধরেছেন তাদের গবেষণা ভিত্তিক প্রবন্ধে,[১] ৪টি উদাহরণের মাধ্যমে। সেগুলিই এখানে অতি সংক্ষেপে দেওয়া হচ্ছে।

মধ্যপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলে রাইগড় জেলার সায়নাগড় তহশিল (ব্লক) এর সালহেওনা গ্রামে মোট ১ হাজার একর জমির মধ্যে ৫৪০ একর জমির মালিক ছিলেন অপেক্ষাকৃত উচ্চবর্ণের আঘারিয়াগণ। এদের মধ্যে আবার ৩০০ একর জমির মালিকানা ভোগ করতেন মাত্র ৩টি পরিবার। বিপরীতে ২৯২ টি তপশিলী উপজাতি পরিবারের মোট জমির পরিমাণ ছিল ১০০ একর। আর মাত্র ২০ একর জমির মালিকানা ছিল ২৭৮ টি তপশিলী জাতি পরিবারের। সুতরাং ৫৭০টি তপশিলী জাতি/উপজাতি পরিবারের দরিদ্র মানুষেরা অধিকাংশই ছিলেন কৃষি শ্রমিক। এসব ছাড়া আরও ছিলেন বহিরাগত (Immigrant) আগরওয়ালা ও তেলি জাতির মানুষ। এদের প্রধান জীবিকা ছিল ধান চালের ব্যবসা ও মহাজনি কারবার। গ্রামের তপশিলী জাতি/উপজাতির মানুষরা ছিলেন আঘারিয়া ও আগরওয়ালাদের শাসন শোষণের অন্যতম শিকার। ১৯৯৪ সালের নির্বাচনে সালহেওনা গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৪ জন নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে ৫ জন ছিলেন নারী। এদের মধ্যে ১ জন ছাড়া বাকি সকলেই তপশিলী উপজাতি (আদিবাসী) পরিবারভুক্ত ছিলেন।

১৯৯৪ সালের নির্বাচনে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান-এর আসনটি সংরক্ষিত ছিল আদিবাসী নারীর জন্য। কিন্তু কুখ্যাত বহিরাগত এবং মদ্যপ মহেশ আগরওয়াল তার দ্বিতীয় পত্নী বৃন্দা বাইকে এই আসনের প্রার্থী হিসেবে (কংগ্রেস) দাঁড় করান। কিন্তু আদিবাসী প্রার্থী দ্রৌপদী বাই (ভারতীয় জনতা দল) অনেক ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেন। পরে পঞ্চায়েতের একটি মিটিং-এ পরাজিত বৃন্দা বাই-এর গুণ্ডা এবং মদ্যপ স্বামী (বহিরাগত) মহেশ তার সহযোগীদের নিয়ে দ্রৌপদী বাই-এর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনে তাকে পদত্যাগ করতে বলেন। দ্রৌপদী স্বীকৃত হন না। ফলে বিপক্ষ প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। একদিন সদস্যরা প্রায় সবাই মিটিং থেকে চলে যাওয়ার পর মহেশ দ্রৌপদীর শাড়ির আঁচল ধরে টানেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেখানে গড়ে উঠে রাজনৈতিক দলাদলির রমরমা। ভারতীয় জনতা দল মহাভারতের দুঃশাসন ও দুর্যোধন কর্তৃক দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার সাথে সালহেওনা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান-এর লাঞ্ছনাকে তুলনা করে এই ঘটনাকে পরবর্তী নির্বাচনের একটি বিষয় করে তোলে।[২] এভাবেই কোন কোন রাজ্যে উচ্চ ও নিম্নবর্গের দ্বন্দ্ব এবং রাজনৈতিক দলাদলি স্থানীয় স্ব-শাসন ব্যবস্থাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

এর থেকে আরও অনেক বেশি লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে খাণ্ডোয়া জেলার গুজারখেড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কুসুম বাইকে। তবে এ কোন উচ্চবর্গের দ্বারা নিম্নবর্গের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী নয়। এ ছিল নিম্নবর্গের মধ্যেই রাজনৈতিক প্রতিহিংসার একটি রূপ। গুজারখেড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন ২৪৯ টি পরিবারের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ (৫৪.৬১ শতাংশ) ছিলেন অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষ। তারপরের স্থান ছিল তপশিলী উপজাতি (২৫.৭০ শতাংশ), তপশিলী জাতি (১৪.৮৫ শতাংশ) এবং অন্যান্য বর্ণের (৪.৮১ শতাংশ) মানুষের। জমির মালিকানায় ছিল আশমান জমিন পার্থক্য। ১টি রাজপুত পরিবার ছিলেন ৩৫০ একর জমির মালিক। আর ৮৬টি অন্যান্য অনগ্রসর পরিবারের মধ্যে ১০-১৫টি পরিবার ছিলেন ৪০-৫০ একর জমির মালিক। বিপরীতে তপশিলী জাতি/উপজাতির মোট ৬৭টি পরিবারের মধ্যে ৪৯টি পরিবার ছিলেন ভূমিহীন।[৩] এ রকমের একটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৯৯৪ সালের নির্বাচনে ৪জন অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর মহিলা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান-এর পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এদের মধ্যে কুষুম বাই জয়ী হলে অপর ১জন প্রতিদ্বন্দ্বী রাধা বাই-এর স্বামী জগদীশ সাড নানা অজুহাতে কুষুম ও তার স্বামী ঘনশ্যাম-এর কাছে বহু টাকা দাবি করেন। টাকা না পেয়ে জগদীশ একদিন তার সহযোগীদের নিয়ে সুযোগ বুঝে ঘনশ্যামকে হত্যা করার ভয় দেখায় এবং কুষুমকে ধর্ষণ করে। কুষুম বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেও প্রাণে বেঁচে যায়। নারীকে কেন্দ্র করে পুরুষের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নারীকে যে কোন বিপর্যয়ের মুখে নিয়ে যেতে পারে এ হল তারই জ্বলন্ত উদাহরণ।

শুধু মহিলা প্রধানরাই নন, জাতিবর্ণ বিদ্বেষের ফলে পঞ্চায়েত প্রধান-এর পদে নির্বাচিত নিম্নবর্গের পুরুষরাও উচ্চবর্গের পুরুষের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন। মধ্যপ্রদেশেরে ছাতারপুর জেলার নিম্নবর্গ অধ্যুষিত কার্কিতে ৭৩টি পরিবারের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ (৪৫টি) ছিলেন অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর পরিবারগুলি। এদের মধ্যে আবার সংখ্যাধিক্য (৩০) ছিল যাদবদের। তারপর ছিল তপশিলী জাতিভুক্ত (২৬টি) চামার পরিবার। উচ্চবর্ণের পরিবার ছিল মাত্র ২টি, ১টি ব্রাহ্মণ এবং অপরটি ঠাকুর (রাজপুত) পরিবার। অন্যান্যদের মধ্যে ছিল ১টি করে পাল, লোহার (কর্মকার), নামদিও (দর্জি) কুম্ভার (কুমোর) বাধনি (ছুতোর) এবং ধিমার (জেলে) পরিবার। স্বাভাবিকভাবেই গ্রামের অধিকাংশ জমির মালিকানা ছিল যাদবদের। আশারাম যাদব (যিনি ৬০ একর জমির মালিক ছিলেন), স্থানীয় আইনসভার সদস্য উমা

যাদবের সমর্থন নিয়ে কার্কি গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু চামারদের সমর্থন না পাওয়ায় তিনি পরাজিত হন। চামারদের সমর্থনের ফলে প্রতিবেশি ছোট একটি গ্রামের বাসিন্দা নোনেজু ঠাকুর এই পদে বিজয়ী হলে কার্কি গ্রামের যাদব, ব্রাহ্মণ ও ঠাকুর ইত্যাদি নেতৃস্থানীয়রা অপমানিত বোধ করেন। এরপর উপ-প্রধানের আসনটিকে কেন্দ্র করে জাতি বিদ্বেষ চরম আকার ধারণ করে। গ্রামের পূর্বতন মুখিয়া ললিত প্রসাদ যাদব মাতন যাদব নামে এক ব্যক্তিকে উপ-প্রধানের আসনে প্রার্থী করেন। অপরদিকে নোনেজু ঠাকুর, যিনি জানতেন যে ললিত প্রসাদ তার বিরোধিতা করেছিলেন, সারমান আহিরবার নামে মধ্যবয়স্ক এক চামার জাতীয় ব্যক্তিকে প্রার্থী রূপে দাঁড় করান। সারমান আহিরবারই নির্বাচনে জয়লাভ করেন। ফলে গ্রামের ব্রাহ্মণ ও যাদব যুবকরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। মাতিন যাদবের পুত্র দয়ারাম যাদব তার ৪ জন সঙ্গীকে নিয়ে (যাদের মধ্যে ললিত প্রসাদের এক ভ্রাতাও ছিলেন) সারমানের উপর অমানুষিক অত্যাচার করেন, তার মাথায় ঝোলা গুড় ঢেলে দিয়ে এক ঘন্টা গ্রামের রাস্তা দিয়ে তাকে হাঁটান। চূড়ান্ত অপমানের পর সারমান পদত্যাগ করেন। এই উদাহরণ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে একজন নিম্নবর্গের উপ-প্রধানের পক্ষে উচ্চবর্গের প্রধানের সাথে একযোগে কাজ করা প্রায় দুঃসাধ্য। এরা ২ জনই পুরুষ হলেও। গ্রামীণ রাজনীতিতে নারী পুরুষ নির্বিশেষে নিম্নবর্গের মানুষের অসহায়তার চিত্রই এখানে পরিস্ফুট। জর্জ ম্যাথু এবং রমেশ নায়েক তাদের সমীক্ষার পর যথার্থই লিখেছেন ঃ "In spite of transfer of power to gram panchayats and reservation of seats for women and backward castes in local bodies, the traditional upper caste hold is still strong. The dominant castes act as parallel decision-making organizations in all matters of the village....national political parties use the caste card to control voters at the grassroots level. The practice of upper castes (Brahmins/Thakurs) influencing the choice of candidates for panchayat elections and voting patterns in favour of their candidates is still prevalent...Any change in the status quo is resisted, sometimes violently. Reservation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and women is accepted in form but seldom in practice."[৪]

রাজস্থান

রাজস্থানে নতুন পঞ্চায়েতি আইন ১৯৯৪ সালের ২৩ এপ্রিল প্রণীত হলেও নানা কারণে, প্রধানত রাজনৈতিক পালা বদলের (কংগ্রেস ও বিজেপি) কারণে, বেশ কয়েকবার নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হয়েও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৫ সালের ১৯ শে জানুয়ারী থেকে ৬ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তিনটি স্তরের প্রত্যেকটিতেই মোট আসনের এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য (তপশিলী জাতি/উপজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণীর নারী সমেত) সংরক্ষিত রাখা হয়। তাছাড়া, ৭৩ তম সংশোধনি আইনকে অনুসরণ করে তপশিলী জাতি/উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য তাদের নিজ নিজ জনসংখ্যার অনুপাতে সংরক্ষণের নীতি গৃহীত হয়।

অনেকেরই জানা যে বিভিন্ন রাজ্যে গ্রামস্তরে জাতিবর্ণের ভিত্তিতে কিছু 'কাস্ট পঞ্চায়েত' অনেক আগেই গড়ে উঠেছিল। এই 'কাস্ট পঞ্চায়েত'গুলি প্রধানত পুরুষানুক্রমিক বৃত্তি, জাতিগত ঐতিহ্য ও রাজনীতি রক্ষার জন্য কাজ করে। অনেক সময় বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ এবং জাতিগত বিবাদ বিষম্বাদ মিটিয়ে ফেলার ব্যাপারেও অগ্রণী হয়। গ্রামীণ জীবনের জাতপাতের দ্বন্দ্বও 'কাস্ট পঞ্চায়েতে' প্রতিফলিত হয়। উদাহরণ রূপে বলা যায় যে রাজস্থানে একটি গ্রামের সব থেকে প্রভাবশালী ও দুর্বৃত্তরূপে পরিচিত এবং জাতিতে '*জাঠ*' এক ব্যক্তির স্ত্রী 'কাস্ট পঞ্চায়েত'এর প্রার্থী হন। কিন্তু গ্রামের হরিজনেরা প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে একজন হরিজন মহিলাকে দাঁড় করান। এই হরিজন মহিলার জয় অনিবার্য বুঝে সেই '*জাঠ*' ব্যক্তি নিজের মাথার পাগড়ি হরিজনের পায়ের কাছে নামিয়ে দেন। হরিজনেরা তখন '*জাঠ*'কে উপেক্ষা করতে না পেরে নিজেদের মহিলা প্রার্থীকে সরিয়ে নেন।[৫] ফলে হরিজনের কাছে মাথা নোওয়াতে হলেও দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতিই সেখানে সফল হয়। আসলে 'কাস্ট পঞ্চায়েত' তুলে দিয়ে নিম্নবর্গের মানুষদের যথাসম্ভব বেশি করে সাধারণ পঞ্চায়েতে স্থান দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। 'কাস্ট পঞ্চায়েত'-এর মাধ্যমে জাতিবর্ণ বৈষম্য শিথিল না হয়ে আরও কঠিন ও দৃঢ় হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। জাতিবর্ণের ভিত্তিতে পঞ্চায়েত কখনই কাম্য হতে পারে না। ৭৩তম সংবিধান সংশোধনিতে 'কাস্ট পঞ্চায়েত' গঠন করা বাধ্যতামূলক নয়, আবার নিষিদ্ধও নয়। উল্লেখ্য যে এখনও কোন কোন রাজ্যে 'কাস্ট পঞ্চায়েত' আছে।

রাজস্থানের পঞ্চায়েতের কাজকর্ম সম্পর্কে, বিশেষত নারীদের বিষয়ে তথ্য বিশেষ সুলভ নয়। তবে উল্লেখ্য যে রাজস্থানই হল প্রধান রাজ্য যেখানে এই আইন প্রণীত হয় যে ২টির বেশি সন্তান থাকলে কোন ব্যক্তি পঞ্চায়েতে নির্বাচিত হতে পারবেন না। পরে হরিয়ানা এবং অন্ধ্রপ্রদেশেও এই নিয়ম প্রচলিত হয়েছে।[৬] পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যম রূপে এই নিয়মটির গুরুত্ব থাকলেও পরোক্ষভাবে এই নিয়মটি কিন্তু নারীর বিরুদ্ধেই যাচ্ছে। রাজস্থানের মতো অনুন্নত রাজ্যে, যেখানে বয়স্ক মহিলারা এখনও সনাতন ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক, সাধারণত অল্প বয়সী মহিলারাই (যারা সন্তান ধারণে সক্ষম) নির্বাচনে দাঁড়ান। তাদেরও অবশ্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে প্ররোচিত করেন কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য অথবা সমর্থক স্বামী। কিন্তু ২টি সন্তানের নিয়ম প্রচলিত থাকার ফলে অনেক মহিলাকে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে হচ্ছে এবং তারা গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অনেক সময় আবার তাদের গর্ভের ভ্রূণকে হত্যা করা হচ্ছে।[৭] আলওয়ার জেলায় এ রকমও দেখা গেছে যে তৃতীয় সন্তানটি জন্মাবার পর শুধুমাত্র পঞ্চায়েতের সদস্য থাকার জন্যই বহু পুরুষ বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাচ্ছেন।[৮] এ কি শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতার লোভ? অথবা অর্থকরী বা অন্য কোন লোভ যা মানুষকে এত অমানুষে পরিণত করে?

একটি রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাজস্থানে যে নির্বাচন হয়, তাতে নিয়মানুযায়ী এক-তৃতীয়াংশ আসনে মহিলারা নির্বাচিত হয়ে আসেন, আর ৯১৭৮ টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৩০৫৬ জন মহিলা সরপঞ্চ নির্বাচিত হন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই মহিলা সরপঞ্চদের পতিদেবতারাই পঞ্চায়েতের কাজকর্ম পরিচালনা করেন। এমনকী এ রকম উদাহরণও আছে যেখানে গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধানরূপে দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার সময় প্রতিজ্ঞাপত্রও পাঠ করেছেন 'সরপঞ্চপতি', আর স্ত্রী মুখে ঘোমটা টেনে পাশের চেয়ারটি অলংকৃত করেছেন।[৯] জয়সলমির জেলার খেতলাই গ্রামের কংগ্রেস সদস্য নাথুরাম বিসনই-এর স্ত্রী গ্রাম পঞ্চায়েতের সরপঞ্চ নির্বাচিত হওয়ার পর (নাথুরাম স্ত্রীর জন্য নির্বাচনে প্রচারকার্যও চালিয়েছেন) নাথুরামই স্ত্রীর পক্ষে পঞ্চায়েতের কাজ পরিচালনা করেছেন। গ্রামবাসীদের অভাব অভিযোগ, দাবি দাওয়া নিয়ে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে যাতায়াতও করেছেন। আর গ্রামবাসীরাও সহজেই এসব মেনে নিয়েছেন। কোন বিরোধিতা হয়নি। সব থেকে তৃপ্ত আছেন সরপঞ্চ মুলি দেবী নিজে। কারণ তার মতে স্বামী আর তিনি অভিন্ন নন। তিনি নিজে কাজ করাও যা, 'সরপঞ্চপতি' কাজ করাও তাই।[১০] হাজার হাজার

বছর ধরে ভারতীয় নারীদের শিক্ষাদীক্ষা বন্ধ করে অল্প বয়স থেকেই স্বামীর সাথে অভিন্ন হৃদয় হওয়ার যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, দেশের রাজনীতিতেও আজ তারই বাস্তব প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। বহু শত বছরের অন্ধকারে নিমজ্জিত কূপমণ্ডুকের পক্ষে হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে এ রকম হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়।

শুধু গ্রাম পঞ্চায়েতেই নয়, জেলা পরিষদের মহিলা সদস্যাদেরও প্রায় একই অবস্থা। তবে এসব সত্ত্বেও রাজস্থানের মতো অনুন্নত রাজ্যের পঞ্চায়েতের মহিলারাও ধীরে ধীরে তাদের মতামত ব্যক্ত করতে শিখছেন। ১৯৯৬ সালের শেষভাগে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত একটি কনফারেন্স-এ দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা মহিলা প্রতিনিধিদের মধ্যে জয়পুরের প্রতিনিধিও ছিলেন। শুধু তাই নয়, সেই কনফারেন্স-এ জয়পুরের একটি জেলা পরিষদের সদস্যা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, "Most women leaders in the panchayats and Zilla Parishads are voiceless. They are there because their men wanted them to contest in the wake of the reservation policy for women. It is the men who attend the meetings."[১১] অনুমান করা যায়, এ কথাগুলি প্রতিবাদ রূপেই বলা হয়েছিল। আসলে পঞ্চায়েত সদস্যাদের মধ্যে অনেকেই এখন মিটিং-এ সরব হতে এবং কাজকর্ম পরিচালনা করতে আগ্রহী। কিন্তু পুরুষরা কিছুতেই তাদের ক্ষমতার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। আর এরই ফলে রাজস্থানে ১৯৮৪ সালে নারীদের উন্নতির জন্য একটি বিশেষ পরিকল্পনা (উইমেনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম) গৃহীত হলেও এ রাজ্যের পঞ্চায়েতের মহিলা সদস্য ও কর্মীরা এখনও নিগ্রহের হাত থেকে মুক্তি পান নি। ১৯৯৯ সালে গ্রামস্তরের একজন মহিলা পঞ্চায়েত কর্মীর (সাটিন) শারীরিক নির্যাতনের ঘটনাই তা প্রমাণ করে।[১২]

আশার কথা এই যে রাজস্থানেও কিছু পঞ্চায়েত সদস্যা ক্রমশ প্রতিবাদ করতে শিখেছেন। জয়পুরের নাওলা গ্রামের শকুন্তলা বাই এ রকম একটি প্রতিবাদী চরিত্র। ১৪ বছর বয়সে বিবাহিতা শকুন্তলা স্বামীর সমর্থন থাকা সত্ত্বেও শ্বশুর বাড়িতে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারেন নি। কিন্তু পরবর্তী জীবনে পঞ্চায়েতের সাথে যুক্ত থেকেছেন এবং দীর্ঘদিন নারীদের উন্নতির কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। আর ২০০০ সালে ১১ই সেপ্টেম্বর তিনি নিউইয়র্ক যান হাঙ্গার প্রজেক্ট কর্তৃক আয়োজিত ২দিনের এক কনফারেন্স-এ পঞ্চায়েতি রাজ-এ নারীর ভূমিকা সম্বন্ধে তার বক্তব্য উপস্থাপিত করতে।[১৩] অনেক সীমাবদ্ধতার মাঝেও পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরেই

মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ তাদের আত্মবিকাশের সোপান হয়ে দেখা দিচ্ছে। ইতিমধ্যেই কিছু অতি সাধারণ নারী তাদের একাগ্রতা ও নিষ্ঠা দিয়ে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামস্তরে অসাধ্য সাধন করেছেন।

উত্তরপ্রদেশ

৭৩ তম সংবিধান সংশোধনির আগে উত্তর প্রদেশে ১৯৮৮ সালে ৭৩,৯১৪টি গাঁওসভাতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যেসব রাজ্যে সরকারি পঞ্চায়েতি রাজ-এর বাইরে 'ন্যায় পঞ্চায়েত' গঠিত হয়েছে, উত্তর প্রদেশ তাদের মধ্যে একটি। 'ন্যায় পঞ্চায়েত'-এর মূখ্য উদ্দেশ্য গ্রামের বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করা। ২২ বছর পরে ১৯৮৮ সালে এই রাজ্যে ৮৩১৩ টি 'ন্যায় পঞ্চায়েত'-এ যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে পঞ্চায়েতের ত্রি-স্তরে (গাঁওসভা, ক্ষেত্র সমিতি এবং পঞ্চায়েত পরিষদ) মহিলা কিংবা তপশিলী জাতি/উপজাতির জন্য কোন সংরক্ষণ ছিল না। গাঁওসভাতে নির্বাচনের মাধ্যমে কোন মহিলা প্রতিনিধিত্ব করতে ব্যর্থ হলে একজন মহিলাকে কো-অপ্ট করে নেওয়া হতো। আর ক্ষেত্র সমিতি ও জেলা পরিষদ-এ মহিলা ও তপশিলী জাতির জনসংখ্যার অনুপাতে কো-অপ্ট করা হতো।

সংবিধান সংশোধনির পর অনেক রাজনৈতিক টানাপোড়েনের পরে ১৯৯৫ সালের ৭-১৪ এপ্রিল যে নির্বাচন হয়, তাতে পঞ্চায়েতের প্রত্যেক স্তরে (ক্ষেত্র সমিতির নূতন নামকরণ করা হয়েছে পঞ্চায়েত সমিতি) মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ করা হয়। কিন্তু বিধিভঙ্গ করে তপশিলী জাতি ও উপজাতির জন্য যথাক্রমে ২ শতাংশ এবং ২১ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকে। আর অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেনীর জন্য সংরক্ষিত রাখা হয় ২৭ শতাংশ আসন। এই রাজ্যে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেনীর জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণকে ভোটবাক্সের রাজনীতি বলেই গণ্য করা যেতে পারে। ১৯৯৫ সালের নির্বাচনে সংরক্ষণের মাধ্যমে পঞ্চায়েতে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলেও নারীরা এ রাজ্যেও পঞ্চায়েতে প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করেন নি। স্বামী অথবা অন্য কোন পুরুষ আত্মীয় তাদের পরিবর্ত রূপে কাজ করেছেন। অনেক সময় মহিলা সদস্যদের পরিবর্তে তাদের স্বামীরাই মিটিং-এ উপস্থিত থাকেন। অভিযোগ আছে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নির্বাচিত মহিলা প্রধানদের কাজকর্মও স্বামীরাই করেন। এমনকী গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রেও স্বামী অথবা কোন নিকট পুরুষ আত্মীয়ই সই করেন।[১৪]

সংবিধান সংশোধনের পর এ রাজ্যে দ্বিতীয়বার ২০০০ সালের ১৪ই জুন—৬ই আগষ্ট পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই নির্বাচনের একটি বিশেষত্ব ছিল মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রাচুর্য। আর এই প্রাচুর্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় ছিল প্রতিটি স্তরের সর্বোচ্চ আসনটির জন্য, বিশেষত জেলা পরিষদ-এর সভাধিপতির আসনটির জন্য। পঞ্চায়েতের প্রত্যেক স্তরেই প্রধানের আসনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হলেও ত্রি-স্তর ব্যবস্থায় জেলা পরিষদ-এর সভাধিপতির আসনটি হল স্ব-শাসন ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ মর্যাদা ও ক্ষমতার প্রতীক। এই আসনের অধিকারী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হলে স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় অনেকখানি কর্তৃত্ব করতে সক্ষম হন। আর ২০০০ সালের নির্বাচনে ১৮টি জেলা পরিষদ-এর সভাধিপতির আসনের ৫০ শতাংশ অধিকার করেছেন মহিলারা।[১৫] স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কিভাবে এটা সম্ভব হল?

এ রাজ্যের রাজনীতির দলগত দ্বন্দ্বে সমাজবাদী পার্টি (এস. পি), বহুজন সমাজ পার্টি (বি. এস. পি) এবং ভারতীয় জনতা পার্টির (বি জে পি) মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে এস পি এবং বি এস পি প্রার্থীরাই পঞ্চায়েতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছেন।[১৬] উল্লেখ্য, এখানে নির্বাচন দলীয় ভিত্তিতে না হলেও সদস্যারা প্রায় সকলেই দলীয় সমর্থনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, আর কোন দলই পঞ্চায়েতের কোন স্তরেই, বিশেষত জেলা পরিষদের এই স্তরে, সর্বোচ্চ আসনটি হারাতে চাননি। অন্যভাবে বলা যায় যে তিনটি রাজনৈতিক দলই জেলা পরিষদ-এর সভাধিপতির আসনটি অধিকার করে স্থানীয় স্ব-শাসন ব্যবস্থায় নিজ নিজ দলের ক্ষমতা ও কতৃত্ব বিস্তার করতে উদ্যোগী হয়েছেন। আর এই রাজনৈতিক খেলার পুতুল হিসেবে ব্যবহার করেছেন ঘনিষ্ঠ মহিলা আত্মীয়াদের। ২০০০ সালের নির্বাচনে যে ৫০ শতাংশ মহিলা জেলা পরিষদ-এ সভাধিপতির আসন অলংকৃত করেছেন, তাদের অধিকাংশই হলেন বিভিন্ন দপ্তরের নানাবিধ মন্ত্রী অথবা লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভার সদস্যদের স্ত্রী/কন্যা/মা/বোন, অথবা কোন রাজনৈতিক নেতার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নির্বাচনি প্রচারের সময়ও মহিলা প্রার্থীর পরিবর্তে তার পুরুষ আত্মীয়ের পরিচয়ই তুলে ধরা হয়েছে।[১৭] পঞ্চায়েতের উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি হারানোর ভয়ে নিকট আত্মীয়াদের বেছে নিয়েছেন নিজেদের 'প্রক্সি' রূপে। মহিলা প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দলীয় প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় রাখা এবং সম্ভব হলে আরও শক্তিশালী করাই ছিল মূল লক্ষ্য। আর তাই এই নির্বাচনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল বিপুল অর্থের বিনিময়ে প্রধান-এর আসনটি কেনাবেচা এবং দুর্বৃত্তায়ন।[১৮]

এই পরিস্থিতিতে পঞ্চায়েতের মহিলা সদস্যরা, এমনকী পঞ্চায়েত সমিতির মহিলা সভাধিপতিরাও ক্ষমতা অধিকার করলেও প্রকৃত ক্ষমতালাভ থেকে যে বঞ্চিত থাকবেন, তাতে আর সন্দেহ কি?

ওড়িশা

দীর্ঘ ১৩ বছর পরে মুখ্যমন্ত্রী বিজু পট্টনায়কের উদ্যোগে ১৯৯২ সালের মে-জুন মাসে ওড়িশায় পঞ্চায়েতের নির্বাচন হয়। ১৯৯২ সালের আইনের একটি বিশেষ বিধান বলে এই রাজ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, এই ২টি আসনের কোন একটিতে কোন পুরুষ নির্বাচিত হলে অপর আসনটি মহিলার জন্য নির্দিষ্ট রাখা হয়। এভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে প্রধান, উপ-প্রধান এবং পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে সভাপতি ও সহকারি সভাপতির মধ্যে একটি আসন মহিলার জন্য নির্দিষ্ট রাখার উদার নীতি অন্য কোন রাজ্যে নেই।

১৩ বছর পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও এখানে এই নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীর কোন অভাব হয় নি। সংরক্ষিত আসনে একাধিক মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ছাড়াও কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণ আসনে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে নারীরা নির্বাচন প্রার্থী হয়েছেন।[১৯] সুতরাং মহিলাদের রাজনীতিতে অনীহা আছে, এ অভিযোগটি ওড়িশার ক্ষেত্রে অন্তত প্রমাণিত হয় নি। ১৯৯২ সালের নির্বাচনে এ রাজ্যে ২৫ হাজার মহিলা গ্রাম পঞ্চায়েতে এবং ৩১৪ জন মহিলা পঞ্চায়েত সমিতিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তবে কিছু প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করেই মহিলাদের পঞ্চায়েতে প্রবেশ করতে হয়েছিল।

ওড়িশায় মহিলাদের পঞ্চায়েতে প্রবেশের পথে প্রধান অন্তরায় রূপে দেখা দিয়েছিল স্থানীয় বিধানসভার বিধায়কদের বিরোধিতা। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, যেসব কারণে এ রাজ্যে দীর্ঘদিন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি, তার মধ্যে অন্যতম ছিল রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে স্থানীয় স্ব-শাসনের স্তরে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে অনীহা। স্থানীয় বিধায়কদের বাধাদানের ফলেই বার বার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কর্মসূচী গৃহীত হয়েও পিছিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী বিজু পট্টনায়েকের হস্তক্ষেপে এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১৯৯২ সালে নির্বাচন হয়। কিন্তু ইনস্টিটিউট অফ স্যোশাল সাইন্সেস-এর অধিকর্তা জর্জ ম্যাথুর মত অনুযায়ী নির্বাচনের আগেই বোঝা গিয়েছিল যে "The main problem will come from the MLAs themselves who

will be unhappy to share some of their powers and spheres of influence with the leadership of lower levels. Even the ruling party MLAs have reservations about giving so much power to panchayats. And if a sizeable number of functionaries in these panchayats are women, then their resentment can be well imagined."[২০] আসলে বিকেন্দ্রিকৃত স্থানীয় শাসনের নীতি অনেক রাজ্য সরকারই মেনে নিতে চাননি। ক্ষমতার মোহই মানুষকে ক্ষমতা ধরে রাখতে প্রেরণা যোগায়। ওড়িশায় ১৯৯২ সালের নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হয়েছিল "much against the wishes of the MLAs, including those of his own [Chief Minister's] party.[২১]

অন্যান্য রাজ্যের মতো এখানেও নির্বাচিত নারী সদস্যরা অধিকাংশই ছিলেন রাজনৈতিক দলের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত কোন পুরুষের স্ত্রী, বোন, মা অথবা বিধবা। প্রাথমিক পর্যায়ে এখানে নারীরা পঞ্চায়েতের মিটিং-এ উপস্থিত থাকতেন না। অনেকক্ষেত্রেই 'প্রক্সি' রূপে উপস্থিত থাকতেন স্বামী। তথাপি একথাও সত্য যে এরই মধ্যে কিছু নারী ছিলেন রাজনীতিতে সচেতন এবং এদের আত্মসম্মান বোধ ছিল তীক্ষ্ণ। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে সচেতন এবং যোগ্য নারীরাও যে উপযুক্ত সম্মান পেতেন না তারও প্রমাণ আছে।[২২] তথাপি উল্লেখ্য যে নির্বাচনের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কিছু নারী পঞ্চায়েতের ভবিষ্যত এবং নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে জনসমক্ষে মত প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বিজু পট্টনায়েকের জন্মদিন উপলক্ষ্যে কলিঙ্গ স্টেডিয়ামের সমাবেশে উপস্থিত মহিলারা প্রায় একযোগে বলেছেন, "We are elected. That is good. But we are not able to implement anything. That is bad."[২৩] সমাবেশে উপস্থিত একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলেছেন, "The bureaucracy is not responsive...we women are behind you. But the bureaucracy will kill your dream." অন্য একজন মহিলাও অভিযোগ করে বলেছেন, "The Block Development Officers are not listening to the women representatives."[২৪] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন স্তরে অনেকেই মহিলাদের বিরোধিতা করছেন। এ থেকে এ সত্যই প্রকাশিত হয় যে আইনি অধিকার ও কাগুজে শর্ত নারীকে প্রকৃত ক্ষমতা দিতে পারে না। এজন্য প্রয়োজন পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন এবং সেই সঙ্গে নারীর শিক্ষা ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতা

অর্জনের জন্যও এক সময় শুরু করার প্রয়োজন হয়। পঞ্চায়েতের সংরক্ষণ নারীকে সে সুযোগই এনে দিয়েছে।

হরিয়ানা

হরিয়ানা রাজ্যে ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালে যথাক্রমে গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচন হয়। পরে নতুন সংশোধনি আইন অনুযায়ী ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে তপশিলী জাতি/উপজাতি সহ সব মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত থাকলেও অনগ্রসর শ্রেণীর জন্য মাত্র ১টি আসন সংরক্ষিত হয়। কিন্তু দেখা গেছে যে অশিক্ষা এবং পর্দা প্রথা নারীদের পঞ্চায়েতে প্রবেশের পথে প্রধান অন্তরায় হয়েছে। এ রাজ্যেও নির্বাচনে অধিকাংশ নারী প্রার্থীই ছিলেন রাজনীতির সাথে যুক্ত কোন না কোন পুরুষের আত্মীয়। মহিলাদের নির্বাচনের জন্য পুরুষ আত্মীয়রাই প্রচারকার্য করেছেন। শুধু তাই নয়, নির্বাচিত মহিলারা পঞ্চায়েতের কাজে কোন সরকারি অফিসে অথবা অন্যত্র যাওয়ার সময় পুরুষ আত্মীয়দের সাথে যাবেন ধরে নিয়েই কার্যত ভোট দানও হয়েছে এই পুরুষদের জন্যই। এমনও দেখা গেছে মহিলা ভোটাররা মহিলা প্রার্থীদের নামও জানেন না। তবে পুরুষরা যে মহিলাদের নির্বাচনের ব্যাপারে এতখানি উৎসাহ ও উদ্যোগ নিয়েছেন, তা বহুলাংশে নিজেদেরই স্বার্থে। শ্রীমতী সুশীলা কৌশিক-এর ভাষায়, "The male politicians were putting up their women essentially to keep the seat secure for them (selves), as in the next elections, that constituency could fall in the unreserved category."[২৫] নারীরাও অভিযোগ করেছেন যে তাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন হয় না। আগেই প্রার্থীদের মনোনয়ন হয়ে যায়, অন্যেরা দাঁড়াবার সুযোগ পান না, নির্বাচন কার্যত একটি প্রহসন মাত্র। মহিলাদের এই অভিযোগ তাদের কিছুটা রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচায়ক নয় কি? একটি সমীক্ষা অনুসারে হরিয়ানার ৪টি জেলার ১০০ জন মহিলার মধ্যে অধিকাংশই নিজেদের চাষের জমিতে কাজ করতেন, আবার অনেকে ছিলেন চাষি শ্রমিক। তবে কোন ক্ষেত্রেই মহিলাদের পঞ্চায়েতে আসার ব্যাপারে পরিবারের পুরুষদের কাছ থেকে কোন বাধা আসেনি, অথবা গৃহকাজের কোন ক্ষতি হচ্ছে বলেও তারা অভিযোগ করেননি। বরং সময় সাশ্রয়ের জন্য স্বামী পুত্ররা অনেক

সময় গৃহকাজে মহিলাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন। আরও একটি শুভ লক্ষণ হল যে গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচনের সময় অধিকাংশ মহিলাই নিরক্ষর অথবা নাম সই করার মতো শিক্ষা নিয়ে এলেও ২ বছরের মধ্যে তারা অফিস চালাবার মতো দক্ষতা অর্জন করেছেন। কেউ কেউ নথিপত্র পড়তেও শিখে গেছেন। আর অনেক মহিলা সদস্য গ্রামীণ রাজনীতি সম্পর্কে আগে বিশেষ অবহিত না থাকলেও ২ বছরের মধ্যে কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য হয়েছেন।[২৬] প্রসঙ্গত উলেখ্য যে এ রাজ্যে কর্ণাল জেলার নিসাং ব্লকের অন্তর্গত প্রেম খেরিয়া গ্রামে একটি 'মহিলা পঞ্চায়েত' গঠিত হয়েছে। মহিলা পঞ্চায়েতের নির্বাচনে কোন পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না।

উল্লেখ্য যে হরিয়ানার অনগ্রসর শ্রেণীর পঞ্চায়েত সদস্যারাও কিছু কিছু উন্নয়নমূলক কাজের সাক্ষর রেখেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে রেওয়ারি জেলায় ২৬ বছর বয়স্ক পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান কৈলাশ বাই যাদব ট্রাক ডাইভার ইউনিয়ন কর্তৃক বেআইনিভাবে দখল করা অনেক জমি গ্রামবাসীদের জন্য উদ্ধার করেছেন। আর ঐ জেলারই ছোটি বেরিলি গ্রামের রমা দেবী যাদব তার পরিবারের অমতে নির্বাচনে দাঁড়িয়ে মহিলাদের সমর্থনে জয়লাভ করেছেন। মহিলাদের আস্থা ছিল যে রমা দেবী গ্রামের দুর্নীতি দূর করতে সাহায্য করবেন। রমা দেবী তাদের আশাহত করেননি। তারই নেতৃত্বে সরকারি ঘোষণার আগেই গ্রামের সব মদের দোকানের উচ্ছেদ হয়েছে।[২৭] আর এসবের ফলে পঞ্চায়েত সদস্যাদের পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবারের পুরুষরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে, যেমন পুত্র কন্যার শিক্ষা, বিবাহ, সম্পত্তি বেচা-কেনা প্রভৃতি বিষয়ে মহিলাদের মতামতের গুরুত্ব দিচ্ছেন। গ্রামের মানুষের কাছেও এই মহিলারা এখন মর্যাদা পাচ্ছেন। গ্রামে বিবাহ উপলক্ষ্যে মহিলারাই আগে নিমন্ত্রণ পাচ্ছেন, পুরুষেরা পাচ্ছেন পরে।[২৮] এ রকমই আজ ঘটে চলেছে গ্রামীণ স্ব-শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে।

বিহার

বিহারে ১৯৭৮ সালে মুখ্যমন্ত্রী কর্পুরী ঠাকুরের কার্যকালে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর আবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে। মাঝখানে দীর্ঘ ২৩ বছরের ব্যবধান। এই ২৩ বছরে বিহারে কোন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।

৭৩ তম সংবিধান সংশোধনির পর ১৯৯৩ সালের ৬ই আগষ্ট বিহারে নতুন পঞ্চায়েতি রাজ বিল পাশ হয়। এই আইনে সংবিধান সংশোধনির সাথে সামঞ্জস্য রেখে অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত (তপশিলী জাতি/উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর নারী সহ) রাখা হয়। তপশিলী এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষের নিজ নিজ জনসংখ্যার অনুপাতে আসন সংরক্ষণের নিয়মও গৃহীত হয়। আর নারী, তপশিলী জাতি/ উপজাতি এবং অনগ্রসর শ্রেণীর নিজ নিজ আসনের এক-তৃতীয়াংশ পঞ্চায়েত প্রধানের আসন প্রত্যেক গোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত হয়।

উল্লেখ্য যেসব রাজ্যে জাতিবর্ণের ভিত্তিতে কিছু বেসরকারি 'কাস্ট পঞ্চায়েত' অনেক আগেই গড়ে উঠেছিল, বিহার তার মধ্যে অন্যতম। বহু জাতিবর্ণে বিভক্ত গ্রামের বর্ষীয়ান পুরুষরা জাতিবর্ণের সনাতন বৈশিষ্ট্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই 'কাস্ট পঞ্চায়েত' গঠন করেছিলেন। কাস্ট পঞ্চায়েতের সদস্যরা কখনও চান না যে মহিলারা পরিবারের বাইরে গিয়ে স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। কারণ তা হবে নারীর সনাতন সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থার পরিপন্থী। অনেক সময় পুরুষরা এখানে এমন ভয়ও করেন যে নারীরা পঞ্চায়েতে গেলে তারা অনেক সনাতন সামাজিক প্রথা, যেমন বালিকা বিবাহ (যা বিহারের গ্রামাঞ্চলে আজও অহরহ ঘটে চলেছে), পণপ্রথা এবং পরিবারের ভিতর নারীদের কারণে অকারণে অত্যাচার করা ইত্যাদির বিরুদ্ধে সরব হতে শিখবেন এবং তার ফলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ফাটল ধরা ভিত ভেঙ্গে পড়তে পারে। ১৯৯৩ সালের আগস্ট মাসে বিহারে যে নূতন পঞ্চায়েতি আইন পাশ করা হয়, তাতে অতি অনগ্রসর বর্ণ অধ্যুষিত অঞ্চলে শুধু অনগ্রসর বর্ণের জন্যই 'কাস্ট পঞ্চায়েত' গঠনের নীতি গৃহীত হয়।

বিহারের জনতা দল সরকার যখন ১৯৯৩ সালের অক্টোবরে নির্বাচনের দিন স্থির করেন, তখনই অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর আসন সংরক্ষণের কারণে এই শ্রেণীর মানুষের ভোটার সংখ্যা গণনার প্রয়োজন অনুভূত হয়। ১৯৯৪ সালের প্রথম দিকে গণনা শেষও হয়। ইতিমধ্যে বিহার সরকার অনগ্রসর শ্রেণী অধ্যুষিত নির্বাচনি অঞ্চলগুলিকে তাদের জন্য সংরক্ষিত করার চেষ্টা করলে নানা রাজনৈতিক দলাদলি এবং আইনি দ্বন্দ্ব উপস্থিত হওয়ার ফলে এই সংরক্ষণ নীতি কার্যকর হয়নি।[২৯] এরপর থেকে এ রাজ্যে মাঝে মাঝেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েও তা পিছিয়ে গিয়েছিল। আপাদদৃষ্টিতে ঝাড়খণ্ড আন্দোলন, ক্রমবর্ধমান দুর্বৃত্তায়ন, সরকারের স্থায়িত্ব নিয়ে অনিশ্চয়তা, নির্বাচনি অঞ্চল ভাগাভাগি নিয়ে গ্রামীণ দ্বন্দ্ব

ইত্যাদি ছিল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পথে অন্তরায়। ১৯৯৮ সালে পাটনা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা (পি আই এল) দায়ের করা হয়। ২০০০ সালে পাটনা হাইকোর্ট এই আবেদন বাতিল করে দিয়ে মন্তব্য করে যে তৃণমূল স্তরে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করতে বিহার সরকার আগ্রহী নয়।[৩০] শেষ পর্যন্ত জাতিবর্ণ বিদ্বেষের দ্বন্দ্বে বিধ্বস্ত বিহারে আবার নির্বাচন হয়েছে ২০০১ সালে। ৬টি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচন ১১ই এপ্রিল শুরু হয়ে শেষ হয় ৩০ শে এপ্রিল। অর্থ, অস্ত্র, দুর্বৃত্তায়ন ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের এই নির্বাচনের বলি হয়েছেন ২০০ জনেরও বেশি মানুষ। নির্বাচন এখানে দলভিত্তিক না হলেও প্রায় সব নির্বাচন প্রার্থীই ছিলেন কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থনপুষ্ট। প্রতিটি দলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীই প্রার্থী দিয়েছে একে অপরের বিরুদ্ধে। হিংসাও তাই ছড়িয়েছে দ্রুত।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে ঘন মেঘের মাঝে রুপোলি রেখার মতো এই নির্বাচনকে ঘিরে জেগে উঠেছে বিহারের দেহাতি মেয়েরা। উদাহরণস্বরূপ, ভোটার তালিকা অনুযায়ী বৈশালী জেলার হাজিপুর ব্লকের অরড়া গ্রামের জনসংখ্যা ৪ হাজার ৪০০, আর এদের মধ্যে যাদবরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ (১৫৮০)। এই সম্প্রদায়েরই প্রায় নিরক্ষর মহিলা ঊর্মিলা দেবী অরড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রার্থী হয়েছেন। শুধু তাই নয়, নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "নিজেদের সমস্যা নিজেরাই মেটানোর জন্য ভোটে দাঁড়িয়েছি। আমাদের যে অধিকার দেওয়া হয়েছে, তার সদ্ব্যবহার চাইছি। উন্নতি চাইছি নিজেদের।"[৩১] এই অধিকারবোধ এবং উন্নতি করার ইচ্ছে জাগ্রত হওয়াটাই গুরুত্বপূর্ণ। এই অরড়া গ্রামেরই হরিজন টোলার মুশাহার সম্প্রদায়ের (যে সম্প্রদায়ের মানুষ এখনও খেতের ইঁদুর মেরে খায়) অল্প পড়াশোনা জানা ২৫ বছর বয়স্ক সঙ্গীতাও গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন। সঙ্গীতার খেত মজুর স্বামীই তাকে প্রার্থী হতে উৎসাহ জুগিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে বিহারে নব্বই-এর দশকে কয়েকবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার বাতাবরণকে কেন্দ্র করে (যদিও তখন নানা কারণে নির্বাচন হয়নি) এই রাজ্যে গড়ে উঠেছে এক ধরনের 'কিশোরী সভা'। মজঃফরপুর জেলার কানহারা হর্দাস গ্রামের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এই কিশোরী সভার সদস্যরা এখানে নির্বাচনের প্রাক্‌পর্ব রূপে বাড়ির অন্তঃপুরে প্রবেশ করে বর্ষীয়ান মহিলাদের কাছে পর্দাপ্রথা ত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে আসার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেছেন, ভোটদানের গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, এবং বালিকাদের জন্য বহুদূরে অবস্থিত বিদ্যালয়ে যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত

করেছেন। রামপুর হরপাল গ্রামের কিশোরী সভার সদস্যারা বালিকাদের নিরক্ষরতা, বালিকা বিবাহ ও পণপ্রথা ইত্যাদির বিরুদ্ধে পথ নাটিকার মাধ্যমেও জনমত গঠন করতে সচেষ্ট হয়েছেন।[৩২] অন্যভাবে বলা যায়, এ রাজ্যের কিশোরী সভাগুলি পরিশীলিতভাবে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে লড়াই করে মহিলাদের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদা ও ক্ষমতা লাভের পথকে প্রশস্ত করার কাজে ব্রতী হয়েছেন। আরও উল্লেখ্য যে বিহারের দেহাতি মহিলাদের কাছে নির্বাচনের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য গড়ে উঠেছে নানা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। 'সংসর্গ' নামে এ রকমই একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মীরা গান শিখছেন, নাটক করছেন। আর দুপুরের গ্রামে ধুলো উড়িয়ে পথ পরিক্রমা করছেন গান গাইতে গাইতে,

'আ গইলে পঞ্চায়েতি রাজ শাসন বা হো,
ভাইয়া মানো না কহন মা...।'[৩৩] এভাবেই গ্রামের মহিলাদের মধ্যে পঞ্চায়েতি রাজ সম্বন্ধে জাগরণ ঘটছে।

উপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে আইনত বাধ্য হয়েই এখন অনেক রাজ্য স্থানীয় স্ব-শাসন বা পঞ্চায়েতি রাজ-এ ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হচ্ছে। নারীদের জন্যও এক-তৃতীয়াংশ আসন বাধ্যতামূলক হওয়ায় তাদের জন্য সামাজিক ন্যায় বিচারের পথ কিছুটা প্রশস্ত হচ্ছে। আইনের কারণেই পুরুষরা কিছু আসন নারীদের জন্য ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

একথা অনস্বীকার্য যে সংরক্ষণের মাধ্যমে যেসব মহিলারা বিভিন্ন রাজ্যের পঞ্চায়েতে প্রবেশাধিকার পেয়েছেন, তাদের অধিকাংশই রাজনৈতিক দলের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত কোন পুরুষের আত্মীয়া। পরিবারের কোন মহিলা পঞ্চায়েতের সদস্যা হলে, বিশেষত প্রধান-এর পদে আসীন হলে, গোটা পরিবারই স্থানীয় রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রে নিজেদের শরিকী মর্যাদা পায়। তাছাড়া, প্রতি ৫ বছর অন্তর নির্বাচনের সময় সংরক্ষিত আসনগুলি বিভিন্ন নির্বাচনি এলাকার মধ্যে আবর্তিত হওয়ার আইনি বিধান থাকার ফলে সেই সময় স্ত্রী বা অন্য কোন নিকট আত্মীয়ার শূন্য আসনে পরিবারের পুরুষের প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাছাড়া, পরিবারের মহিলারা পঞ্চায়েতে অংশগ্রহণ করলে তা সাধারণ সদস্যরূপেই হোক, অথবা প্রধান রূপেই হোক, কিছু আর্থিক সুযোগ সুবিধার প্রশ্নও থাকে। এসব কারণেই রাজনৈতিক দলের সাথে কোন না কোনভাবে যুক্ত পুরুষরাই নিজেদের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নিকট

আত্মীয়াদের পঞ্চায়েতের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সমর্থন ও সাহায্য করেন, সেই আত্মীয়ার কোন রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা না থাকলেও।

এখানে কয়েকটি রাজ্যের অলোচনা থেকে এ কথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে অশিক্ষা এবং রাজনৈতিক অনভিজ্ঞতাই মহিলা সদস্যাদের ক্ষমতালাভের পথে বিরাট অন্তরায়। তাছাড়া নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ তো আছেই। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে পুরুষেরা এখনও নারীর উপর আধিপত্য করার প্রবৃত্তি দমন করতে পারেন না, সে পরিবারের ভিতরেই হোক অথবা বাইরের জগতেই হোক। আর চিরদিনের অবদমিত এবং সর্বতোভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল নারীরাও নিজস্ব ব্যক্তিত্বে সহসা কোন কাজ করার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারেন না। তাই অন্তত এসব রাজ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীরা যে এখন অন্তত আংশিকভাবে পুরুষের 'প্রক্সি' রূপেই পঞ্চায়েতে কাজ করেন, একথা মেনে নিতেই হয়। আর এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে এসব রাজ্যে মহিলারা, বিশেষত মহিলা প্রধানরা, নানা বিরোধিতার সম্মুখীন হন। তথাপি এরই মধ্যে অনেক পঞ্চায়েতে মহিলা সদস্যারা যে নিজস্ব দক্ষতায় বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করছেন এবং তাদের অধিকারবোধ যে ক্রমশ জেগে উঠছে, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। এ কি নারীমুক্তির পূর্ব প্রতিশ্রুতি নয়?

পঞ্চায়েত সদস্যাদের মধ্যে নিম্নবর্গের মহিলাদের পরিস্থিতিই বেশি অসুবিধাজনক। আমাদের সনাতন ঐতিহ্যের ধারা বহন করে নিম্নবর্গের গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যারা, বিশেষত প্রধান-এর পদে আসীন নিম্নবর্গের মহিলারাই, জাতিবর্ণ বিদ্বেষের ফলে বিরোধিতা ও নিগ্রহের শিকার হয়েছেন বেশি। তবে আশার কথা এই যে নিম্নবর্গের নরনারীর মধ্যেও এখন রাজনৈতিক অধিকারবোধ জাগ্রত হচ্ছে। অপেক্ষা করতে হবে সে শুভ দিনের জন্য যেদিন সমাজের সব স্তরের নারীপুরুষই তাদের প্রাথমিক জড়তা , অনভিজ্ঞতা ও অশিক্ষাকে অতিক্রম করে স্বাবলম্বী ও আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে নিজগুণে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতালাভ করবেন, এবং সেই ক্ষমতাকে ভোগ করবেন। সে শুভযাত্রা শুরু হয়েছে!

পাদটীকা

(১) Mathew George and Ramesh C Nayak, "Panchayat at Work : What it means for the oppressed ? *EPW*, 6 July, 1996. pp. 1766-1771.

(২) *ঐ*
(৩) *ঐ*
(৪) *ঐ*
(৫) Bidyut Mohanty, "Panchayati Raj, 73rd Constitutional Amendment and Women," *EPW,* 30 Decemer, 1995, pp. 3346-3350.
(৬) *Panchayat Update,* September, 1999, p. 15.
(৭) *The Times of India,* 18 May, 1995.
(৮) George Mathew, *Liberal Times,* April, 1999, p.11
(৯) *Hindusthan Times,* 12 January, 2001.
(১০) *ঐ*
(১১) *The Times of India,* 6 October, 1996.
(১২) Shobita Rajagopal and Kanchan Mathur, "Women's Employment through State Benevolence." *EPW,* 12 August, 2000, pp. 12-18.
(১৩) *Hindusthan Times,* 20 September, 2000.
(১৪) *Panchayat Update,* No. 75 March, 2000. p ৪.
(১৫) Mahi Pal, "Panchayat Elections : From Politics to Tacties," *EPW,* 9 September, 2000, pp. 9-15.
(১৬) *ঐ*
(১৭) *ঐ*
(১৮) *ঐ*
(১৯) George Mathew, *Panchayati Raj From Legislation to Movement,* concept publishing Company, New Delhi, 1994. p.38.
(২০) *ঐ* p. 138.
(২১) *ঐ*
(২২) *The Economic Times,* 17 July, 1995.
(২৩) George Mathew, *Panchayati Raj From Legislation to Movement,* op cit, p.74
(২৪) *ঐ* pp. 74-75.
(২৫) Susheela Kaushik, *Panchayati Raj in Action,* Fried Elbert Stifting, New Delhi, 1996, p.90.
(২৬) *The Times of India,* 20 March, 1997.
(২৭) *ঐ* 6 October, 1996.
(২৮) *ঐ*
(২৯) Susheela Kaushik, *op cit,* p.76.
(৩০) *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ১৪/১২/২০০০.
(৩১) *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ১৮/০২/২০০১.
(৩২) *Hindu,* 23 September, 1997.
(৩৩) *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ১৮/০২/২০০১.

৭

পঞ্চায়েতে ক্ষমতায়ন ঃ পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নতুন নয়। ১৮৮৪ সালে বঙ্গীয় স্থানীয় স্ব-শাসন আইনের মাধ্যমে প্রথম ত্রি-স্তরীয় জনপ্রতিনিধিমূলক পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। আর ১৯১৯ সালে বঙ্গীয় গ্রামীণ স্বায়ত্ব শাসন আইনের দ্বারা ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। কিন্তু এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন স্থানীয় ব্যাপারে জনসাধারণের উদ্যোগ বা অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল সামান্যই। আর সেই কালে এবং সেই স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় মহিলাদের অংশগ্রহণের কোন প্রশ্নই ছিল না।

স্বাধীনতার পরে ১৯৫৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন ও ১৯৬৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ জেলা পরিষদ আইনের মাধ্যমে সমগ্র রাজ্যে চারস্তর ভিত্তিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। কিন্তু কার্যত সত্তরের দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে স্থানীয় স্ব-শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। ১৯৭৩ সালে উপরোক্ত দুটি আইনকে একত্রিত করে, আর সেই সঙ্গে কিছু নূতন বিধান সংযোজিত করে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন (West Bengal Panchayat Act, 1973) প্রণীত হয়। কিন্তু ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে এ রাজ্যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকর হয় নি। ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট সরকার অশোক মেহ্‌টা কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১৯৭৩ সালের আইনে কয়েকটি সংশোধনি গ্রহণ করেন, এবং তখনই এ রাজ্যে ত্রি-স্তর ও রাজনৈতিক দল ভিত্তিক স্থানীয় স্ব-শাসন ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়।

পঞ্চম এবং ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে যে অন্য অনেক রাজ্যে যেসব কারণের জন্য নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি, তার মধ্যে অন্যতম হল সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নীচু তলায় ক্ষমতা হস্তান্তরের অনিচ্ছা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রথম থেকেই জেলা থেকে শুরু করে গ্রাম পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে স্থানীয় স্ব-শাসনের মাধ্যমে জনগণের উন্নয়নে বিশ্বাসী। আর তাই ১৯৭৮ সাল থেকেই এ রাজ্যে প্রতি ৫ বছর অন্তর নিয়মিতভাবে পঞ্চায়েতে নির্বাচন হয়েছে, যা

সারাভারতে প্রায় ব্যতিক্রমের পর্যায়ে পড়ে। আর অশোক মেহ্‌টা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এ রাজ্যে নির্বাচন সম্পূর্ণই রাজনৈতিক দল ভিত্তিক হওয়ায় এখানে পঞ্চায়েত একাধারে একটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে উঠেছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিই হল দলীয় রাজনীতি এবং দল ভিত্তিক নির্বাচন। অ্যাসেম্বলি ও পার্লামেন্টেও তো দল ভিত্তিক নির্বাচনই হয়। সুতরাং তৃণমূল স্তরেও দল ভিত্তিক নির্বাচন হওয়াই স্বাভাবিক। পশ্চিমবঙ্গের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে এখানে ভূমিসংস্কারকে পঞ্চায়েতি রাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। ভূমি মালিকের জন্য জমির নির্ধারিত উর্ধ্বসীমার উপরে উদ্বৃত্ত জমি পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই সাধারণ মানুষের মধ্যে বন্টন করে গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক ক্ষমতার পুরানো কাঠামো চূর্ণ করে গণতান্ত্রিক কাঠামো গঠন করার পথ দেখানো হয়েছে। এখনও কোন কোন জেলায় অনেক খাস জমি পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই উদ্ধার করা হচ্ছে। আর সেই সঙ্গে নানাবিধ কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারি উন্নয়নমূলক কর্মসূচীগুলিকেও পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই রূপায়িত করার ফলে জনসাধারণের সাথে পঞ্চায়েতের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই প্রক্রিয়ায় নারীর স্থান কোথায় এবং কতটুকু?

প্রাথমিক পর্যায়

পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার আদর্শগতভাবেই সামাজিক ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য দায়বদ্ধ। কিন্তু প্রথমদিকে রাজ্য সরকার সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা কল্পে গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীদ্বন্দ্ব উচ্ছেদে যতখানি উৎসাহী ছিলেন, নারী পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারীর আর্থসামাজিক মর্যাদা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ততখানি উদ্যোগী ছিলেন না। ১৯৯২ সালের সংবিধান সংশোধনি আইনের মাধ্যমে সব রাজ্যে পঞ্চায়েতের এক-তৃতীয়াংশ আসন নারীদের জন্য বাধ্যতামুলকভাবে সংরক্ষিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই প্রগতিশীল রাজ্যেও পঞ্চায়েতে নারীর উপস্থিতি ছিল যৎসামান্য। যদিও মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং ওড়িশা প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে পঞ্চায়েতে মহিলাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রথম থেকেই ছিল। আবার কোন কোন রাজ্যে সংরক্ষিত আসনের কিছু অংশ নির্দিষ্ট থাকতো তপশিলী জাতি/উপজাতি মহিলাদের জন্য। কিন্তু এ রাজ্যে ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনির পূর্বে কোন সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না। তবে সত্তর ও আশির দশকে মহিলা এবং তপশিলী জাতি/উপজাতি

মানুষের দু এক জনকে কো-অপ্ট করে পঞ্চায়েতে নেবার ব্যবস্থা ছিল। তাছাড়া সত্তর এবং আশির দশকেও এ রাজ্যে কোথাও কোথাও মহিলারা সাধারণ আসনে নির্বাচিত হয়ে পঞ্চায়েতে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তবে তাদের সংখ্যা ছিল নগণ্য।

অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও পঞ্চায়েতে নারীর ক্ষমতায়ন এবং বিশেষত নারীর ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনার প্রধান অসুবিধা হল এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের অভাব। ১৯৯৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সম্পর্কে কয়েকটি পুস্তকের[১] মধ্যে শুধু নেইল ওয়েবস্টার-এর পুস্তকে তার সমীক্ষিত পঞ্চায়েত দুটিতে নারী এবং অন্যান্য অবর শ্রেণীর অবস্থান সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ওয়েবস্টার কর্তৃক সমীক্ষিত পঞ্চায়েত দুটি হল বর্ধমান জেলার কানপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং সালদিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত (সমীক্ষক পঞ্চায়েত দুটির আসল নাম প্রকাশ করেন নি)। এই সমীক্ষা অনুসারে ১৯৭৮ সালে কানপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ১ জন ছিলেন মহিলা। ইনি সাধারণ বিভাজনের অন্তর্ভুক্ত নির্বাচিত সদস্যা ছিলেন। আর ১৪ জন পুরুষ সদস্যের মধ্যে ৫ জন ছিলেন তপশিলী জাতিভুক্ত (২ জন কো-অপ্ট করা এবং বাকি ৩ জন নির্বাচিত)। ১৯৮৩ সালে কোন মহিলা সদস্য ছিলেন না। মোট ১১ জন পুরুষ সদস্যের মধ্যে ৩ জন ছিলেন তপশিলী জাতির নির্বাচিত সদস্য। আর ১৯৮৮ সালের নির্বাচনে মোট ১৪ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ১ জন তপশিলী জাতিভুক্ত নির্বাচিত মহিলা সদস্য ছিলেন। বাকি ১৩ জন পুরুষ সদস্যের মধ্যে ৪ জন ছিলেন তপশিলী জাতি, এবং এদের মধ্যে ১ জন ব্যতীত বাকি সবাই ছিলেন নির্বাচিত সদস্য।[২]

নেইল ওয়েবস্টার-এর সমীক্ষা অনুযায়ী ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত তিনটি নির্বাচনে মোট ৬ জন মহিলা প্রতিনিধির মধ্যে ৪ জন ছিলেন শুধু গৃহবধূ, যাদের কোন নিজস্ব অর্থকরী পেশা ছিল না। ১ জন ছিলেন ছাত্রী, আর বাকি ১ জন বিড়ি তৈরী করতেন। পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যাদের অধিকাংশ পরিবার ছিল ভূমিহীন অথবা ক্ষুদ্র জমির মালিক। এদের আয়ের প্রধান উৎস ছিল শিক্ষকতা অথবা ছোট ব্যবসা।[৩] অর্থাৎ এখানে পঞ্চায়েতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়েছিল। অনুমান করা যায়, ভূমিসংস্কারের ফলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরা পঞ্চায়েত রাজনীতিতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

উল্লেখ্য যে জি.কে.লিয়েনটেন-এর[৪] একটি সমীক্ষা অনুসারেও বর্ধমান জেলার

মেমারি (ব্লক-২) পঞ্চায়েত সমিতিতেও ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৮ সালের মধ্যে নিম্নবর্গের প্রান্তিক চাষি, কৃষি শ্রমিক এবং ছোট ব্যবসায়ীর প্রতিনিধিত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পেলেও মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব ছিল যৎসামান্য। ১৯৯৯ সালে ১৪১ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ১৪ জন অর্থাৎ ১০ শতাংশ ছিলেন মহিলা। উপরোক্ত ২টি সমীক্ষাকে অনুসরণ করে বলা যায় যে স্থানীয় স্ব-শাসনের রাজনীতিতে সমাজের দুর্বল শ্রেণীর মানুষের অংশগ্রহণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেলেও সত্তর এবং আশির দশকে স্থানীয় রাজনীতিতে মহিলাদের বিশেষ স্থান হয়নি। ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনি পঞ্চায়েত রাজনীতিতে নারীর প্রবেশাধিকারের পথকে সুগম করে।

এখানে ১৯৯৩ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি ২টি আলাদা অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হবে। প্রথম অনুচ্ছেদে আলোচিত হবে ১৯৯৩ সালের নির্বাচনে এ রাজ্যে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি। প্রসঙ্গক্রমে এখানে অন্যান্য দুর্বলশ্রেণীর ক্ষমতায়নের বিষয়টিও এসে যাবে। আর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হবে ১৯৯৮ সালের নির্বাচনের পর পঞ্চায়েত রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে।

নারী ও অবর শ্রেণীর ক্ষমতায়ন, ১৯৯৩

১৯৯২ সালের ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনির পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েতি আইনে কিছু সংশোধনির মাধ্যমে এই রাজ্যেও পঞ্চায়েতের প্রত্যেক স্তরে নারীর জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন (তপশিলী জাতি/ উপজাতি নারী সহ) সংরক্ষিত রাখার নীতি গ্রহণ করেন। আর সেই সঙ্গে গৃহীত হয় অবর শ্রেণীর তপশিলী জাতি/ উপজাতি মানুষের জন্য নিজ নিজ গোষ্ঠীর জনসংখ্যার অনুপাতে আসন সংরক্ষণের নীতি। তপশিলী জাতি/উপজাতি সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষিত থাকে এই গোষ্ঠীর নারীদের জন্য। আর সংরক্ষিত সব আসনই আবর্তিত হওয়ার নিয়মও গৃহীত হয়। ১৯৯৩ সালে মে মাসে অনুষ্ঠিত পঞ্চায়েতের নির্বাচনে এই নূতন নীতিই অনুসৃত হয়। আরও উল্লেখ্য যে প্রায় সব রাজ্যেই মণ্ডল কমিশন-এর সুপারিশ অনুসারে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর (ওবিসি) জন্য একটি আলাদা বিভাজন করে আলাদা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হলেও পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ওবিসি নারী

পুরুষের জন্য কোন সংরক্ষণ নেই। নির্বাচনে ওবিসিরাও সাধারণ বিভাজনের মধ্যেই পড়েন।

১৯৯৩ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ৩২২৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ৩২৮ টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং ১৭টি জেলা পরিষদে নতুন আইন অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সারণি-১ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ৩টি স্তরে মোট ৭১,১২০ টি আসনের মধ্যে ৪২,০৫১টি আসনকে (৫৯ শতাংশ) সংরক্ষিত রাখা হয়। এর মধ্যে ২৪, ৮৯৫টি আসন (৩৫ শতাংশ) সংরক্ষিত ছিল নারীদের (তপশিলী জাতি/উপজাতি নারী সমেত) জন্য। এই ৩৫ শতাংশ আসনকে ঘোষিত সরকারি নীতির (৩৩.৩ শতাংশ) থেকে বেশি বলা যায় না। মোট আসনের ভগ্নাংশ জনিত কারণেই এটি হয়েছে। সারণি-১-এ আরও প্রতিফলিত হচ্ছে যে ১৯৯৩ সালের নির্বাচনে সারা পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদে তপশিলী জাতি/উপজাতির নারী পুরুষের জন্য সংরক্ষিত ছিল যথাক্রমে ৩৭.২৮ শতাংশ, ৩৫.৮২ শতাংশ এবং ৩৪.৬০ শতাংশ আসন। সুতরাং এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে ৭৩তম

সারণি - ১

১৯৯৩ সালের নির্বাচনে সারা পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে নারী এবং অন্যান্য অবর শ্রেণীর সংরক্ষিত এবং অসংরক্ষিত আসন

স্তর	সাধারণ পুরুষ	সাধারণ নারী (সংরক্ষিত)	তপশিলী জাতি/ উপজাতি পুরুষ (সংরক্ষিত)	তপশিলী জাতি/ উপজাতি নারী (সংরক্ষিত)	মোট তপশিলী জাতি/উপজাতি	মোট আসন	নারীর জন্য সংরক্ষিত মোট আসন
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
গ্রাম পঞ্চায়েত	২৪৭১১ (৪০.৫০)	১৩৫৫৩ (২২.২১)	১৪৮১১	৭৯৩৬	২২৭৪৭ (৩৭.২৮)	৬১০১১ (১০০.০০)	২১৪৮৯ (৩৫.২২)
পঞ্চায়েত সমিতি	৪০৭১ (৪৩.০৭)	১৯৯৬ (২১.১১)	২২০০	১১৮৬	৩৩৮৬ (৩৫.৮২)	৯৪৫৩ (১০০.০০)	৩১৮২ (৩৩.৬৬)
জেলা পরিষদ	২৮৭ (৪৩.৭৫)	১৪২ (২১.৬৫)	১৪৫	৮২	২২৭ (৩৪.৬০)	৬৫৬ (১০০.০০)	২২৪ (৩৪.১৪)
মোট	২৯০৬৯	১৫৬৯১	১৭১৫৬	৯২০৪	২৬৩৬০	৭১১২০	২৪৮৯৫

সূত্র ঃ *Panchayati Raj*, Government of West Bengal, March-April and May-June, 1993.

সংবিধান সংশোধনির পর পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় নারী এবং অন্যান্য

দুর্বল শ্রেণীর আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এদের প্রতি সামাজিক সুবিচারের পথটি কিছুটা উন্মুক্ত হয়েছে, আর সেই সাথে বিকেন্দ্রিকৃত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাও হয়েছে পূর্বাপেক্ষা বেশি অর্থবহ। প্রসঙ্গত এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে কয়েকটি রাজ্যে ৭৩তম সংবিধান সংশোধনির সুপারিশ অনুযায়ী সংরক্ষণের নীতি কার্যকর হয়নি।

সারা পশ্চিমবঙ্গের নারী এবং অবর শ্রেণীর জন্য এই সংরক্ষণের চিত্র থেকে আমরা অবশ্যই বিভিন্ন জেলার স্থানীয় চিত্র পাই না। স্থানীয় অর্থনীতি, জনসংখ্যা এবং মানুষের আর্থসামাজিক পরিস্থিতির বিভিন্নতা নির্বিশেষে সব জেলার প্রতিটি স্তরেই নারীর অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ আসন লাভ করা কাম্য। কিন্তু শ্রী গিরিশ কুমার ও বুদ্ধদেব ঘোষ তাদের সমীক্ষিত ৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতে (বর্ধমান জেলার মেমারি ব্লক-এর দুর্গাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত, মালদহের সাহপুর, দক্ষিণ ২৪-পরগণার জয়নগর ব্লকের ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত এবং নদীয়া জেলার হরিণঘাটা ব্লক-এর কাশডাঙ্গা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত) দেখেছেন যে নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিরা গড়ে ছিলেন মাত্র ৩০ শতাংশ, অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশের কম। তবে এই ৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের সমীক্ষা অনুসারে সাধারণ প্রতিনিধিদের মধ্যে উচ্চবর্ণের প্রতিনিধিত্ব ছিল মাত্র ৭.৭৩ শতাংশ। মধ্যবর্ণের মানুষেরই ছিল প্রাধান্য। (৪১.৫১ শতাংশ)। তার পরের স্থানটি ছিল তপশিলী জাতি/উপজাতি জনগোষ্ঠীর (২৯.৩০ শতাংশ)। সমীক্ষকদ্বয় আরও লিখেছেন যে, "Caste status generally, though necessarily reflects class position also. The incidence of poverty is more acute among the lower castes."[৫] পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৯টি জেলার ১৯৯৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেছেন। এর মধ্যে দক্ষিণ ২৪-পরগণা, বীরভূম এবং নদীয়া, এই ৩টি জেলার পঞ্চায়েতকে এখানে আলোচনার জন্য বেছে নেওয়া হল। ত্রি-স্তর ভিত্তিক পঞ্চায়েতের গ্রামস্তরটিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে শুধু গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়েই এখানে আলোচনা সীমিত থাকবে।

সারণি-২ (পৃঃ ১১৯) থেকে দেখা যাচ্ছে যে ৩টি জেলার গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে গড়ে অন্যূন ৩৩.৩ শতাংশ নারী নির্বাচিত হয়েছেন। দক্ষিণ ২৪পরগণা ও নদীয়ায় তপশিলী জনজাতির সংখ্যাধিক্য পঞ্চায়েতেও প্রতিফলিত হয়েছে। আর বীরভূমে তপশিলী উপজাতির জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি হওয়ার ফলে অন্য ২টি জেলা

অপেক্ষা এখানে এই গোষ্ঠীর নারীপুরুষের প্রতিনিধিত্বও কিছুটা বেশি। এখন প্রশ্ন হল, এই জনপ্রতিনিধিরা, বিশেষত মহিলা সদস্যরা, শিক্ষা এবং আর্থিক কাঠামোর কোন স্তরে অবস্থান করতেন? আর পঞ্চায়েতে কোন জাতিবর্ণ ও শ্রেণীর মানুষরাই বা আধিপত্য করেছেন?

সারণি -২

৩টি জেলার (দঃ ২৪ পরগণা, বীরভূম ও নদীয়া)
গ্রাম পঞ্চায়েতে নারীপুরুষ সদস্য, ১৯৯৩*

	দক্ষিণ ২৪ পরগণা			বীরভূম			নদীয়া		
	গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা-৩১২			গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা-১৬৯			গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা-১৮৭		
বিভাজন	মোট	নারী	পুরুষ	মোট	নারী	পুরুষ	মোট	নারী	পুরুষ
সাধারণ	৩১০৩ (৫২ ৫৮)	১০২৫ (১৭ ৩৭)	২০৭৮ (৩৫ ২১)	১৬৫০ (৫৫ ৮০)	৫৩৬ (১৮ ১১)	১১১৪ (৩৭ ৭০)	২২৬৫ (৬১ ৩৮)	৭৬৩ (২০ ৬০)	১৫০২ (৪০ ৭০
তপশিলী জাতি	২৬৫৫ (৪৫ ০০)	১০০০ (১৬ ৯৫)	১৬৫৫ (২৮.০৫)	১০৩১ (৩৪.৯)	৩৮৯ (১৩.১৬)	৬৪৪ (২১ ৭০)	১২৯৫ (৩৫ ১০)	৪৯৯ (১৩ ৫২)	৭৯৬ (২১ ৫৮)
তপশিলী উপজাতি	১৪৩ (২.৪২)	৫৪ (০ ৯১)	৮৯ (১ ৫১)	২৭৪ (৯ ২৭)	১২৩ (৪ ১৬)	১৫১ (৫.১১)	১৩০ (৩ ৫২)	৫৫ (১ ৪৯)	৭৫ (২ ০৩)
মোট	৫৯০১ (১০০ ০০)	২০৭৯ (৩৫ ২৩)	৩৮২২ (৬৪ ৭৭)	২৯৫৫ (১০০ ০০)	১০৪৮ (৩৫ ৪৬)	১৯০৭ (৬৪ ৫৪)	৩৬৯০ (১০০ ০০)	১৩১৭ (৩৫.৬৯)	২৩৭১ (৬৪ ৩১)

বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা শতাংশ নির্ণয় করছে।

সূত্র ঃ 1. *Socio-Economic Profile of Panchayat Members,* Government of West Bengal, Institute of Panchayats and Rural Development, South 24-Paragana, p. 3 ;

2. *Ibid,* Birbhum, p3. and

3. *Ibid,* Nadia, p 3.

পঞ্চায়েত সদস্যাদের শ্রেণী ও শিক্ষা

সাধারণত আয় এবং সম্পত্তির মালিকানা দিয়েই শ্রেণী নির্ণয় করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ নারীর নিজস্ব কোন অর্থকরী পেশা কিংবা উল্লেখযোগ্য উপার্জন না থাকলেও

তাদের পারিবারিক আয়, অর্থাৎ স্বামী অথবা অন্য কোন পুরুষ অভিভাবকের আয় এবং জমির মালিকানা দিয়ে মহিলা সদস্যদের শ্রেণীগত চিত্র পাওয়া যায়।

এ বিষয়ে প্রথমেই উল্লেখ্য যে কৃষিপ্রধান পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত সদস্যদের আয়ের প্রধান উৎসই হল কৃষি। এ রাজ্যে ভূমিসংস্কারের সফল রূপায়ণের মাধ্যমে জমির উচ্চ মালিকানার উচ্ছেদ ঘটার ফলে গ্রামের সাধারণ মানুষেরা (পঞ্চায়েত সদস্যারা সহ) কৃষিতে নিযুক্ত থাকেন চাষি, ভাগ চাষি এবং শ্রমিকরূপে। তবে ভূমিহীনতা সব সময় দারিদ্র্যের সূচক হয় না। অনেক সময় দেখা যায়, ভূমিহীন মানুষও চাকরি, ব্যবসা, শিক্ষকতা প্রভৃতির মাধ্যমে ভালো উপার্জন করেন। এই ৩টি জেলার গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা কৃষি ছাড়াও কারিগর (কামার, কুমোর, ছুতোর ইত্যাদি) জেলে, পশুপালক, নানা ধরনের ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ী, শিক্ষক এবং চাকুরিজীবী রূপেও জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। তবে একই জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যেও আবার আয়ের প্রধান উৎসের পার্থক্য তো থাকেই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রিপোর্ট অনুযায়ী দক্ষিণ ২৪-পরগণা (৩১২টি গ্রাম পঞ্চায়েত), বীরভূম (১৬৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত), এবং নদীয়া (১৮৭টি গ্রাম পঞ্চায়েত), এই তিনটি জেলার গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের যথাক্রমে ৪৪ শতাংশ, ৫১ শতাংশ এবং ৩৬ শতাংশ সদস্যের বাৎসরিক আয়ের উর্দ্ধসীমা ছিল ৪ হাজার টাকা। অর্থাৎ এই সদস্যরা সকলেই দারিদ্রসীমার নীচে বাস করতেন। দক্ষিণ-২৪ পরগণা, বীরভূম ও নদীয়ায় ৪ হাজার-১১ হাজার টাকার মধ্যে বাৎসরিক আয় ছিল যথাক্রমে ৩৯ শতাংশ, ৩৯ শতাংশ ও ৪৪ শতাংশ সদস্যের। অনুরূপে যথাক্রমে ১২ শতাংশ, ৭ শতাংশ এবং ১২ শতাংশের আয় ১১০১ হাজার-২৫ হাজারের মধ্যে ছিল। ২৫ হাজার ও তার উর্দ্ধ আয়ের সদস্য ছিলেন খুবই কম শতাংশ। এদের মধ্যে আবার তপশিলী জাতি/উপজাতি সদস্য ছিলেন খুবই নগণ্য।[৬]

জমির মালিকানার যে চিত্র সরকারি রিপোর্টে ফুটে উঠেছে, তাতে দেখা যায় যে দক্ষিণ ২৪-পরগণা, বীরভূম ও নদীয়া জেলার উপরোক্ত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির যথাক্রমে ৫২ শতাংশ, ৪৩ শতাংশ এবং ৪৬ শতাংশ সদস্যের জমির পরিমাণ ২.৫০ একরের নীচে, আর যথাক্রমে ৮.৫২ শতাংশ, ১৫ শতাংশ এবং ১২.৫ শতাংশ সদস্যের জমির পরিমাণ ২.৫০ একর-৫ একরের মধ্যে ছিল। মাত্র ৩-৫ শতাংশ সদস্যের জমির মালিকানা ছিল ৫-১০ একরের মধ্যে। তার উর্দ্ধে জমি

ছিল খুব নগণ্য সংখ্যক সদস্যের। সুতরাং বলা যায় যে জমির মালিকানা যাদের আছে (পাট্টাদারদের বাদ দিয়ে), তাদেরও অধিকাংশই ছিলেন ক্ষুদ্র থেকে মাঝারি জমির মালিক, আর জমির মালিকানার দিক দিয়েও সাধারণভাবে নিম্নতর এবং নিম্নতম স্থানে অবস্থান ছিল যথাক্রমে তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতি সদস্যদের।[৭]

গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের আয় এবং জমির মালিকানার চিত্র থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসা যায় যে ১৯৯৩ সালের নির্বাচনে সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরাই স্থানীয় স্ব-শাসন ব্যবস্থার দায়িত্বে এসেছিলেন। আর এই তথ্যের ভিত্তিতেই বলা যায় যে নারী সদস্যদের ব্যক্তিগত আয় এবং জমির মালিকানা না থাকলেও (ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া) এরাও সাধারণভাবে গ্রামের মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারভুক্তই ছিলেন। উচ্চবিত্ত পরিবারের মহিলাদের পঞ্চায়েতে বিশেষ স্থান ছিল না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রিপোর্টে উপরোক্ত ৩টি জেলার গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যাদের মধ্যে পুরুষের তুলনায় নারী শিক্ষার কম হার এবং নারীদের মধ্যেও আবার তপশিলী জাতি ও উপজাতি নারীশিক্ষার নিম্নতর ও নিম্নতম হারই প্রতিফলিত হয়েছে। সদস্যারা প্রায় সকলেই বিবাহিত এবং ২০-৪০ বছর বয়সী ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এরা শিক্ষার সুযোগ এবং সময় পেয়েছেন কম। অধিকাংশ সদস্যার শিক্ষা বিদ্যালয়েরে সীমানা অতিক্রম করতে পারেনি। দক্ষিণ ২৪-পরগণার মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যরা গড়ে ৩৪.৮ শতাংশ এবং ৪০.২২ শতাংশ যথাক্রমে বিদ্যালয়ের প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষিত ছিলেন। তবে এখানেও তপশিলী জাতি এবং উপজাতি সদস্যরা ছিলেন যথাক্রমে নিম্নতর এবং নিম্নতম স্থানে। প্রাথমিক স্তরে তপশিলী জাতি এবং উপজাতির সদস্যাদের শিক্ষার হার ছিল যথাক্রমে ৩৭.৬২ শতাংশ এবং ২০ শতাংশ। আর মাধ্যমিক স্তরে তপশিলী জাতি ও উপজাতি নারীদের শতাংশ ছিল যথাক্রমে ২৫ শতাংশ এবং ১৭ শতাংশ। সাধারণ নারীদের মধ্যে স্নাতক স্তরের শিক্ষার শতকরা হার ছিল ৭.৩২, আর তপশিলী জাতির নারীর ক্ষেত্রে এই স্তরের শিক্ষার হার ছিল ৩.৬০ শতাংশ। তপশিলী উপজাতির মধ্যে স্নাতকোত্তর কেউ ছিলেন না। সাধারণ সদস্যাদের মধ্যে নিরক্ষর ছিলেন ০.৭৮ শতাংশ, কিন্তু তপশিলী জাতি এবং উপজাতির সদস্যাদের

নিরক্ষরতার হার ছিল যথাক্রমে ১.৯০ শতাংশ এবং ৫.৫৫ শতাংশ। সাধারণভাবে নারীদের তুলনায় পুরুষদের শিক্ষা ছিল উচ্চ মানের। পুরুষ সদস্যদের মধ্যে প্রায় কেউ-ই নিরক্ষর ছিলেন না।[৮] বীরভূম ও নদীয়া জেলার গ্রাম পঞ্চায়েতেও কম বেশি অনুরূপ চিত্রই পাওয়া যায়।[৯]

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে ১৯৯৩ সালের নির্বাচনে যে নারীরা তৃণমূল স্তরের রাজনীতিতে প্রবেশাধিকার লাভ করেছিলেন, তারা স্বামী কিংবা অন্য কোন পুরুষ অভিভাবকের সূত্রে মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত স্তরভুক্ত এবং শিক্ষার ব্যাপারে তারা ছিলেন বিশেষ অসুবিধাভোগী।

নারীর ক্ষমতায়ন, ১৯৯৮

প্রথমেই উল্লেখ্য যে এই অনুচ্ছেদটি মূলত লেখিকার ব্যক্তিগত সমীক্ষার উপর নির্ভরশীল। এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে ভূমিকায় বলা হয়েছে।

১৯৯৩ সালের নির্বাচনে নারীসহ নিম্নবর্গের মানুষের স্থানীয় স্ব-শাসনে যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়, ৫ বছর পরে ১৯৯৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তা আরও সম্প্রসারিত হয়। সারণি-৩ (পৃঃ ১২৩) থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৯৮ সালের নির্বাচনে ১৬টি জেলার (দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য এলাকা বাদ দিয়ে) মোট ৪৯,২৩৪ জন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য এবং ৮,৫৬২ জন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের মধ্যে নারীর প্রতিনিধিত্ব ছিল যথাক্রমে ৩৫.৬২ শতাংশ এবং ৩৫.০২ শতাংশ। আর জেলা পরিষদ স্তরে মোট ৭১৬ জন সদস্যের মদ্যে নারীর প্রতিনিধিত্ব ছিল ৩৩.৯৪ শতাংশ। অর্থাৎ প্রতিটি স্তরেই মোট আসনের অন্যূন এক-তৃতীয়াংশের বেশি আসনে নারীরা প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ভগ্নাংশজনিত সুবিধাটি নারীরাই পেয়েছেন। লক্ষণীয় যে সাধারণ নারীরা ৩টি স্তরেই মোটামুটি ২২ শতাংশ আসন লাভ করেছেন। আর তপশিলী জাতি ও উপজাতি নারীরা আছেন নিম্নতর ও নিম্নতম স্থানে (যথাক্রমে ১০ এবং ৩ শতাংশ। সুতরাং বলা যায় যে পঞ্চায়েতে সাধারণ এবং তপশিলী জাতি/উপজাতি নারীর এই অবস্থান তাদের নিজ নিজ আর্থসামাজিক অবস্থানেরই অনুরূপ।

সারণি - ৩

১৯৯৮ সালের নির্বাচনে পঞ্চায়েতের ৩টি স্তরে নারী পুরুষ প্রতিনিধিত্ব

	গ্রাম পঞ্চায়েত			পঞ্চায়েত সমিতি			জেলা পরিষদ		
জাতিবর্ণ	মোট	নারী	পুরুষ	মোট	নারী	পুরুষ	মোট	নারী	পুরুষ
সাধারণ	৩২৬৬৫ (৬৬ ৩৫)	১০৯৯০ (২২ ৩২)	২১৬৭৫ (৪৪.০৩)	৫৬৭২ (৬৬ ২৪)	১৮৪১ (২১ ৫০)	৩৮৩১ (৪৪ ৭৪)	৪৬১ (৬৫ ২২)	১৫৪ (২১.৫১)	৩১৩ (৪৩ ৭১)
তপশিলী জাতি	১৩৩৮০ (২৭ ১৮)	৫১৫৬ (১০ ৪৭)	৮২২৪ (১৬ ৭১)	২৩১৬ (২৭ ০৪)	৮৬০ (১০ ০৪)	১৪৫৬ (১৭ ০০)	১৯৯ (২৭.৭৯)	৭৪ (১০.৩৩)	১২৫ (১৭.৪৫)
তপশিলী উপজাতি	১৩৮৯ (৬.৪৭)	১৩৯১ (২ ৮২)	১৭৯৮ (৩ ৬৫)	৫৭৪ (৬ ৭০)	২১২ (২ ৪৭)	৩৬২ (৪ ২৩)	৫০ (৬.৯৮)	১৫ (২.০৯)	৩৫ (৪ ৮৯)
মোট	৪৯,২৩৪ (১০০ ০০)	১৭৫৩৭ (৩৫ ৬২)	৩১৬৯৭ (৬৪ ৩৮)	৮৫৬২ (১০০ ০০)	২৯১৩ (৩৫ ০২)	৫৬৪৯ (৬৫ ৯৮)	৭১৬ (১০০.০০)	২৪৩ (৩৩.৯৪)	৪৭৩ (৬৬.০৬)

সূত্র ঃ *Information on West Bengal Panchayats*, Government of West Bengal, State Institute of Panchayats and Rural Development, West Begal, Kalyani, Nadia, 1999, pp. 161, 162-182 and 183.

সদস্যাদের শ্রেণী ও শিক্ষা

ব্যক্তিগত সমীক্ষায় দেখা গেছে যে আলোচিত ৫টি জেলার ১০টি ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যাদের অধিকাংশই ছিলেন গৃহবধূ, যাদের নিজস্ব কোন অর্থকরী পেশা নেই। কিন্তু তারা গড়ে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত পরিবারভুক্ত। অনেক পরিবারই চাষের সাথে যুক্ত। অধিকাংশ চাষি পরিবারে মহিলারাও চাষ ও ফসল তোলার কাজের সাথে যুক্ত থাকেন। যাদের নিজেদের কোন চাষের জমি নেই, তারাও অনেক সময় ভাগ চাষ করেন। এছাড়া আছে পাট্টা চাষ ও অগ্রিম চাষ। অগ্রিম চাষের ক্ষেত্রে ভূমিহীন মানুষ চাষের মরশুমে কিছু টাকার বিনিময়ে অন্যের জমি নিয়ে নেন চাষের জন্য। সার, বীজ ইত্যাদি ধার নিয়ে পরিবারের মহিলারা সহ সবাই মিলে চাষ করে ফসল ঘরে তোলেন। আর তখনই পরিশোধ করেন জমির মালিকের ঋণ। অগ্রিম চাষের ক্ষেত্রে চাষ করা যায় অনেকটা নিজের জমিতে চাষ করার মতো, অন্যের জমিতে শ্রমিকের মতো নয়। তবে এমনও কিছু পঞ্চায়েত সদস্যা আছেন, পেশায় যারা কৃষি শ্রমিক। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ ২৪-পরগণার ডায়মণ্ডহারবার ব্লক-১ এর অন্তর্গত দেয়াচক গ্রাম পঞ্চায়েতের সুফিয়া বিবি, সাগর ব্লকের ধবলাট গ্রাম পঞ্চায়েতের

জাহানারা বিবি, হুগলি জেলার চণ্ডীতলা-১ ব্লকের নবাবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আনোয়ারা বেগম, বীরভূম জেলার বোলপুর শ্রীনিকেতন ব্লকের রূপপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান পূর্ণিমা হাঁসদা এবং মেদিনীপুরের সাঁকরাইল ব্লকের কুলটিকরি মহিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সাবিত্রি পাতোর বলেছেন যে তারা পেশায় কৃষি শ্রমিক। কৃষি নির্ভর জীবিকা ছাড়াও পঞ্চায়েত সদস্যাদের অন্যান্য পারিবারিক জীবিকা হল পশুপালন, নানাবিধ কুটির শিল্প, ছোট ব্যবসা (দোকান), ডাক্তার (হোমিওপ্যাথি), অফিসের করণিক এবং শিক্ষকতা প্রভৃতি। প্রতিটি ব্লকেই ২/৪ জন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকাও গ্রাম পঞ্চায়েতের সদ্যস্যা। সাগর ব্লকের কয়েকজন সদস্যা আছেন মৎসজীবী পরিবারভুক্ত। উদাহরণ রূপে বলা যায় যে ধবলাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উর্মিলা দলুই-এর স্বামী নিকটবর্তী জম্বুদ্বীপ থেকে মাছ এবং কাঁকড়া ধরে এনে পাইকারের কাছে বিক্রি করেন। উর্মিলা নিজেও সাগরে মিনি বাগদা ধরেন। আর তার পারিবারিক অল্প কিছু জমিতে চাষ হয় ধান, তরমুজ, খেসারি ডাল ও লঙ্কা ইত্যাদি। জাহানারা বিবির স্বামীও সাগরে মাছ ধরেন, এবং ফিসারি থেকে মাছ এনে পাইকারের কাছে বিক্রি করেন। আবার কোন কোন পরিবারের আছে এক বা একাধিক পানের বরো।

সাধারণভাবে পঞ্চায়েত সদস্যাদের গড় শিক্ষার মান স্কুলের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবে এরই মধ্যে ২/৪ জন স্নাতক সদস্যা যেমন আছেন, তেমনি আছেন ২/৪ জন নব সাক্ষর, যারা শুধু নিজের নামটুকুই সই করতে পারেন। শিক্ষা এবং আয়ের দিক থেকে তপশিলী উপজাতি মহিলারাই আছেন সব থেকে নীচে। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ পঞ্চায়েত সদস্যা পাওয়া যায় কদাচিৎ। সংক্ষেপে বলা যায়, সমীক্ষিত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির সদস্যারা সাধারণভাবে অল্পশিক্ষিত, এবং মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারভুক্ত। উচ্চবিত্ত এবং উচ্চশিক্ষিত মহিলা প্রায় অনুপস্থিত। তবে এ হল শুধু গ্রাম পঞ্চায়েতের চিত্র। পঞ্চায়েত সমিতিগুলির চিত্র একটু আলাদা। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যাদের গড় শিক্ষার স্তর এবং পারিবারিক আয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যাদের থেকে অনেকটাই ভালো। আর পঞ্চায়েতের উচ্চতম স্তরে অর্থাৎ জেলা পরিষদে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষিত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত সদস্যা আছেন বেশ কিছু। উচ্চস্তরের নির্বাচনে প্রার্থী দেবার সময় স্বাভাবিক কারণেই প্রার্থীর শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবে স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী একই জেলার বিভিন্ন ব্লকে এবং একই ব্লকের ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতেও কিছুটা আলাদা আলাদা চিত্র তো আছেই।

একথা অনস্বীকার্য যে সংরক্ষণের ফলেই অল্প শিক্ষিত এবং মধ্য ও নিম্ন মধ্যবিত্ত সাধারণ এবং তপশিলী জাতি/উপজাতি নারীরা এখন তাদের নিজ নিজ আর্থ সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী স্থানীয় স্ব-শাসন ব্যবস্থায় স্থান করে নিতে পেরেছেন। অন্যথায় পিতৃতান্ত্রিক এবং পুরুষশাসিত সমাজে এতগুলি আসনে নারীদের পক্ষে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাই সম্ভব হতো না। নারীর প্রতিটি পদক্ষেপেই আজও ছড়ানো আছে পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতার জাল।

সদস্যাদের যোগ্যতার প্রশ্ন

এখন প্রশ্ন হল, পঞ্চায়েতের এই সদস্যারা কি তৃণমূল স্তরের রাজনীতির যোগ্য? আর কিভাবেই বা তারা স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করছেন? তারা কি শুধুই পুরুষ আত্মীয়দের 'প্রক্সি' রূপে কাজ করছেন?

এখানে প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন যে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক দল ভিত্তিক। দলীয় ভিত্তিতেই প্রার্থী ঠিক করা হয়। ফলে পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরে নির্বাচিত সদস্যরা সকলেই কোন না কোন ভাবে রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত। বামফ্রন্ট সরকারের অন্তর্ভুক্ত বৃহত্তম দল সি পি আই (এম)-এর মহিলা শাখা গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি বহু বছর ধরে এ রাজ্যে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে মহিলাদের রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করার কাজে ব্রতী আছেন। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে এ রাজ্যে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যাদের মধ্যে অনেকেই গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সদস্যা। সুতরাং এই দলের মহিলা প্রতিনিধিদের অনেকেরই কিছুটা রাজনৈতিক সচেতনতা আগেই থাকে। কিছু সদস্যা আছেন, যারা দলের সারাক্ষণের কর্মী। আর কোন দলের মহিলা শাখা না থাকলেও পরিবারের দলীয় পুরুষ সদস্যদের মাধ্যমে নারীরা কিছুটা রাজনৈতিক শিক্ষা পেয়ে থাকেন। একথা সত্য যে অন্যান্য রাজ্যের মতো এ রাজ্যেও পঞ্চায়েতের মহিলা প্রতিনিধিদের অধিকাংশই এমন কোন ব্যক্তির স্ত্রী অথবা এক বা একাধিক ব্যক্তির নিকট আত্মীয়া যিনি বা যারা কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য, সক্রিয় কর্মী অথবা দ্বিধাহীন সমর্থক। আর এটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ আসন ছেড়ে দিতে হচ্ছে বলে অন্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও পুরুষেরাই নিকট আত্মীয়াকে সেই আসনে পাঠাবার ব্যাপারে উদ্যোগী হন। এতে আসনটি পরিবারের মধ্যেই

থাকে। আর সঙ্গে কিছু প্রচ্ছন্ন আর্থিক কিংবা অন্য সুবিধাও হয়তো থাকে। সমীক্ষিত গ্রাম পঞ্চায়েতে সদস্যাদের অধিকাংশেরই পিতৃকুল অথবা শ্বশুরকুলের একাধিক ব্যক্তি, এমনকী অনেক সময় শাশুড়ি, ননদও বিভিন্ন দলের সদস্য এবং ঘনিষ্ঠভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত। কয়েকজন সদস্যা আবার ইতিমধ্যে দল পরিবর্তনও করেছেন। সুতরাং পারিবারিক সূত্রে অন্তত কিছুটা রাজনৈতিক যোগাযোগ এবং মানসিকতা বেশ কিছু সদস্যারই আছে। নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী দেবার সময়ও প্রার্থীর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং পারিবারিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ যথাসম্ভব দেখে নেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মেদিনীপুর জেলার সাঁকরাইল ব্লকের কুলটিকরি গ্রাম পঞ্চায়েতটি সম্পূর্ণ মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত। ১৯৯৩ সালের নির্বাচনের সময় থেকেই এই পঞ্চায়েতটি মহিলা পঞ্চায়েতরূপে গড়ে উঠেছে। অনেক আগে থেকেই এই অঞ্চলে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সদস্যারা নানা উন্নয়নমূলক কাজে, বিশেষত সাক্ষরতা এবং খাস জমি বন্টনের ব্যাপারে কৃতিত্ব অর্জন করে এলাকার মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাই ১৯৯৩ সালের নির্বাচনের সময় নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে এই গ্রাম পঞ্চায়েতে পুরুষরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। ১৯৯৮ সালের নির্বাচনেও এখানে পুরুষ প্রার্থী কেউ ছিলেন না। এটি 'মহিলা পঞ্চায়েত' রূপেই গড়ে উঠেছে। আগেই বলা হয়েছে যে এ ধরনের মহিলা পঞ্চায়েত মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ এবং ত্রিপুরাতেও আছে।

ইদানিংকালে পশ্চিমবঙ্গে প্রধানত সি পি আই (এম), সি পি আই, কংগ্রেস, তৃণমূল, বি জে পি এবং অল্প কিছু জায়গায় আর এস পি এবং এস ইউ সি আই পঞ্চায়েত নির্বাচনের অংশিদার। ফলে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট প্রত্যেকটি আসনের জন্য ৩/৪ জন করে বিভিন্ন দলীয় প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে সংরক্ষণের বাইরেও সাধারণ আসনে মহিলারা নির্বাচিত হয়েছেন। সারণি-৪-এ (পৃঃ ১২৭) ৫টি ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যাদের দলীয় যোগাযোগ দেখানো হল। সারণি—৪ এ দেখা যাচ্ছে যে এক একটি আসনের জন্য কমপক্ষে ৩/৪ জন দলীয় প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। সাধারণত মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনেও এরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হয় বা হয়েছে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে একথা বলা চলে না যে স্থানীয় রাজনীতিতে মহিলাদের অনীহা আছে।

সারণি -৪

৫ টি ব্লকের গ্রামপঞ্চায়েতের নারীপুরুষ সদস্য এবং রাজনৈতিক দল, ১৯৯৮

জেলা, ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা	পুরুষ	নারী				মোট সদস্য	রাজনৈতিক দল
		তপঃ জাতি	তপঃ উপজাতি	সাধারণ	মোট		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
দঃ ২৪ পরগনা ফলতা ১৩	১২৫	১৯	০	৫০	৬৯	১৯৪	৫-সিপিআই(এম), তৃণমূল, বি জে পি, কংগ্রেস ও সি পি আই
দঃ ২৪ পরগণা সাগর ৯	৮৯	২৭	০	২৬	৫৩	১৪২	৩-সিপিআই(এম), তৃণমূল ও কংগ্রেস
হুগলি চণ্ডীতলা-১ ৯	১০৪	১৩	০	৪৩	৫৬	১৬০	৪-সিপিআই(এম), তৃণমূল, কংগ্রেস বিজেপি।
বীরভূম বোলপুর-শ্রীনিকেতন ৯	৯৭	২০	১৭	২০	৫৭	১৫৪	৫-সিপিআই(এম), তৃণমূল, বি জে পি, আর এস পি ও সি পি আই
নদীয়া চাকদহ ১৭	২০৫	৭০	৭	৩৭	১১৬	৩২১	৪-সিপিআই(এম), তৃণমূল, কংগ্রেস ও বিজেপি।

সূত্র ঃ সংশ্লিষ্ট ব্লক(পঞ্চায়েত সমিতি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

নির্বাচনে জয়লাভ করার পরে প্রায় প্রত্যেকটি সদস্যাই নিজ নিজ দলের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন এবং নিজ নিজ দলের নীতিই হয় সদস্যাদের নীতি। অধিকাংশ সময় দলীয় নির্দেশেই তারা পঞ্চায়েতের কাজ পরিচালনা করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে মহিলা সদস্যারা দলীয় (গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি) কাজ এবং পঞ্চায়েতের কাজ-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেন না। আর নারী পুরুষ সকলের জন্যই এ কথা সত্য। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক

দলভিত্তিক হওয়ার ফলে অন্য অনেক রাজ্যের অপেক্ষা এ রাজ্যে পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যাদের দলের প্রতি আনুগত্যও বেশি হওয়াই স্বাভাবিক।

পঞ্চায়েতে দৈনন্দিন কাজকর্ম চালানোর জন্য মহিলাদের অবশ্যই কিছুটা সাহায্যের প্রয়োজন হয়। স্বল্পশিক্ষিত অথবা প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে একেবারেই নতুন আসা মহিলাদের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এ ব্যাপারে তাদের সাহায্য করেন দলীয় পুরুষ এবং মহিলা সদস্যরা, অথবা দলের সাথে যুক্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা। অধিকাংশ মহিলা সদস্যা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন যে প্রথম প্রথম তাদের পুকুরের মাছ সমুদ্রে পড়ার মতো অসহায় মনে হয়েছে। কিন্তু বছর খানেকের মধ্যে সে জড়তা কেটে গেছে। প্রশ্নের উত্তরে সমীক্ষিত সব সদস্যরাই জানিয়েছেন যে পঞ্চায়েতে তাদের কোন সমস্যা হয় না। পুরুষ সদস্যরা সব সময়ই তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। কোন কোন সদস্যা বলেছেন, "পুরুষরাই তো আমাদের পঞ্চায়েতে পাঠিয়েছে, তা এখন সাহায্য তো করতেই হবে।" আবার কেউ কেউ অকপটে বলেছেন, "পুরুষ সদস্যরা আমাদের সাহায্য করে, তবে তার মধ্যেও মনে মনে একটু অসন্তোষ আছে।" অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে মহিলা সদস্যদের বিরুদ্ধে পুরুষদের মনে একটু চাপা অসন্তোষ কাজ করলেও দলীয় এবং পারিবারিক স্বার্থে সহযোগিতার হাত বাড়াতেই হয়। ক্ষমতার লোভ এবং পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী বিরোধী মনোভাব কি হঠাৎ ত্যাগ করা সম্ভব? তবে যে ব্যবস্থা আইনি বিধানের বলে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, তার সাথে সহযোগিতা করাই তো বাস্তব বুদ্ধির পরিচায়ক।

প্রশ্ন হল, পুরুষ সদস্যরা সহযোগিতা করেন বলেই কি মহিলা সদস্যদের "পুরুষের প্রক্সি" বলা যায়? মনে রাখা প্রয়োজন যে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে এবং বিভিন্ন গণআন্দোলনে যোগদানকারী মহিলারাও পারিবারিক সূত্রেই রাজনীতিতে এসেছিলেন। তারা তরুণ সংগ্রামীদের সাথে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নানাভাবে সহযোগিতা করেছিলেন বলেই কী তরুণ সংগ্রামীরা নারীদের 'প্রক্সি' ছিলেন? আর সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রথম থেকে এখনও পর্যন্ত মহিলা সাংসদদের অধিকাংশই তাদের পিতা/ভ্রাতা/স্বামী, এমনকী মৃত স্বামীর সূত্র ধরেই সংসদে এসেছেন, আর এদের মধ্যে অনেকেই দক্ষতার পরিচয়ও দিচ্ছেন। এরাও কি সবাই 'প্রক্সি' সদস্যা? মনে হয় নারী পুরুষ যে পরস্পরের প্রতিযোগী নয়, পরিপূরক, এ কথাটি মনে রাখলেই অনেক সমস্যা এড়ানো সম্ভব। কিছুটা পুরুষের সহযোগিতা ও সাহায্য নিয়েও মহিলা সদস্যারা যদি অল্প সময়ের মধ্যে স্থানীয় রাজনীতিতে দক্ষ হয়ে ওঠেন তবে ক্ষতি কি?

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে পশ্চিমবঙ্গেরই একজন অভিজ্ঞ পঞ্চায়েত সদস্যের উক্তি ঃ "It is all 'purustantrik' which is there everywhere. Women have been treated as slaves by Muslims, by Brahmins, by Santals, by Chamars, by Sadgopes, and till recently they did not have a voice and were backward, and obviously when they enter into an organisation, they usually are not yet as good as the male members.... Don't forget that untill recently we didn't have any of them."[১০] সুতরাং যুগ যুগান্তর ধরে পিছিয়ে থাকা নারীদের জন্য, বিশেষত অধিকতর অনগ্রসর নিম্নবর্গের নারীদের জন্য, একটু সহনশীলতা থাকা উচিত নয় কি? নৈতিক দিক দিয়েও কি যুক্তিসঙ্গত নয়? তাছাড়া, অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতা অর্জন করার জন্য তো এক সময় সকলকেই শুরু করতে হয়। পুরুষ সদস্যদের জন্যও একথা সত্য। আরও বড় কথা হল এই যে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে কোন কোন ক্ষেত্রে মহিলা সদস্যরা পুরুষদের কথা শুনে কাজ করেন, তাহলে বলা যায় যে পুরুষ সদস্যরাও তো কাজ করেন সম্পূর্ণ দলীয় নির্দেশ অনুযায়ী। সেক্ষেত্রে তারাও কি শুধু দলের 'প্রক্সি' রূপে কাজ করেন?

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে এমন বেশ কিছু নারী আছেন, যারা কূট রাজনীতির খেলায় পুরুষদেরও হারিয়ে দিতে পারেন। অনেকে আবার সুবক্তাও। এরা তৃণমূল স্তরের অভিজ্ঞতা নিয়ে অনায়াসে এখন রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক রূপে কাজ করার যোগ্য। তৃণমূল স্তরের কঠিন সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ব্যক্তিত্বে যে পূর্ণতা আনে, তা কখনই উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া নেতৃত্বের মধ্যে পাওয়া যায় না। মনে রাখা প্রয়োজন যে বুদ্ধি বিবেচনা বা মস্তিষ্ক পুরুষ অপেক্ষা নারীর যে কোন অংশে কম নয়, তা প্রমাণিত সত্য। আর নারীর আছে একটি অতিরিক্ত গুণ। কাজে একাগ্রতা। প্রয়োজন শুধু কিছু সুযোগ সুবিধা এবং পরিবেশ। সে পরিবেশই এখন তৈরী হচ্ছে পঞ্চায়েত রাজনীতিতে।

মহিলা প্রধানদের দক্ষতার প্রশ্ন

গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে প্রধান-এর আসনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নিরপেক্ষ এবং দক্ষ ব্যক্তি প্রধান-এর পদে আসীন থাকলে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন। কিন্তু কার্যত প্রত্যেক প্রধানকেই তার দলীয়

নীতির সাথে সঙ্গতি রেখেই নিজের দায়িত্ব পালন করতে হয়। সংবিধান সংশোধনি আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানদের আসনগুলির এক-তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য (তপশিলী জাতি/উপজাতিসহ) সংরক্ষিত আছে। আর প্রধান-এর পদে নির্বাচনের সময় স্বাভাবিক কারণেই মহিলাদের ব্যক্তিগত শিক্ষা এবং রাজনৈতিক (দলীয়) অভিজ্ঞতার উপর কিছুটা বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সারণি—৫-এ (পৃঃ ১৩১) ৪টি জেলার ৬টি ব্লকের ১৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিলা প্রধানদের জাতিবর্ণ, শিক্ষা ও দলের যে চিত্র দেওয়া হল, তাতে দেখা যাচ্ছে যে ১৮ জন মহিলা প্রধান-এর মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা আছে বেশ কয়েকজনের। আর স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষাও আছে সামান্য সংখ্যক প্রধানের। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে তপশিলী সদস্যাদের মধ্যে এই স্তরের শিক্ষার হার অনেক কম।

আইনানুসারে গ্রাম পঞ্চায়েতে মহিলা প্রধানদের এক-তৃতীয়াংশ আসন তপশিলী জাতি/উপজাতি মহিলার জন্য নির্দিষ্ট রাখার নিয়ম। কিন্তু সারণি-৫এ দেখা যাচ্ছে যে তপশিলী মহিলা প্রধানরা এক-তৃতীয়াংশ অপেক্ষা বেশি আসন লাভ করেছেন। একটি ক্ষেত্রে তো (সাগর ব্লকে) প্রধানরা সবাই তপশিলী জাতিভুক্ত। এটা সম্ভব হয়েছে এই তপশিলী জাতি অধ্যুষিত এলাকায় সংরক্ষিত আসনের বাইরেও এই জনগোষ্ঠীর নারীরা সাধারণ আসনে বেশি সংখ্যায় নির্বাচিত হওয়ার ফলে। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য যে যতদূর জানা যায়, অন্য অনেক রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গে কোন তপশিলী জাতি/উপজাতি মহিলা প্রধানকে অযথা অপমান কিংবা শারীরিক নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়নি। অনুমান করা যায়, এ রাজ্যে তপশিলী জাতি/উপজাতি জনগোষ্ঠীর অপেক্ষাকৃত সংখ্যাধিক্য এবং জাতিদ্বন্দ্বের শিথিলতা ও নিজস্ব সংস্কৃতিই এর কারণ।

মহিলা পঞ্চায়েত প্রধানদের রাজনৈতিক দক্ষতা সম্পর্কে বলা যায় যে ১৯৯৮ সালে নির্বাচিত মহিলা প্রধানদের মধ্যে প্রায় সকলেই ১৯৯৩ সাল থেকে উপ-প্রধান অথবা সাধারণ সদস্যা রূপে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। কেউ কেউ আবার ১৯৮৮ কিংবা তারও আগে থেকে পঞ্চায়েতে মনোনীত সদস্যা রূপে কাজ করেছেন। সুতরাং মহিলা প্রধানদের অনেকেরই কিছুটা প্রত্যক্ষ পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতাও আছে। তবু অনেক প্রধানই অকপটে বলেছেন যে প্রথম দিকে কিভাবে মিটিং পরিচালনা করতে হয়, কিভাবে কি বলতে হয়, তা বাড়ি থেকে স্বামী কিংবা অন্য কেউ শিখিয়ে দিয়েছেন। এ বিষয়ে হুগলি জেলার গোঘাট-২ পঞ্চায়েত সমিতি থেকে জেলা পরিষদ-

সারণি - ৫

গ্রাম পঞ্চায়েতে মহিলা প্রধানদের জাতিবর্ণ, শিক্ষা ও দল, ১৯৯৮

জেলা, ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা	মহিলা প্রধানের নাম	পঞ্চায়েতের নাম	জাতিবর্ণ	শিক্ষা	দল
হুগলি,	অলকা ঘাঁটি	হরিপুর	তপঃজাতি	ষষ্ঠ শ্রেণী	বি জে পি
চণ্ডীতলা-১	গৌরী পাল	গঙ্গাধরপুর	সাধারণ	অষ্টমশ্রেণী	সিপিআই(এম)
৯	অনিতা ধলুই	ভগবতীপুর	তপঃজাতি	,,	,,
দঃ ২৪-পরগণা	শিপ্রা বৈদ্য	ভাদুয়া হরিদাসপুর	তপঃজাতি	অষ্টমশ্রেনী	,,
ডায়মণ্ডহারবার-২	মঞ্জু মিত্র	কামার পোল	সাধারণ	বি. এ.	তৃণমূল
৮					
দঃ ২৪ পরগণা,	মিঠু মণ্ডল	বেলসিংহা-২	তপঃজাতি	উচ্চমাধ্যমিক	তৃণমূল
ফলতা*	মমতা বাগ	গোপালপুর	সাধারণ	পঞ্চম শ্রেণী	তৃণমূল
১৩	রূপাঞ্জলী কয়াল	হরিণডাঙ্গা	,,	অষ্টম শ্রেণী	সিপিআই(এম)
	রিক্তা প্রামাণিক	চালুয়ারি	তপঃ উপজাতি	উচ্চমাধ্যমিক	তৃণমূল
দঃ ২৪-পরগণা,	রেখা রাণী সাহু	মুরিগঙ্গা	তপঃ জাতি	মাধ্যমিক	সিপিআই(এম)
সাগর ব্লক	ঝর্ণা মণ্ডল	ধসপাড়া-সুমতিনগর	,,	মাধ্যমিক	সিপিআই(এম)
৯					
	উর্মিলা দলুই	ধবলাট	,,	অষ্টম শ্রেণী	,,
নদীয়া	শিখা দে	তাতলা	,,	ষষ্ঠ শ্রেণী	,,
চাকদহ	নীলিমা নাগ	দুবড়া	,,	উচ্চমাধ্যমিক	কংগ্রেস
১৭	মমতা রায়	কাঁচরাপাড়া	সাধারণ(ব্রাহ্মণ)	চতুর্থ শ্রেণী	সিপিআই(এম)
	শকুন্তলা হাঁসদা	ঘেঁটুগাছি	তপঃউপজাতি	নবম শ্রেণী	কংগ্রেস
	গোপা দে	চাঁদুড়িয়া	সাধারণ	এম.এ.বি.টি	তৃণমূল
	মমতা সরকার	শিমুরালি	সাধারণ	মাধ্যমিক	সিপিআই(এম)

* ফলতা ব্লকের বঙ্গনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে কংগ্রেস এবং তৃণমূলের মধ্যে দলীয় দ্বন্দ্বের ফলে নির্বাচিত পুরুষ প্রধান-এর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে ২০০১ সালের ১৯ জানুয়ারী ১ জন নির্দল মহিলা প্রার্থীকে প্রধানরূপে পুনর্নির্বাচিত করা হয়েছে।

সূত্র ঃ সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতি থেকে প্রাপ্ত তথ্য।

এ নির্বাচিত সদস্যা শ্রীমতী দীপ্তি মিত্র বলেছেন, "যখন প্রথম কামারপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচিত হলাম, সংসারী মানুষ, মিটিং করতে ভয় পেতাম। স্বামী বুদ্ধি পরামর্শ দিয়েছেন, তিনি সি পি আই (এম) করেন। স্বামী এবং অন্যরাও শিখিয়ে দিতেন কিভাবে কি বলতে হবে। পরে তো নিজেই সব শিখে নিয়েছি।" এই বক্তব্যকে সমর্থন করে গো-ঘাট-২ পঞ্চায়েত সমিতি থেকে জেলা পরিষদ-এ নির্বাচিত আরেকজন সদস্যা শ্রীমতী ঝর্ণা সেন জানালেন, "অন্যরা শিখিয়ে দিতো, কিন্তু তার মধ্যেও আবার অনেক সময় হঠাৎই আমাদের বলতে হতো। ভয়ে ভয়ে বলতাম। এভাবেই ঠিক হয়ে গেছে।" অভিজ্ঞতা, বাস্তববুদ্ধি এবং একাগ্রতাই দক্ষতা তৈরী করে। গ্রাম পঞ্চায়েতে যেহেতু সংখ্যা গরিষ্ঠ দল থেকে প্রধান নির্বাচিত হন, নারী পুরুষ নির্বিশেষে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সহযোগিতাও তাই প্রধানরা পেয়ে থাকেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে পুরুষ প্রধানরাও সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যাদের সহযোগিতা নিয়েই দলীয় নীতি অনুসারে পঞ্চায়েতের কাজকর্ম পরিচালনা করেন। আর ১৯৯৮ সালের নির্বাচনে সাধারণভাবে পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সদস্যারাই প্রধান-এর পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। সুতরাং মহিলা প্রধানদের শুধু মহিলা বলেই পঞ্চায়েত পরিচালনায় দক্ষতার অভাবের প্রশ্নই অবান্তর।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে অসুবিধা হয় কিছু স্বল্প শিক্ষিত মহিলা প্রধানদের। উদাহরণ রূপে সারণি-৫এ দেখানো চণ্ডীতলা-১এর হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এবং চাকদহ ব্লকের তাতলা ও কাঁচড়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান-এর কথা উল্লেখ করা যায়। তবে এরা সংখ্যায় কম, এবং আশা করা যায় এদের সংখ্যা ক্রমশই আরও কমে আসবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতেই অফিসের কাজ চালানোর জন্য নিযুক্ত থাকেন পঞ্চায়েত সচিব, করণিক, সাহায্যকারী ইত্যাদি। আর স্বল্পশিক্ষিত প্রধানরাও সকলেই বাংলায় চিঠি লিখতে বা পড়তে পারেন। আর গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসের কাজকর্ম সাধারণত বাংলাতেই হয়। অসুবিধা দেখা দেয় ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিস থেকে আসা ইংরেজিতে লেখা চিঠি, ইস্তাহার অথবা নথিপত্র নিয়ে। তখনই প্রধানকে শরণাপন্ন হতে হয় কোন বিশ্বাসভাজন দলীয় সদস্যের। আর এসব ক্ষেত্রেই ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার প্রধানকে উপযুক্ত সম্মান দেন না। আরও একটি সমস্যা উদ্ভব হয় প্রধান এবং উপপ্রধান, এই দুজন ভিন্ন দলভুক্ত হলে। এ রকম ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। সম্ভবত এই কারণেই মেদিনীপুরের সাঁকরাইল ব্লকের কুলটিকরি মহিলা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-

প্রধানের আসনটি খালি রেখে দেওয়া হয়েছে। এই আসনে কাউকে নির্বাচিত করা হয়নি। কুলটিকরি মহিলা পঞ্চায়েতে ৮ জন সদস্যের মধ্যে ৭ জনই সি. পি. আই (এম) দলভুক্ত। বাকি ১ জন তৃণমূল সদস্যা প্রায় কখনই পঞ্চায়েতের অফিসে আসেন না। তবে এ ধরনের সমস্যা তো পুরুষ প্রধানদের ক্ষেত্রেও আছে। দক্ষিণ ২৪-পরগণার জয়নগর ব্লক-১ এর অন্তর্গত ধোসা-চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান (পুরুষ) এস. ইউ. সি. আই দলভুক্ত। আর উপ প্রধান (পুরুষ) তৃণমূল দলভুক্ত। ফলে এই পঞ্চায়েতে চলছে দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতি। সেই সঙ্গে উন্নয়নও হচ্ছে ব্যহত। একথা জানিয়েছেন সদস্যারাই।

পঞ্চায়েতের উচ্চস্তরে মহিলা

ত্রিস্তর ভিত্তিক স্থানীয় স্ব-শাসন ব্যবস্থায় সাধারণত গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সদস্যারাই উচ্চতর পঞ্চায়েত সমিতি এবং সর্বোচ্চ জেলা পরিষদ স্তরে নির্বাচিত হন। আর এ দুটি স্তরেই স্বাভাবিক কারণেই থাকে শিক্ষার বিশেষ অগ্রাধিকার। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহকারি সভাপতি এবং জেলা পরিষদ-এর সভাধিপতি ও সহকারি সভাধিপতি ছাড়াও এ দুটি স্তরের প্রত্যেকটিতে উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদনের জন্য ১০টি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ-এর আসন গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য যে ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে কিছু মহিলা এসব গুরুত্বপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং এরা সকলেই পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। উদাহরণ রূপে বলা যায় যে সমীক্ষিত জেলাগুলির মধ্যে মেদিনীপুর জেলার সাঁকরাইল পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী রেবা রানি দে (মাধ্যমিক - বয়স ৪০ উর্ধ্ব) একটি রাজনৈতিক দল ও তার মহিলা শাখার সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত আছেন, এবং ১৯৯৩ সালে একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত উপ-প্রধান (সুবক্তা ও সপ্রতিভ) ছিলেন। ১৯৯৮ সালে সমিতির সভানেত্রীর পদে নির্বাচিত হয়ে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছেন। অনুরূপে দক্ষিণ ২৪-পরগণার ফলতা পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী শিপ্রা মিদ্যা (তপশিলী জাতি, বি. এ., বয়স ৩৫ বছর) একটি রাজনৈতিক দলের দীর্ঘদিনের সক্রিয় কর্মী এবং ১৯৯৩ সালে গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিতা সদস্যা ছিলেন। ১৯৯৮ সালে সমিতির সভানেত্রীর আসনে নির্বাচিত হয়েছেন। আরও উল্লেখ্য হুগলি জেলার চণ্ডিতলা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী চায়না চ্যাটার্জীর (ব্রাহ্মণ, বি. এ. বি টি, অবসরপ্রাপ্ত স্কুল

শিক্ষিকা এবং দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক দলের কর্মী) কথা, যিনি ১৯৮৮ সালে গ্রাম পঞ্চায়েতের মনোনীত সদস্য ছিলেন। পরে ১৯৯৩ সালে নির্বাচিত সদস্যারূপে সমিতির কর্মাধক্ষ (তৎকালীন ক্ষুদ্র শিল্প, জনকল্যাণ ও ত্রাণ) নির্বাচিত হন, এবং পরে ১৯৯৮ সালে সমিতির সভানেত্রী নির্বাচিত হয়ে ঐ আসনটিকে প্রকৃত অর্থেই অলংকৃত করছেন। অমায়িক, মৃদুভাষী এই মহিলা অনেকখানি ব্যক্তিগত উদ্যোগে একটি বালিকা বিদ্যালয়ও গড়ে তুলেছেন। আরও উদাহরণ নিস্প্রয়োজন, তালিকা দীর্ঘ হবে। তবে উল্লেখ্য যে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ১৬ টি জেলার মধ্যে (দার্জিলিং এবং সম্প্রতি সৃষ্ট ৩টি জেলা বাদ দিয়ে) ৭টিতে (বাঁকুড়া, কুচবিহার, হাওড়া, জলপাইগুড়ি, মালদা, উত্তর ২৪-পরগণা এবং দক্ষিণ ২৪-পরগণা) জেলা পরিষদ-এর সভাধিপতি পদে আসীন আছেন ৭জন মহিলা। আর সেই সঙ্গে ৫টি জেলাপরিষদ-এর (দক্ষিণ দিনাজপুর, হাওড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া এবং উত্তর দিনাজপুর) সহকারি সভানেত্রীর আসনেও আছেন মহিলা। এরা প্রায় সকলেই পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। সুতরাং বলা যায় না যে পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় স্ব-শাসন ব্যবস্থায় উচ্চস্তরেও দক্ষ মহিলার কোন অভাব আছে।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন, স্থানীয় স্ব-শাসন ব্যবস্থায় মহিলাদের রাজনৈতিক যোগ্যতা সম্পর্কে কোন সমস্যা যদি থাকে, তবে তা আছে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে নতুন আসা সদস্যাদের নিয়ে, এবং তা হল প্রধানত অশিক্ষা এবং অনভিজ্ঞতা প্রসূত সমস্যা। তবে প্রথাগত স্কুল কলেজের শিক্ষা অপেক্ষা মনে হয় রাজনীতিতে ব্যবহারিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি, যা অর্জন করতে হয় কঠিন বাস্তব পরিস্থিতির মাধ্যমে। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে এ রকম অনেক সদস্যা আছেন যাদের প্রথাগত শিক্ষা স্কুলের নীচু শ্রেণীর মধ্যে সীমিত হলেও পরবর্তীকালে অনেকখানি শিক্ষা তারা নিজগুণে ও চেষ্টায় অর্জন করে নিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, দক্ষিণ ২৪-পরগণার জয়নগর ব্লক-১এর ধোসা-চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক প্রবীণ সদস্যা নিজেই জানিয়েছেন যে তিনি কোনদিন স্কুলের দরজার ভিতরে পা রাখেন নি, কিন্তু পরবর্তী জীবনে বাড়িতে বসে অনেকখানি পড়াশুনা শিখেছেন। ইনিও খুব সপ্রতিভ এবং স্থানীয় রাজনীতি সম্পর্কে অনেক খবরই রাখেন। ইচ্ছা এবং উদ্যোগের সমন্বয়ে অশিক্ষা ও অনভিজ্ঞতার সমস্যাকে অচিরেই অতিক্রম করা অসম্ভব নয়। বড় কথা

হল এই যে পঞ্চায়েতের সদস্যারা তাদের এই সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। আর এদের উৎসাহ এবং উদ্দীপনারও কোন অভাব নেই। অনেক মহিলাই নানাভাবে যা বলতে চেয়েছেন, তা একজন সদস্যা বলেছেন স্পষ্ট ভাষায়, " কুয়োর ব্যাঙ একবার যখন পঞ্চায়েতে এসেছি, আর ফিরে যাবো না। লক্ষ্য এখন সামনের দিকে।" এ বিষয়ে তারা দৃঢ়মনস্ক। মনে হয় বাড়ির আবদ্ধ পরিবেশের বাইরে এসে এক ধরনের মুক্তির স্বাদও তারা অনুভব করছেন। এই অনুভব ও দৃঢ় মনস্কতাই মহিলা সদস্যদের চলার পথে বড় পাথেয়।

পাদটীকা

(১) Neil Webster,*Panchayatı Raj and Decentralisation of Development Planning in West Bengal (A case study),* K.P.Bagchi & Company, Calcutta,1992; Kristeen Wester-gaard, *People's Participation, Local Government and Rural Devlopment ; The case study of West Bengal,* Centre for Devlopment Research, Copenhagen,1986;Krishna Chakravarty, *Leadership, Faction, and Panchayati Raj · A Case Study of West Bengal,* Rawat Publications, Jaipur, 1993, Nirmal Mukherjee and Debabrata Bandopadhyay, *New Horizon for West Bengal's Panchayats, Government of West Bengal,* 1993.

(২) Neil Webster, *ঐ*, pp.51-52

(৩) *ঐ*, PP. 61 and 63

(৪) G.K. Lienten, "Caste, Gender and class in panchayat: case of Bardhaman, West Bengal," *EPW*, 18 July, 1992,,PP, 1567-1574,

(৫) Girish Kumar and Buddhadeb Ghosh, *West Bengal Panchayat Elections,1993, A Study in Participatian,* Institute of Social Sciences and Concept Publishing Company, 1996, P.15

(৬) *Socio-Economic Profile of Panchayat Members : South 24-Parganas* State Institute of Panchayats and Rural Development, West Bengal, Nadia, 1997, P.26; *Socio-Economic Profile of Panchayat Members: Birbhum,* Government of West Bengal, Nadia, 1996, P 25; and *Socio-Economic Profile of Panchayat Members : Nadia,* Government of Bengal, Nadia, 1996, PP. 25

(৭) *Ibid* , *24-Parganas,* P. 26; *Birbhum,* P. 26; and *Nadia,* P. 26

(৮) *Ibid, 24-Parganas,* P. 24.

(৯) *Ibid, Birbhum*, P. 14; and *Nadia*, P. 14.

(১০) G.K. Lienten. *op. cit.*

৮

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েতে নারী ঃ আর্থসামাজিক নবদিগন্ত

১৯৯৩ সাল থেকে পঞ্চায়েতের ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশ আসনে নারীরা প্রবেশাধিকার লাভ করার সাথে সাথে গ্রামাঞ্চলে নারীদের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচীও নূতন গুরুত্ব লাভ করেছে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গে গ্রামোন্নয়নের সমস্ত কাজে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে পঞ্চায়েতকে যুক্ত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারি উন্নয়নমূলক কর্মসূচীগুলি রূপায়িত করার ব্যাপারেও পঞ্চায়েতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এ বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যাদের প্রধান কর্তব্য হল এই কর্মসূচীগুলি সম্বন্ধে গ্রামের সাধারণ মহিলাদের সচেতন করা এবং সম্ভবস্থলে তাদের উন্নয়নে সাহায্য করা। এ বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির ভূমিকাও যথেষ্ট। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত বিভাগের ইনস্টিটিউট অফ পঞ্চায়েতস অ্যাণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের অল্প শিক্ষিত নবাগত সদস্যা এবং গ্রামাঞ্চলের সাধারণ নারীদের জন্য উপযোগী করে সরল ভাষায় লিখিত পঞ্চায়েত বিষয়ক কয়েকটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছে।[১] আর সেই সঙ্গে এই ইন্সস্টিটিউট-এর পক্ষ থেকে আছে বিভিন্ন স্তরের পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যা, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং কর্মাধ্যক্ষ প্রভৃতি সকলের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। সমীক্ষিত অনেক পঞ্চায়েত সদস্যা-ই এখান থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। আরও উল্লেখ্য যে পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরেই এক-তৃতীয়াংশ আসনে নারীরা অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাওয়ার পর এখনও এক দশক অতিক্রান্ত না হলেও এরই মধ্যে তার প্রভাব অনুভূত হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে। এখানে প্রথম অনুচ্ছেদে গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে নারীর অংশগ্রহণ এবং নারীর শিক্ষা ও আর্থিক উন্নয়ন

বিষয়ে আলোচনা করা হবে। আর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আলোচিত হবে আর্থসামাজিক অগ্রগতির প্রশ্নটি। এই পরিচ্ছেদটি প্রধানত লেখিকার ব্যক্তিগত সমীক্ষা নির্ভর, যে সমীক্ষা বিষয়ে ভূমিকায় বলা হয়েছে।

উন্নয়নমূলক কর্মসূচী ও নারী

সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য রেখে ৭৩তম সংবিধান সংশোধনিতে নারীর সর্বাধিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আর একই উদ্দেশ্যে প্রধানত দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী নারী পুরুষের উন্নতিকল্পে পশ্চিমবঙ্গে অনেকগুলি কর্মসূচী রূপায়িত করার প্রচেষ্টা চলছে। সবগুলির আলোচনা এখানে উদ্দেশ্য নয়। যেসব কর্মসূচীর সাথে নারী এবং তার জীবন প্রত্যক্ষ এবং গভীরভাবে যুক্ত, শুধু সেগুলি নিয়েই এখানে আলোচনা করা হবে।

শিক্ষা

সংবিধানের ৭৩ তম সংশোধনিতে বিদ্যালয়ের প্রাথমিক (পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত) ও মাধ্যমিক (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) শিক্ষা, বয়স্ক ও প্রথা-বর্হিভূত শিক্ষা, গ্রন্থাগার ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ পঞ্চায়েতের অধিকারভুক্ত বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন অনুসারেও শিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনা ও রূপায়ণ পঞ্চায়েতের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের সাথে শুধু গ্রাম পঞ্চায়েতই নয়, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদও জড়িত থাকে। পঞ্চায়েত সমিতিতে এবং জেলা পরিষদে যে ১০টি করে স্থায়ী সমিতি থাকে, তার মধ্যে ২টি প্রত্যক্ষভাবে নারী ও শিশু কল্যাণের সাথে যুক্ত। এ দুটি হল ঃ শিশু, নারী কল্যাণ ও ত্রাণ এবং (২) শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে দুটি স্তরেই এই দুটি স্থায়ী সমিতির কর্মাধক্ষার পদে আসীন আছেন নির্বাচিত মহিলা। নারীর জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকে শিশুরা। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এ রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের যে নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প-এর (Integrated Child Development Services আই. সি. ডি. এস) অন্তর্গত কর্মসূচীতে ৩-৫ বছর বয়সের শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষার ব্যবস্থা। প্রাক্‌- প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র অথবা অঙ্গনওয়াড়ি

কেন্দ্রগুলির দেখাশোনার দায়িত্ব হল পঞ্চায়েতের। শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করার জন্য নিযুক্ত অঙ্গনওয়াড়ি মহিলা কর্মী ও সহকর্মীগণ (যথাক্রমে যাদের মাসিক সাম্মানিক সাত শ পঞ্চাশ টাকা এবং পাঁচশ টাকা) সাধারণত পঞ্চায়েত সদস্যা এবং গ্রামের সাধারণ মহিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। সমীক্ষায় একথা স্পষ্ট হয়েছে যে পঞ্চায়েত সদস্যারা বয়স্ক নারীদের অপেক্ষা শিশুদের শিক্ষা সম্বন্ধে এখন বেশি সচেতন ও চিন্তিত। নিজেদের জীবনের অশিক্ষার পুনরাবৃত্তি তারা নিজের সন্তানের ভিতরে দেখতে চান না। এই কর্মসূচীতে শিশুদের সুসংহত বিকাশের জন্য শিশু এবং তার মায়ের খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়েও লক্ষ্য রাখা হয়। তাছাড়া, এই কর্মসূচীর আরেকটি লক্ষ্য হল বিশেষ করে তপশিলী অথবা বংশে আগে কেউ লেখাপড়া শেখেনি, এমন পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার আওতায় আনা।[২] গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য/সদস্যা এবং গ্রামের সাধারণ মহিলাদের বিশেষ আগ্রহের ফলে গ্রামাঞ্চলে আই. সি. ডি. এস. কার্যক্রম প্রশংসনীয়ভাবে এগিয়ে চলেছে। ইদানীং কিছু শিশু কেন্দ্রে (যেখানে ১ মাইলের মধ্যে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 'মুখ্য অনুপ্রেরক' এবং 'অনুপ্রেরক'-এর (যাদের মাসিক সাম্মানিক যথাক্রমে ৮০০ টাকা এবং ৩০০টাকা) তত্ত্বধানে ৬ বছর বয়সের ঊর্ধ্বে শিশুদের দিনের মধ্যে ৩ ঘন্টা খেলার মাধ্যমে কিছু পড়াশোনা শেখানো এবং খাবার দেবার ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থা মূলত গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র কর্মী মায়েদের জন্য প্রচলিত হয়েছে, অনেকটা ক্রেশ-এর মতো।

শিক্ষা বিষয়ক গণ সাক্ষরতা কর্মসূচীর কথা সকলেরই জানা। এর দায়িত্বে থাকেন জেলা সাক্ষরতা সমিতি। সাক্ষরতা কর্মসূচীর সাথেও পঞ্চায়েত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কিন্তু এই কর্মসূচী ত্রুটিমুক্ত নয়। সাক্ষরতার অর্থ হল শুধুমাত্র নিজের নামটুকু সই করতে পারা। তার বেশি কিছু নয়। মেদিনীপুর জেলার সাঁকরাইল ব্লকের সাঁকরাইল গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা শ্রীমতী লতা সিং (তপশিলী উপজাতি) দু বছর আগে নবসাক্ষর হয়েছেন, কিন্তু এরপরে তার পড়াশুনা আর এগোয়নি একথা জানালেন নিজেই। অভ্যাসের অভাবে যেটুকু শিখেছিলেন তাও ভুলে যাবার সম্ভাবনা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ইদানীং সাক্ষর-উত্তর পাঠক্রমে যুক্ত করা হয়েছে ৬-১৪ বছর বয়সী বালক বালিকা এবং বয়স্ক নারী পুরুষের জন্য প্রবহমান প্রথা-বহির্ভূত (অল্প সময়ের মধ্যে শেখার মতো) শিক্ষা। এই কর্মসূচীর মধ্যে দলছুট বা ড্রপ-আউট বালক-বালিকা, অর্থাৎ যারা দারিদ্র অথবা অন্য কোন কারণে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে

অপারগ হয়, তাদেরও অন্তর্ভূক্ত করা হয়। বর্তমানে শুধু মহিলারাই এই শিশুশিক্ষা কেন্দ্রে "শিক্ষা সহায়িকা" হতে পারেন। শিশু শিক্ষা পরিচালন সমিতির দ্বারা অন্যূন মাধ্যমিক পাশ মহিলারা সাম্মানিক বাবদ মাসিক ১ হাজার টাকায় 'শিক্ষা সহায়িকা' নিযুক্ত হন। উল্লেখ্য যে অনেক ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের সদস্যারাই 'শিক্ষা সহায়িকার' পদে নিযুক্ত আছেন। আগে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষিকার কোন সাম্মানিক অর্থ ছিল না। তারা স্বেচ্ছাসেবী রূপে পড়াতেন। কিন্তু এখন সাম্মানিক অর্থ দেওয়া হয়। এ বিষয়ে কিছু অভিযোগও উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ, ডায়মণ্ড হারবার ব্লক-২এর মাধ্যমিক পাশ এক সদস্যার অভিযোগ, "আগে আমি স্বেচ্ছাসেবী হয়ে পড়িয়েছি। কিন্তু এখন অন্য একজনকে নিযুক্ত করা হয়েছে, সে ১ হাজার টাকা করে পাচ্ছে। তাহলে আমি যে এতদিন পড়ালাম,—এটা ঠিক হচ্ছে না।" অনেকটা এই সুরেই হুগলি জেলার পাণ্ডুয়া পঞ্চায়েত সমিতি থেকে জেলা পরিষদে নির্বাচিত সদস্যা অপর্ণা মল্লিক (সি. পি. আই এম-এর সারাক্ষণের কর্মী) অভিযোগ করে বলেছেন, "আগে যারা সাক্ষরতায় পড়াতো, তখন কোন টাকা ছিল না। এখন তারা অনেকে পড়াতে পারছে না। টাকা দেওয়ার ফলে শিক্ষকের পদে এখন অনেক দাবিদার হয়েছে। আগে যারা স্বেচ্ছাসেবী হয়ে পড়িয়েছে, এখন তাদেরই আগে দেওয়া উচিত।" এই বক্তব্যের মধ্যে অবশ্যই যৌক্তিকতা আছে। কিছু কিছু অঞ্চলে স্কুলের শিক্ষার সাথে সাথে পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে পাঠাগার স্থাপন এবং ছেলেমেয়েদের জন্য শরীরচর্চা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাগর পঞ্চায়েত সমিতির 'শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া' বিষয়ক কর্মাধ্যক্ষা জানালেন যে তার সমিতির এলাকায় "গত ১ বছরে ২টি পাঠাগার হয়েছে,এখন আরও ৪টি পাঠাগারের জন্য প্রস্তাব গিয়েছে। এখানে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে প্রত্যেক বছর পরীক্ষায় কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। আর সেই উপলক্ষ্যে স্থানীয় স্কুলের ছেলেমেয়েদের দিয়ে নাচগান করানো হয়। নতুন শিশু শিক্ষা কেন্দ্র হয়েছে অনেকগুলি।" বিভিন্ন জেলার অনেক ব্লকেই এরকম বহু শিশু শিক্ষা কেন্দ্র আছে, আর সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনেক পাঠাগার।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও প্রায় প্রতিটি ব্লকেই বিভিন্ন বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (এন. জি. ও) পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে গ্রামাঞ্চলে নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজে নিযুক্ত আছে। প্রধানত সাক্ষরতা, নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য এবং পাঠাগার স্থাপন বিষয়ক কাজের সাথেই এসব স্বেচ্ছাসেবী

সংস্থা যুক্ত থাকে। কখনও কখনও রাস্তাঘাটও নির্মাণ করে। কিন্তু এদের কার্যসূচীর কোন নিশ্চয়তা থাকে না। অনেক সময় কিছুদিন কাজ করার পর উঠেও যায়। গ্রামীণ উন্নয়নের কথা চিন্তা করে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির কাজকর্মের সাথে সহযোগিতা করেন।

এখানে একথা উল্লেখ করলে মনে হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে শিক্ষাকে কেন্দ্র করে শিক্ষিকার পদ ছাড়াও অন্য আরও কিছু কিছু কর্মনিযুক্তির সুযোগ ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ, কুলটিকরি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা যমুনা সিং (তপশিলী উপজাতি) শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে রান্না করেন মাসিক চারশ টাকা বেতনে। একই গ্রাম পঞ্চায়েতের আরেকজন সদস্যা সন্ধ্যা পয়রা (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষিত) মেয়েদের স্কুল হস্টেলে রান্না করেন মাসে সাত শ পঞ্চাশ টাকা বেতন এবং আহারের বিনিময়ে। তিনি বেশ সন্তুষ্টই আছেন বলে মনে হয়। দক্ষিণ ২৪-পরগণার জয়নগর ব্লক-১ এর ধোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক সদস্যাও (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষিত) শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে রান্না করেন। এ রকম উদাহরণ আরও আছে। আর মেদিনীপুর জেলার সাঁকরাইল পঞ্চায়েত সমিতির 'শিশু, নারী, জনকল্যাণ ও ত্রাণ' বিষয়ক কর্মাধ্যক্ষ (নবম শ্রেণী) মেয়েদের স্কুল হস্টেলের সুপারিনটেনডেন্ট নিযুক্ত আছেন ১৮শ টাকা বেতনে। পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদ-এর কর্মাধ্যক্ষাগণও যথাক্রমে মাসিক ১২শ টাকা এবং ১৮শ টাকা সাম্মানিক পান। আর সঙ্গে থাকে যাতায়াত বাবদ ভাতা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাকে কেন্দ্র করে যেসব কর্মসংস্থান হচ্ছে, তার অনেকখানি উপকারভোগী হচ্ছেন পঞ্চায়েত সদস্যারা। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, গ্রামাঞ্চলের সাধারণ নারীরা এখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছেন কতটুকু?

স্বাস্থ্য ও আবাসন

ঘোষিত নীতি অনুযায়ী পরিবার পরিকল্পনা, গ্রামাঞ্চলের নারীপুরুষের এবং বিশেষত শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষা, শিশুমৃত্যু হার রোধ করা, প্রসূতি মায়েদের (শিশুর জন্মের পর ৬ মাস বয়স পর্যন্ত) স্বাস্থ্য ও পুষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখা, যেসব অসুখ বেশি হয়, তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা এবং পানীয় জল সরবরাহ, জলনিকাশী ব্যবস্থা, মলমূত্র ত্যাগের স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা ও ধুয়াহীন চুলার প্রবর্তন করা প্রভৃতি সব কিছুর সঙ্গেই যুক্ত থাকে পঞ্চায়েত। স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে শিশুরাই অগ্রাধিকার পায়।

উপরোক্ত সুসংহত শিশু বিকাশ কর্মসূচীতে (আই. সি. ডি. এস) গর্ভবতী নারী, প্রসূতি মা এবং ৬ মাস থেকে ৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর পরিপূরক পুষ্টি, প্রতিযেধক টিকা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে লক্ষ্য রাখাও উদ্দেশ্য। পঞ্চায়েত সদস্যারা এসব কর্মসূচীর সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত থাকেন। দরিদ্র পরিবারে গর্ভবতী মায়ের পুষ্টিকর খাদ্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং শিশু জন্মাবার পর তার নথিভুক্তিকরণ ও শিশুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মায়েদের অবহিত করা, যথা সময়ে পোলিও টিকা খাওয়ানো এবং সর্বোপরি জন্মনিয়ন্ত্রণ বিষয়ে তত্ত্বাবধান করাও পঞ্চায়েত সদস্যাদের কাজের মধ্যেই পড়ে। পঞ্চায়েত সদস্যাদের মাধ্যমে গ্রামের সাধারণ নারীরা এসব বিষয়ে ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠছেন। আর এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'জনস্বাস্থ্য ও পঞ্চায়েত' নামক পুস্তিকাটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

অধিকাংশ পরিবারে কন্যা শিশুর জন্ম আজও অবাঞ্ছিত, বিশেষত সে পরিবার যদি হয় দরিদ্র। এই প্রেক্ষিতে, কন্যা সন্তানের প্রতি উপেক্ষা ও অনাদর প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে দরিদ্র পরিবারে ১৯ উধর্ব বয়সী মায়েদের ২টি পর্যন্ত কন্যাসন্তানের জন্য পাঁচশ টাকা করে সাহায্য দেওয়ার কর্মসূচী (বালিকা সমৃদ্ধি যোজনা) গৃহীত হয়েছে। অন্তত কিছু কিছু জায়গায় এই কর্মসূচী যে রূপায়িত হয়, তার প্রমাণ আছে। সাগর ব্লকের রুদ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের জনৈকা সদস্যার দাবি অনুযায়ী ঐ এলাকায় ২ জন দরিদ্র পরিবারের মহিলা "মেয়ে জন্মাবার পর পাঁচ শ টাকা করে পেয়েছে।" চাকদহ ব্লক-এও এরকম উদাহরণ আছে।

পরিবারের স্বাস্থ্যরক্ষার সাথে জড়িত আছে উপযুক্ত শৌচাগারের ব্যবস্থা। পরিবারের স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে দরিদ্র পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ও ধুয়াহীন চুলা বসাবার কর্মসূচী আছে। এ রাজ্যে প্রায় প্রতিটি পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকেই এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে মানুষের, বিশেষত দরিদ্র মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতনতার অভাব এখনও অতি প্রকট। "তারা এর অর্থ ও প্রয়োজনীয়তা বোঝে না। আমাদের দেওয়া অনেক পায়খানা নষ্ট হয়ে গেছে। সেগুলো চৌকির তলায় নোংরা হয়ে পড়ে আছে অথবা বিক্রি করে দিচ্ছে," জানালেন সাগর ব্লক-এর ধসপাড়া-সুমতিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীমতী ঝর্ণা মণ্ডল। সেই সঙ্গে তিনি আরও বললেন, "আগে অভিজ্ঞতা ছিল না। এবার এই কর্মসূচী থেকে ২২ শ টাকা করে দিয়েছে। তা দিয়ে তৈরী পায়খানা আমরা ওদের বাড়িতে বসিয়ে দিয়ে এসেছি। ওদের কাছে দিইনি।"

মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার সাথে জড়িত আছে স্বাস্থ্যসম্মত আবাসনের প্রশ্ন। বাস্তুহীন পরিবারকে একটি নিশ্চিত আশ্রয় দানের জন্য অথবা সামাজিক কারণে নির্যাতিত নারী ও পুরুষ, দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থিত বিধবা-প্রধান পরিবার, অবিবাহিত মহিলা প্রধান পরিবার অথবা প্রাকৃতিক কারণে পর্যুদস্ত পরিবারকে নিজশ্রমে আবাসন নির্মাণের কর্মসূচীও (ইন্দিরা আবাস যোজনা) পঞ্চায়েতের মাধ্যমেই রূপায়িত করা হচ্ছে। এই কর্মসূচীতে সম্ভাব্য উপকারভোগীকে নিজশ্রমে আবাসন (দুটি ঘর, স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার এবং ধুয়াহীন চুলা সমেত) নির্মাণের জন্য ২০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয় এবং পরবর্তীকালে আবাসন মেরামতির জন্য দেওয়া হয় ১৮ শ টাকা। শর্ত অনুযায়ী আবাসনের সঙ্গে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার এবং ধুয়াহীন চুলা না থাকলে সম্পূর্ণ টাকা দেওয়া হয়না। তদারকির দায়িত্বে থাকেন পঞ্চায়েতের সদস্য/সদস্যারা। সমীক্ষিত প্রায় সব ব্লকেই এই আবাসন কর্মসূচী রূপায়িত হয়েছে, এবং এখনও হচ্ছে। পঞ্চায়েতের সদস্যারাই জানিয়েছেন যে দারিদ্রসীমার নীচে বহু মানুষ এই আবাসনের সুবিধা পেয়েছেন। এ বিষয়ে বহু পরিসংখ্যানও আছে।

উল্লেখ্য যে এই আবাসন প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল শুধু স্ত্রী অথবা স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে আবাসনটি বরাদ্দ করা, যাতে এই আবাসনে শুধু স্বামীর একচেটিয়া মালিকানা না থাকে। পঞ্চায়েতের মহিলা সদস্যাদের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নিয়ে কোন কোন অঞ্চলে আবার যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে এখন স্ত্রীর নাম আগে লিখিয়ে পরে স্বামীর নাম লেখানো হচ্ছে যাতে মালিকানার ক্ষেত্রে স্ত্রীর অগ্রাধিকার সূচিত হয়। প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ্য, যেসব অঞ্চলে এখনও কৃষি জমিতে পাট্টা দেওয়ার কাজ চলছে, সেখানে পাট্টা দেওয়া হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে।

কর্ম নিযুক্তি

দরিদ্র কৃষি শ্রমজীবীদের জন্য কর্মহীন মরশুমে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বছরে অন্তত ১০০ দিন অদক্ষ শ্রমের বিনিময়ে আয়ের নিশ্চয়তা দানের (মজুরি) যে কর্মসূচী (Employment Assurance Scheme-ই.এ.এস) প্রচলিত হয়েছে, তাতে দারিদ্রসীমার নীচে মহিলারাও উপকারভোগী। এই কর্মসূচিটি আগের জওহর রোজগার যোজনার পরিবর্ত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। রাস্তাঘাট তৈরী উপলক্ষ্যে মাটি কাটা, ইট ফেলা, মোরাম করা, এবং বিদ্যালয় ও পাঠাগার স্থাপন প্রভৃতি নির্মাণ কাজ, পুকুর কাটা, খাল কাটা, খাল ও পুকুর সংস্কার করা, নলকূপ স্থাপন করা প্রভৃতি

কাজে অদক্ষ শ্রমিক রূপে পুরুষ এবং নারীদের এখানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আছে। এই বিষয়ে বার্ষিক পরিকল্পনা, কর্মসূচীর অগ্রাধিকার নির্বাচন প্রভৃতির দায়িত্ব পঞ্চায়েত সমিতির উপর ন্যস্ত। ই.এ.এস কর্মসূচীর আওতায় প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির জন্য মোটা অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ থাকে। আর সেই সঙ্গে থাকে ব্যাংকের ঋণ ও অনুদানের ব্যবস্থা। পঞ্চায়েত সমিতি সম্ভাব্য উপকার প্রাপকদের কমিটি গঠন করে কাজের দায়িত্ব তাদের উপরই দিয়ে দেন। এই কর্মসূচীতে কন্ট্রাকটর নিযুক্ত করা নিয়ম বিরুদ্ধ। কিন্তু অনেক সময় উপকার প্রাপকরা নিজেরা কাজ না করে কন্ট্রাকটার নিযুক্ত করেন। আর তখনই প্রশ্রয় পায় আর্থিক দুর্নীতি। আর মহিলারা প্রায় সমান কাজ করেও (তপশিলী উপজাতিভুক্ত কঠিন পরিশ্রমী মহিলারাও) পুরুষদের সমান মজুরি পান না। বিভিন্ন অঞ্চলে এই মজুরির পার্থক্যও লক্ষিত হয়েছে। চণ্ডীতলা ব্লক-১এ কর্ম নিশ্চয়তা কার্যসূচীতে দিনে ৫০ টাকা মজুরি নির্ধারিত আছে নারী পুরষ সকলের জন্য। আর বোলপুর-শ্রীনিকেতন ব্লক-এ এই মজুরি দিনে ৫৬ টাকা। আবার ডায়মণ্ড হারবার ব্লক-১এ মজুরি ৩৫-৪০টাকা। এসব তথ্য জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্লক-এর মহিলা সদস্যারা। কিন্তু কন্ট্রাকটরকে দিয়ে কাজ করালে নারীপুরুষের মজুরির কোন নিশ্চয়তা থাকে না। অবশ্য এজন্য মূলত দায়ী হলেন সম্ভাব্য উপকারভোগীরা, যারা দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে কন্ট্রাকটারের কাছে কাজটি রূপায়ণের দায়িত্ব ছেড়ে দেন। উল্লেখ্য যে পঞ্চায়েতের মহিলা সদস্যারাও কাজের ক্ষেত্রে গিয়ে পরিদর্শন করেন কাজ চলছে কিনা এবং জিনিষপত্র ঠিকমতো ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা। বিভিন্ন পঞ্চায়েতের সদস্যারা নিজেরা এই পরিদর্শকের কাজ করেন বলে জানিয়েছেন।

খরা প্রবণ অঞ্চলে এই কর্মসূচীতে অন্তত ৫০ শতাংশ ক্ষুদ্র জল বিভাজিকা ভিত্তিক উন্নয়নে (ক্ষুদ্র জল বিভাজিকাকে ভিত্তি করে প্রধানত ভূমি, জল, বনসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষণ ও যথাযথ ব্যবহার) ব্যয় করা বাধ্যতামূলক। সমীক্ষিত জেলাগুলির মধ্যে মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমার অন্তর্গত ৭টি ব্লক-এ (বিনপুর বাদ দিয়ে) এই কর্মসূচী প্রচলিত আছে। সাঁকরাইল পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী রেবা রানি দের দাবি অনুসারে ১৯৯৯-২০০০ সালে কর্ম নিশ্চয়তা কার্যসূচীতে ৩৬ লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন, এবং এর মধ্যে ৫০ শতাংশ ব্যয় করেছিলেন বাঁধ, পুকুর, কুয়ো, গভীর নলকূপ প্রভৃতির জন্য। বাকি টাকা শিক্ষা বাবদ খরচ করা হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে গ্রামের নারী পুরুষের যে কর্ম

নিযুক্তি ঘটে, তা সম্পূর্ণই সাময়িক। কর্মনিযুক্তির কোন স্থায়িত্ব থাকে না। আর দরিদ্র শ্রমজীবী পরিবারের মাত্র ১ জন সদস্যের জন্যই এই কর্মনিযুক্তির ব্যবস্থা আছে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে কর্মহীন মরশুমে অল্পসংখ্যক শ্রমজীবীই এই কর্মসূচির দ্বারা উপকৃত হন। তাছাড়া, প্রায় সব অঞ্চলেই এই কর্মনিযুক্তি প্রকল্পে সরকারি অর্থ বরাদ্দের অনেকাংশই ব্যয়িত হয় না। এসব ত্রুটি বিদূরিত হলে দরিদ্র নারীপুরুষের সাময়িক উপার্জনের পথ আরও সুগম হবে।

স্বনির্ভর উৎপাদন ও আয়

কেন্দ্রীয় সরকারের 'স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা'র (এস. জি. এস. ওয়াই) মাধ্যমে পঞ্চায়েত সমিতি থেকে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র পরিবারের নরনারীকে স্থায়ীভাবে কিছু উৎপাদনের মাধ্যমে স্থায়ী আর্থিক স্ব-নির্ভরতার পথে এগিয়ে দেবার প্রচেষ্টাও চলছে। পূর্বের সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পের (আই. আর. ডি. পি.) পরিবর্তরূপে এস. জি. এস. ওয়াই কর্মসূচীটি মহিলাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী বলে মনে হয়। এই কর্মসূচীর সাথে কোথাও কোথাও আবার পূর্বেকার 'ডোকরা' (Development of Women and Children – DWCRA) কর্মসূচীর সমন্বয়ে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র পরিবারের নারীদের ১০-১৫ জনের ছোট ছোট দল তৈরী করে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে দলভিত্তিক কোন বিশেষ দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রি করতে পঞ্চায়েত থেকে উৎসাহ দেওয়া হয়। এ বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা ও প্রধান এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির বিশেষ দায়িত্ব থাকে। সম্ভব স্থলে বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল দ্রব্যই উৎপাদনের জন্য অগ্রাধিকার পায়। প্রয়োজনে ব্যাংক ঋণ দিয়েও কাঁচামাল কেনা, ঘর ভাড়া এবং উৎপাদিত জিনিষ বিক্রির ব্যবস্থা করা যায়। পঞ্চায়েত সদস্যারা স্থানীয় মহিলাদের নিয়ে ছোট ছোট দল তৈরী করা থেকে শুরু করে ব্যাংক ঋণ পেতে সাহায্য করা, উৎপাদনের দ্রব্য নির্বাচন করা এবং উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করা, সব কিছুতেই সাহায্য করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর (কল্যাণী, নদীয়া) কর্তৃক সরলভাষায় প্রকাশিত 'জোট বাঁধার গপ্পো' নামক পুস্তিকায় ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে গ্রামের মহিলাদের এ বিষয়ে সচেতন করার প্রয়াস চলছে। কোন কোন অঞ্চলে এ বিষয়ে ভালোই কাজ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মেদিনীপুরের কিছু কিছু গ্রামে ১০জন করে দরিদ্র নারীর সেল্ফ হেল্প গ্রুপ গড়ে তোলা হয়েছে। ছোট ছোট দলের মহিলারা ৬ মাসের সঞ্চয় ব্যাংকে জমা

দিয়ে পরিবর্তে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সেলাই মেশিন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি কিনে স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করছেন। বোলপুর-শ্রীনিকেতনে চলছে কাঁথাস্টিচ, বাটিক, এম্ব্রয়ডারি ও টেলারিং-এর কাজ। পঞ্চায়েত সমিতির অফিসের পাশেই গড়ে ওঠা এই টেলারিং কেন্দ্রে মাসে দুশ টাকা ভাতা দিয়ে মহিলাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও আছে। ওখানকার এম্ব্রয়ডারি ও টেলারিং-এর দ্রব্য সামগ্রী কলকাতার বস্ত্রমেলায় পর্যন্ত বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। হুগলি জেলার চণ্ডীতলা পঞ্চায়েত সমিতি-১এ ১৯৯৮-২০০১ সালে 'জাগরণী ডোকরা' দলের মহিলারা জুট ও ফোম লেদারের ব্যাগ, ব্লক প্রিন্টিং এবং টেলারিং-এর মাধ্যমে পেটিকোট, ব্লাউজ ইত্যাদি তৈরী করে কিছুটা স্বনির্ভর হয়ে উঠেছেন। একথা জানালেন এই (ব্লক-এর) পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী চায়না চ্যাটার্জী। চণ্ডীতলা-২এ চলছে বাটিক ও ব্লক প্রিন্টিং এর সাথে আচার, পাঁপড়, মুড়িভাজা ইত্যাদির কর্মসূচী। ডায়মণ্ডহারবার ব্লক-২এ কাজ হচ্ছে জালবোনা ও পশুপালনকে (হাঁস, মুরগী, পোল্ট্রি) কেন্দ্র করে। আর সঙ্গে আছে বই বাঁধাই -এর কাজ। তবে আলোর নীচেই থাকে অন্ধকার। কোথাও কোথাও মহিলাদের এই দলবদ্ধ উৎপাদন শুরু হয়েও বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে অনেক জায়গায় 'ডোকরা' কর্মসূচী উঠে গেছে। সাগর ব্লক-এর রামকরচক গ্রাম পঞ্চায়েতের সুরবালা দাস-এর অভিযোগ যে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করতে গিয়ে মহিলারা "নিজেরাই অনেক সময় একমত হতে পারে না। তাই তো এখান থেকে 'ডোকরা' উঠে গেল।" আরও উল্লেখ্য যে 'ডায়মণ্ড হারবার ব্লক-১ এও 'ডোকরার' কাজ এখন হচ্ছে না। কোথাও কোথাও আবার 'সেল্ফ-হেল্প গ্রুপ' বা নিজেকে নিজে সাহায্য করার জন্য দল গঠন করাই এখনও সম্ভব হয় নি। প্রচেষ্টা চলছে।

উল্লেখ্য যে স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা প্রকল্প-এর অধীনে গ্রামবাসীদের অর্থনৈতিক স্ব-নির্ভরতার জন্য কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা স্টেট ব্যাংকের সহায়তায় সেল্ফ-হেল্প গ্রুপ তৈরী করার উদ্যোগ নিয়েছে। ১৫ জন মহিলার একটি ছোট গ্রুপ করে প্রত্যেক মাসে ১৫ টাকা করে জমিয়ে একটি ছোট অর্থ ভাণ্ডার গড়ে ব্যাংকে জমা রাখেন এবং বিনিময়ে অনেক গুণ টাকা ঋণ হিসাবে ব্যাংক থেকে পান। দক্ষিণ ২৪-পরগণার সাগর, কাকদ্বীপ ও নামখানা অঞ্চলে এ ব্যবস্থা বিশেষ কার্যকরী হয়েছে। পুরুষদের অপেক্ষা পরনির্ভরশীল মহিলাদের মধ্যেই এ ব্যাপারে বেশি আগ্রহ দেখা গিয়েছে। মহিলারা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সেই ঋণ পরিশোধ করে আবার আরও বেশি পরিমাণ ঋণ নিয়ে থাকেন। কাকদ্বীপ অঞ্চলে ১৫ জনের একটি গ্রুপ ১ হাজার

টাকা জমা দিয়ে পরিবর্তে ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পুকুর সংস্কার করে মাছ চাষের ব্যবস্থা করেছেন। আর সাগর অঞ্চলের মহিলারা রেশমের পলু (গুটি) কিনে সুতো কাটার কাজ শুরু করেছেন। তুঁত গাছের পাতা থেকে পলু তৈরী করা থেকে সুতো কাটা পর্যন্ত সব পর্যায়ের কাজই মহিলারা অতি দক্ষতার সঙ্গে করে থাকেন। অনুমান করা যায়, সাময়িক কর্ম নিযুক্তি এবং স্ব-নির্ভর স্থায়ী উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির ফলেই গ্রামাঞ্চল থেকে সামান্য রোজগারের তাড়নায় দরিদ্র নারীদের শহরাঞ্চলে যাতায়াত এখন অনেক কমে গেছে।

উপরোক্ত কর্মসূচীগুলির প্রধান উদ্দেশ্য দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান এবং অস্থায়ী ও স্থায়ী অর্থসংস্থানের বিষয়ে সাহায্য করা। কিন্তু গোড়ায় গলদ। দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের তালিকা প্রস্তুতিতেই রয়ে গেছে বড় ত্রুটি। আগে কোন ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় নিম্নতম আয়ের ভিত্তিতে দারিদ্রসীমার সংজ্ঞা নির্ধারিত হতো। কিন্তু এখন পারিবারিক ব্যয়ের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হচ্ছে দারিদ্রসীমা। সরকার থেকে কর্মীরা গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জেনে নেন তাদের ব্যয়ের পরিমাণ। লেখিকার সমীক্ষিত প্রায় সব গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা জানিয়েছেন যে সরকারি সমীক্ষাতে অনেক মধ্যবিত্ত, এমনকী উচ্চবিত্ত পরিবারকেও দারিদ্র সীমার নীচে দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে অনেক প্রকৃত দুস্থ পরিবারকে দেখানো হয়েছে দারিদ্রসীমার উপরে। ডায়মণ্ড হারবার ব্লক-১ এর একজন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা বলেছেন, "আগে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের প্রধান ছিলেন, তারা নিজেদের লোককে দারিদ্রসীমার নীচে দেখিয়ে কার্ড করিয়ে দিয়েছে। তারাই কম দামে চাল, গম, চিনি সব পাচ্ছে। আমরা কিছুই পাচ্ছি না।" আবার একটি পঞ্চায়েত সমিতির পুরুষ সভাপতির বক্তব্য হল "অনেক সময় নিজের আত্মীয়কে দারিদ্রসীমার নীচে দেখায়। আবার কারও কাছ থেকে হয়তো কিছু পেল, তাকে দারিদ্রসীমার নীচে দেখিয়ে দিল।" অনেক সাধারণ সদস্যাই জানিয়েছেন যে দরিদ্রদের তালিকা কিভাবে তৈরী হল তারা তা জানেন না, কিন্তু একথা ঠিক যে এই তালিকা ঠিক হয়নি। বিষয়টি নিয়ে প্রায় সব সদস্যরাই বিক্ষুব্ধ। একজন সদস্যার মত হল ঃ "গ্রামে বাস করে আমরাই ঠিক জানি কে কি রকম আয় করে, কি রকম ব্যয় করে, কার ভালো অবস্থা, কে খুব গরীব। বাইরে থেকে লোক এসে একদিন বাড়ি বাড়ি ঘুরে কি করে বুঝবে? গ্রামের লোকেরাই শুধু জানে। গ্রাম সংসদকে এই দায়িত্ব দিলেই তো হয়।"

এই উক্তির মধ্যে অনেকখানি যৌক্তিকতা আছে বলেই মনে হয়। আর মহিলা সদস্যারাও যে এসব ব্যাপারে কতখানি সচেতন হয়ে উঠেছেন তাও এই উক্তি থেকে প্রমাণিত হয়।

এসব গুরুতর ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে গ্রামাঞ্চলে বহু মহিলাই অর্থনৈতিক কর্মস্রোতের শরিক হয়েছেন, এবং অনেকে আর্থিক উন্নতির পথও দেখতে পাচ্ছেন। আর এ বিষয়ে পঞ্চায়েত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কোন কোন অঞ্চলে এখনও পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে খাস জামির পাট্টা দেওয়া হচ্ছে, আর এই পাট্টা দেওয়া হচ্ছে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে। চাকদহ ব্লকের মদনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা রেখা বাগ জানালেন যে ওদের অঞ্চলে এখন যৌথ নামে পাট্টা দেবার সময় আগে স্ত্রীর নাম এবং পরে স্বামীর নাম লেখানো হয়। স্ত্রীকে না জানিয়ে টাকা নিয়ে জমির হস্তান্তর রোধ করার জন্যই এই ব্যবস্থা। আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে মহারাষ্ট্রের মহিলা পঞ্চায়েতের সদস্যারাও পারিবারিক জমিতে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ মালিকানা এবং স্ত্রীর নামে জমি হস্তান্তরের জন্য আন্দোলন করে অনেকখানি সাফল্য অর্জন করেছেন। কিছু নারী পঞ্চায়েতে আসার ফলে তারাই এখন নারীসমাজের স্বার্থ রক্ষায় উদ্যোগী হয়েছেন।

কোন কোন অঞ্চলে (চাকদহ ও সাগর ব্লক-এ) দরিদ্র বিধবাদের পঞ্চায়েতের মাধ্যমে তিন শ টাকা করে মাসিক ভাতা দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু উল্লেখ্য যে গ্রামাঞ্চলে মহিলা কৃষি-শ্রমিকদের স্বার্থ এখনও রক্ষিত হচ্ছে না। বিভিন্ন অঞ্চলে কিংবা একই অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী শ্রমিকের মজুরি আলাদা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুরুষের সমান কাজ করেও নারী শ্রমিকরা মজুরি পান অনেক কম। এ বিষয়ে পঞ্চায়েত কিছু করতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে এ বিষয়ে দুটি ব্যতিক্রম দেখা গেছে। বোলপুর-শ্রীনিকেতন ব্লক-এর রূপপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান পূর্ণিমা হাঁসদা (তপশিলী উপজাতি) দাবি করেছেন যে তাদের এলাকায় নারী পুরুষ উভয়েরই মজুরি দিনে ৫০টাকা, আর সঙ্গে দেওয়া হয় একবেলার খাবার। আর সাগর ব্লক-এর ধবলাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উর্মিলা দলুই জানিয়েছেন যে তাদের এলাকায়ও অনেক জায়গায় নারী কৃষি শ্রমিকের মজুরি পুরুষের থেকে অনেক কম হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজে পুরুষের সমান ৪৮ টাকা মজুরি দিতে হবে এই চুক্তিতে কাজ করেছেন। এ থেকে অনুমান করা যাচ্ছে যে নারীরাও তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছেন। এই সচেতনতা,

অধিকারবোধ এবং উপযুক্ত শিক্ষাই হল নারী প্রগতির প্রাথমিক শর্ত। নারী শিক্ষার আরও প্রসার ঘটলে এই সচেতনতা ও জাগরণ হতো আরও সার্থক এবং অর্থবহ।

পারিবারিক ও সামাজিক পরিবর্তন

স্থানীয় স্ব-শাসন ব্যবস্থায় গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে কিছু নারীর প্রবেশ গ্রামাঞ্চলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে একটি নিঃশব্দ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এ ছিল অবধারিত। প্রকৃত অর্থে আমাদের দেশে নারীই পরিবারকে ধারণ করে থাকে। স্বামী সন্তান ও আত্মীয় পরিজন পরিবৃত পরিবারে সকলের সুখ দুঃখ, ভালোমন্দ, আহার নিদ্রা, পূজাপার্বণ, লোক লৌকিকতা, সব কিছুর দায়িত্বই নারীর। অশিক্ষিত অথবা স্বল্পশিক্ষিত, আর্থিকভাবে পরনির্ভরশীল এবং পরিবারকেন্দ্রিক এই নারী হঠাৎ শুধু স্থানীয় রাজনীতির আঙিনায়ই উঠে আসেনি, সেই সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছে স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে। ফলে অবধারিতভাবে গ্রামাঞ্চলের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে শুরু হয়েছে এক ধীর ও নিঃশব্দ নারী জাগরণ, যার খবর আমরা অনেকেই রাখিনা।

পারিবারিক শ্রম ও মর্যাদা

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে উন্নয়নমূলক কার্যসূচিগুলিকে রূপায়িত করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যাদের অনেকখানি শ্রম ও সময় ব্যয় করতে হয়। তদুপরি এই সদস্যাদের পঞ্চায়েতের অফিসে গিয়ে মাসে অন্তত চারটি করে মিটিং করতে হয়। বছরে ২ বার থাকে গ্রাম সংসদের মিটিং। এছাড়া, উপস্থিত থাকতে হয় নিজ নিজ রাজনৈতিক দলের সভা সমাবেশে। এগুলিই সব নয়। এর বাইরেও গ্রামের মানুষের, বিশেষত মহিলাদের, অসুবিধার কথা, প্রয়োজনের কথা জানতে হয়। ধৈর্য ধরে শুনতে হয়। আর প্রয়োজন বোধে এবং সম্ভব স্থলে তাদের নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অথবা বি. ডি. ওর কাছে যেতে হয়। লেখিকা ডায়মণ্ড হারবার ব্লক-১ এর বি. ডি. ও শ্রীমতী তন্ময়ী দত্তর অফিসে বসে নিজেই প্রত্যক্ষ করেছেন যে একজন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা এক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে (যার ঘরের চাল উড়ে গেছে) এবং একজন মহিলাকে (ঠিক সময়ে টিকা না খাওয়ানোর ফলে যার ছেলের পোলিও হয়েছে) বি. ডি. ওর কাছে নিয়ে এসেছিলেন সাহায্যের জন্য। অনেক সময় আবার পঞ্চায়েত

সদস্যাদের বাড়িতেই উপকার প্রার্থীরা এসে দেখা করেন। তাছাড়া আছে রাস্তাঘাট মেরামত ও নানা নির্মাণকাজের সময় সেখানে গিয়ে পরিদর্শন ও তদারকির কাজ। এছাড়া, প্রশিক্ষণ নেবার জন্য, কখনও আশেপাশের অঞ্চলে গিয়ে, আবার কখনও কখনও নদীয়া জেলার কল্যাণী পর্যন্ত গিয়ে, ব্যয় করতে হয় বেশ কিছু সময়। ফলে পরিবারের জন্য পঞ্চায়েতের মহিলা সদস্যদের সময় অনেকখানি কমেছে। আর পরিবারকেন্দ্রিক নারী কিছুটা বর্হিমুখী হওয়ায় শুরু হয়েছে এক ধরনের পারিবারিক সংঘাত। কিন্তু এই সংঘাতের মধ্য থেকেই আবার ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে ভবিষ্য দিশা।

চিরদিনের অভ্যাসবশত নারীর মনে আজও পারিবারিক কর্তব্যই প্রাধান্য পায়। শিশু সন্তানের পরিচর্যা ও স্কুলে যাওয়ার ব্যবস্থা, সকলের জন্য রান্না ও সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করেই অধিকাংশ পঞ্চায়েত সদস্যাদের বাইরের কাজে বেরোতে হয়। তবুও আগের মতো সব কিছু তাদের পক্ষে সুসম্পন্ন করা সম্ভব হয় না, কখনও সময়ের অভাবে, কখনও বা শারীরিক ক্লান্তির ফলে। সাধারণত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এবং পঞ্চায়েত সভানেত্রীদের শারীরিক ও মানসিক চাপ থাকে আরও অনেক বেশি। এখন প্রশ্ন হল, এসব মহিলারা সাংসারিক কাজের জন্য পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে কোন রকম সাহায্য ও সহনশীলতা পান কি? আর পেলেই বা তা কতটুকু?

পারিবারিক সহনশীলতা এবং সাহায্য অনেকখানি নির্ভর করে পারিবারিক পরিবেশ ও স্বামীস্ত্রীর পারস্পরিক বোঝাপড়ার উপর। ছোট স্বামীস্ত্রীর সংসারে সাধারণত সমস্যা থাকে কম। এখানে স্বামীও অনেক সময় নিজের জামা কাপড় নিজেই কেচে নেন, বলেন, "তুমি যাও, আমিই কাপড়টা কেচে নেব।" এমনকী এ রকম পরিবারে সময়ে সময়ে স্বামী রান্নার কাজেও সাহায্য করেন বলে জানিয়েছেন অনেক সদস্যা। কারণ স্বামীর মতানুযায়ী এবং অনেকখানি পারিবারিক স্বার্থেই অধিকাংশ মহিলা পঞ্চায়েত নির্বাচনে দাঁড়ান বলে স্বামীরাও সাংসারিক কাজে নিজেদের কিছু দায়িত্ব আছে বলে মনে করেন। তবে শহরাঞ্চলের যৌথ পরিবারের ভাঙ্গনের ছোঁয়া গ্রামাঞ্চলে কিছুটা লাগলেও সেখানে এখনও বেশির ভাগ গৃহবধূকেই শ্বশুরশাশুড়ির সঙ্গেই সংসার করতে হয়। সমস্যা দেখা দেয় সেখানেই। স্বামী সাংসারিক কাজে এগিয়ে আসতে চাইলেও শাশুড়ি অসন্তুষ্ট হন এবং তার পুরানো ধারণা নিয়ে পুত্রকে স্ত্রৈণ মনে করে সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করেন। তবে ফলতা ব্লক-এ এমন শাশুড়িও আছেন, যিনি রান্না করে সাজিয়ে রাখেন যাতে বৌমা (পঞ্চায়েত সদস্যা) বাইরে থেকে ফিরে

এসেই খেতে পারেন। কিন্তু এরা সংখ্যায় নিতান্তই নগণ্য। তবে পুরষেরাও যে এ বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠছেন তার প্রমাণও আছে। "যে আগে এক গ্লাস জল গড়িয়েও খেত না, এখন সে রান্না করা ভাত তরকারি নিজে নিয়ে খায়," জানালেন ডায়মণ্ড হারবার ব্লক-১এর নোতড়া গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা কৃষ্ণা মল্লিক। তবে নিজে খাবার নিয়ে খেলেও কোন স্বামীই প্রায় কখনই বাসন মাজেন না। সম্ভবত তারা এটিকে নীচু কাজ বলে মনে করেন। সুতরাং, সাধারণভাবে পঞ্চায়েত সদস্যাদের পারিবারিক শ্রম কমেনি। বেড়েছে বাইরের শ্রম ও মানসিক চাপ। অনেক সময় কাজের চাপেই সদস্যারা ঠিক সময়ে পঞ্চায়েত মিটিং-এ উপস্থিত হতে পারেন না, বিশেষত সে মিটিং যদি হয় সকালের দিকে। কিন্তু সবটাই কাঁটা বিছানো নয়। আছে সুফলও।

সংসারে স্বামীসন্তান, এমনকী শাশুড়ির কাছেও পঞ্চায়েত সদস্যা গৃহবধূর মান মর্যাদা বেড়েছে এবং বাড়ছে। এ বিষয়ে সব পঞ্চায়েত সদস্যারাই একমত। এদের সমবেত মতেরই প্রতিধ্বনি শোনা গেল ফলতার এক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা মিনু মণ্ডলের মুখে ঃ "শাশুড়ি এখন ভাবছে, আমার বউ-এর কাছে এত লোক আসছে, কত কি সাহায্যের জন্য। আর বউ-ও তাদের সাহায্য করে .... শাশুড়ি এসব পাড়ার লোকেদের কাছে বলে বেড়ান...., তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভাব অনেক কমেছে।" চুঁচূড়ায় হুগলি জেলা পরিষদ-এর অফিসে বসে চণ্ডীতলা -২ ব্লকের জনাই গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য শ্রী জগন্নাথ ঘোষ জানালেন, "পরিবারের মধ্যে মেয়েদের সম্বন্ধে মনোভাবের পরিবর্তন হচ্ছে। দেখুন না, আমাদের পাশের পঞ্চায়েতেই, বৌদি যখন পঞ্চায়েতের সাধারণ সদস্যা ছিলেন, তিনি বেশিক্ষণ বাইরে থাকলে বাড়িতে অশান্তি হতো। ...বৌদি খুব জেদি, ...উনি এখন পঞ্চায়েত প্রধান হয়েছেন। বাড়ির লোকেরা কিন্তু এখন মানিয়ে নিয়েছে। ...এখন বৌদির ফিরতে দেরী হলে দাদাই সাইকেল নিয়ে বৌদিকে আনতে যান।" শুধু পারিবারিক পরিবেশেরই পরিবর্তন ঘটছে না, পাড়া প্রতিবেশীর কাছেও পঞ্চায়েত সদস্যাদের মর্যাদা বাড়ছে। এ বিষয়ে একজন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা নির্দ্বিধায় বলেছেন, "পাড়া প্রতিবেশীদের কাছে মর্যাদা তো বেড়েছেই। রাস্তায় দেখা হলে অনেকেই বলে, দিদি নমস্কার, বৌদি নমস্কার ...ভালোই লাগে। কই, আগে তো বলত না।"

সামাজিক পরিবেশের পরিবর্তন

শুধু পঞ্চায়েত সদস্যাদের পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদাই বাড়ছে না, পরিবর্তন

শুরু হয়েছে সামাজিক পরিবেশেও। পাড়ার যেসব গৃহবধূরা অবসর সময়ে শুধু রান্না খাওয়ার গল্প আর শাশুড়িবধূর বিবাদ নিয়ে গল্প করতেন, পরনিন্দা পরচর্চা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, এখন তারা নিজেদের মধ্যে শিশুর খাদ্য, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পোলিও টিকা, শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করতে শুরু করেছেন। কন্যা সন্তানের শিক্ষা সম্বন্ধেও সচেতন হয়ে উঠছেন। এখন এরা গল্প করতে শিখছেন, ভাবতে শিখছেন কিভাবে দলবদ্ধ হয়ে নিজেদের আর্থিক উপার্জনের পথ সুগম হবে, সে বিষয়ে। মাত্র কিছুদিন আগেও যেসব বয়স্কা পাড়া প্রতিবেশিনীরা "মিটিং করে বেড়ানো" গৃহবধূদের সুনজরে দেখতেন না, এখন তারাই কী "পঞ্চায়েতে যাওয়া মেয়েদের" একটু ঈর্ষা করতে শুরু করেছেন? কারণ এখন তারাই তাদের "মেয়ে বৌ-রা" কিভাবে পঞ্চায়েতে যাবেন তা নিয়ে চিন্তা করেন। এসব কথা জানিয়েছেন সমীক্ষিত পঞ্চায়েত সদস্যারাই।

পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থায় গ্রাম সংসদের গুরুত্ব অপরিসীম। গ্রামের সব মানুষই সংসদের সদস্য, আর এই গ্রাম সংসদের প্রস্তাব অনুসারেই গৃহীত হয় উন্নয়নমূলক কর্মসূচী। আগে গ্রাম সংসদের মিটিং-এ অধিকাংশ মহিলারাই অনুপস্থিত থাকতেন। প্রস্তাব গ্রহণ করতেন সাধারণত পুরুষরাই। একথা সত্য যে এখনও গ্রাম সংসদের মিটিং-এ সাধারণ মহিলাদের উপস্থিতি থাকে অপেক্ষাকৃত অনেক কম। অনেক সময় পুরুষরাই বলেন, "আমরাই তো যাচ্ছি, তোমাদের আর যেতে হবে না, ঘরে থাকো।" অনেক সদস্যারা আবার অভিযোগ করেছেন যে বেশির ভাগ সময় গ্রাম সংসদের মিটিং এমন সময় ডাকা হয়, যখন মহিলাদের পক্ষে যাওয়ার অসুবিধা থাকে। কারণ যাই হোক না কেন, একথা সত্য যে সাধারণ মহিলারা গ্রাম সংসদের মিটিং-এ কম সংখ্যায় উপস্থিত থাকেন। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে পঞ্চায়েত সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ বেড়েছে। অনেক মহিলাই নিকটবর্তী গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যাদের সাথে যোগযোগ রাখার চেষ্টা করেন। মিটিং-এ কি হল জেনে সে বিষয়ে আলোচনা করেন। গ্রামের কোথায় রাস্তা, কোথায় শিশু শিক্ষা কেন্দ্র হওয়া উচিত, এসব বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতামত বিনিময়ও করেন। অর্থাৎ গ্রামের সাধারণ মহিলারাও স্থানীয় স্ব-শাসন ব্যবস্থা এবং গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচী সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছেন। এ কি আমাদের সামাজিক উন্নয়নের প্রথম প্রতিশ্রুতি নয়?

সামাজিক সমতা

এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই যে তপশিলী জাতি/উপজাতি সহ সব নারীরাই

অধিক সংখ্যায় পঞ্চায়েতে আসার সুযোগ পাওয়ার পর থেকে গ্রামাঞ্চলে সামাজিক পরিবর্তন শুরু হয়েছে। আমাদের দেশে সাধারণভাবে শহরাঞ্চলেও অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া তপশিলী জাতি/উপজাতি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষেরা তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষের কাছ থেকে সমান ব্যবহার পান না, আর তাদের আর্থসামাজিক অবস্থানও অনেক নীচে। গ্রামাঞ্চলে মহিলারাই কুসংস্কারের শিকার হন বেশি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে অন্য অনেক রাজ্যেই তপশিলী জাতি/উপজাতি মহিলা প্রধানরা অনেক সময়ই তীব্র বিরোধিতা ও নির্যাতনের সম্মুখীন হন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এরকম ঘটনার কথা জানা যায় না। আর একথা মনে করার কারণ আছে যে এ রাজ্যের গ্রামাঞ্চলেও এখন জাতিবর্ণ ও ধর্মের দ্বন্দ্ব আরও কমতে শুরু করেছে। সমীক্ষার অন্তর্গত অধিকাংশ তপশিলী জাতি/উপজাতি পঞ্চায়েত সদস্যাই জানিয়েছেন যে তাদের প্রতি অবজ্ঞার মনোভাব ক্রমশ দূর হচ্ছে। জাতিবর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে সব নারী পুরুষই নির্বাচনে লড়াই করছেন, একসঙ্গে মিটিং করছেন, নিজ নিজ প্রচারকার্য চালাচ্ছেন, আবার একসঙ্গে বিভিন্ন আসনে জয়লাভও করছেন। ফলে তৈরী হচ্ছে একটি সামাজিক সমতার মনোভাব। আর নির্বাচনে জয়লাভের পরেও বিজয়ী তপশিলী জাতি/উপজাতি, সংখ্যালঘু এবং সাধারণ পঞ্চায়েত সদস্যারা একসঙ্গেই মিটিং করেন, কাজ করেন, এবং খাওয়া দাওয়াও করেন। ফলে ভেদাভেদ ভুলে পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বের পরিবেশ তৈরী হচ্ছে। ফলতা ব্লক-এর নাও পুকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা অনিতা কুলে (তপশিলী জাতি) বলেছেন, "যখন প্রথম পঞ্চায়েতে আসি, ...মনে করতো, ওরা এস. সি., ওদের কাছে যাবো না। কিন্তু এখন দরকারের সময় বাধ্য হয়ে আসতেই হয়। আমরাও যেমন পারি, সাহায্য করি।" সাগর ব্লক-এর কয়েকজন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা প্রায় সমস্বরে বলেছেন, "এখন ওসব আর নেই, আমরা সব একসঙ্গেই আছি।" পঞ্চায়েত সদস্যাদের এই "একসঙ্গে" থাকার প্রভাব পড়ছে সামাজিক পরিবেশেও। উল্লেখ্য যে এসব কথাবার্তার মধ্যে একজন অতি উৎসাহী মহিলা উপস্থিত তপশিলী জাতির মহিলাদের মধ্যে একজনের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে ফেললেন, "এখন তো ব্রাহ্মণরাও ওদের বাড়িতে পুজো করতে যায়—আগে যেত না। ওদের বাড়ি পুজো করার জন্য ওদের নিজেদের বামুন থাকতো।" যার উদ্দেশ্যে একথা বলা, সেই তপশিলী মহিলাও স্বীকার করলেন যে তাদের বাড়িতে এখন ব্রাহ্মণ পুরোহিতই পুজো করেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বর্ণ-অবর্ণ নির্বিশেষে পঞ্চায়েতি রাজ-এ মহিলাদের প্রবেশের ফলে ঠাকুর ঘরে পূজার

বেদী থেকেও এখন বর্ণ বিদ্বেষের বিষ নির্বাসিত হচ্ছে। একে কি এক নীরব বিপ্লব বলা যায় না?

একটু অসুবিধা হয় পরিবারের বয়স্কা শাশুড়ি স্থানীয়াদের নিয়ে। কিন্তু তারাও আজকাল মানিয়ে চলতে শিখছেন। কিংবা বলা যায় অবস্থার চাপে তাদের এখন মানিয়ে চলতে হচ্ছে। এ বিষয়ে সাঁকরাইল পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী রেবা রানি দে-র পরিষ্কার বক্তব্য হল ঃ "আমার তো পাঁচজনকে নিয়ে চলতে হয়। অনেক সময় আমরা যাদের হাড়ি, ডোম বলি, তারাও তো আমার বাড়িতে আসে। আমার সোফায়, অনেক সময় খাটেও তাদের বসতে দিই। শাশুড়ি অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু আমি যখন বোঝাই, উনি মেনে নেন। অনেক সময় আবার আমি নিজেই ওদের বাড়িতে খেয়ে এসে অনেকটা ইচ্ছে করেই শাশুড়িকে জানিয়ে দিই যে আমি ওখানে খেয়েছি। শুধু একাদশী, অমাবস্যার দিনগুলোতে উনি এখনও মেনে চলেন। অন্যদিনে অসুবিধা নেই।" এভাবেই মানিয়ে নেবার দিন চলছে গ্রামাঞ্চলে। স্থানীয় রাজনীতি এবং সেই সঙ্গে আর্থিক উন্নয়নের কর্মসূচী বাড়ির অন্দরমহল পর্যন্ত প্রসারিত হওয়ার ফলেই এই মানিয়ে চলার কাজ হচ্ছে দ্রুত। আর বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়ছে অবধারিতভাবে।

অবস্থার চাপে বিবাহের ব্যাপারেও জাতপাতের দ্বন্দ্ব এখন অনেক ক্ষেত্রেই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে কুলটিকরি গ্রাম পঞ্চায়েতের এক তপশিলী উপজাতি সদস্যা উচ্চবর্ণে বিয়ে করেছেন। আর চাকদহ ব্লক-এর দুবড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তপশিলী মহিলা প্রধান বিয়ে করেছেন ব্রাহ্মণকে। গ্রামাঞ্চলেও অনেক আধুনিক তরুণ-তরুণীরা আজকাল অসবর্ণ বিয়ে করছেন, আর সেক্ষেত্রে বাবা-মা প্রথমে আপত্তি করলেও পরে সেটা মেনেও নেন। এ কোন নতুন কথা নয়। নতুন হল বর্ণ-অবর্ণদের মধ্যে বিয়ে। এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছে, যেখানে বাবা-মা সম্বন্ধ করে তপশিলী ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন। উল্লেখ্য যে সাঁকরাইল ব্লক-এ একজন কায়স্থ স্কুল শিক্ষক সম্বন্ধ করে তার মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন তপশিলী স্কুল শিক্ষক পাত্রের সাথে। এখানে মনে রাখতে হবে যে স্কুল শিক্ষকরাও এখন ভালো উপার্জন করেন। ফলতা ব্লক-এর এক কায়স্থ পিতাও সম্বন্ধ করে তার মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন আর্মিতে চাকরি রত তপশিলী পাত্রের সাথে। অনুমান করা যায় চাকরি ক্ষেত্রে সংরক্ষণ এবং পঞ্চায়েতের মাধ্যমে মেলামেশা ও যোগাযোগের সূত্র ধরে গ্রামাঞ্চলে বর্ণ-অবর্ণদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্কের কঠোরতা অনেকখানি

নমনীয় হয়ে আসছে। সামগ্রিকভাবে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বর্ণ বিদ্বেষ বিদূরিত না হলেও উপরোক্ত উদাহরণগুলি এ বিষয়ে সবুজ সংকেত বহন করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে রাজ্যসরকার কর্তৃক প্রকাশিত পঞ্চায়েত সদস্যা ও সাধারণ নারীদের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রকাশিত পুস্তিকাগুলিতে জাতি বর্ণ ও ধর্ম বিদ্বেষের বিরুদ্ধেও সরলভাবে আলোচনা আছে।

এসব পুস্তিকাতে আরও আলোচনা আছে নারীপুরুষ বৈষম্য, কন্যা সন্তানের প্রতি অনাদর, নারী নির্যাতন ও পণপ্রথার বিরুদ্ধে। কিন্তু পঞ্চায়েত সদস্যারা নারী পুরুষের সামাজিক অসমতার অন্যতম সূচক এবং নারীর মানবীসত্তার অবমাননার অন্যতম প্রতীক পণপ্রথা দূরীকরণে কিছু করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। সমীক্ষিত সদস্যারা প্রায় সকলেই অকপটে স্বীকার করেছেন যে পণ দেওয়া-নেওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ জানা সত্ত্বেও এ বিষয়ে কিছু করার ক্ষমতা তাদের নেই। বরং শহরাঞ্চলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে গ্রামাঞ্চলেও পণপ্রথা এখন বেড়েই চলেছে। কোন পক্ষই স্বীকার করেন না যে দাবি অনুযায়ী পণ দেওয়া নেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে লিখিত কিছু থাকে না। সুতরাং গোপনে যে পণ দেওয়া নেওয়া হয়, তা নিয়ে কিছু করতে তারা অপারগ। আর যদি কখনও জানা যায় যে পণ দেওয়া নেওয়া হচ্ছে, তখনও পঞ্চায়েত সদস্যারা নিরুপায় দর্শক হয়ে থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করেন। অন্যথায় একটি মেয়ের বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। মনে হয় সদস্যাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্তত প্রকৃতই পণপ্রথার বিরুদ্ধাচরণ করতে চান। কিন্তু সে শক্তি তাদের নেই। চাকদহ ব্লক-এর শিলিন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের এক সদস্যার মতে "ওপর তলার আইন দিয়ে কিছু হবে না। স্থানীয় স্তরে এমন কোন ব্যবস্থা থাকার দরকার যাতে গ্রামের মানুষরাই এ বিষয়ে কিছু করতে পারেন।" কিন্তু কি ব্যবস্থা? তার উত্তর এদের জানা নেই। পঞ্চায়েত পণপ্রথা সম্বন্ধে কিছু করতে ব্যর্থ হয়েছে।

আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে মহারাষ্ট্রের 'মহিলা পঞ্চায়েত'-এর সদস্যারা এবং বিহারে 'কিশোরী সভা'র সদস্যারা পণপ্রথা ও বালিকা বিবাহের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করছেন। কিন্তু সাফল্য এসেছে সামান্যই। মনে হয় পণপ্রথা প্রতিকারের পথ দেখাতে পারেন একমাত্র বিবাহার্থী কন্যারা। এ রকমই একটি প্রতিকারের সন্ধান দিয়েছেন সাঁকরাইল পঞ্চায়েত সমিতির 'শিশু নারী সমাজকল্যাণ ও ত্রাণ' বিষয়ক কর্মাধক্ষা শ্রীমতী রেবতী দাস। তাদের নিকটবর্তী একটি গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের এক শিক্ষিকা কন্যা গহনা এবং দ্রব্যসামগ্রী (আসবাব, স্কুটার, টিভি, ফ্রিজ) সমেত পাত্রপক্ষের

প্রায় তিন লক্ষ টাকা দাবির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়ে বলেছেন, "যেখানে পণ দাবি করা হয়, সেখানে আমার বিয়ে হবে না।" বিয়ে হয়নি, ভেঙ্গে গেছে। এক্ষেত্রে বিবাহার্থী মেয়েটির আর্থিক স্বনির্ভরতা ছিল। কিন্তু স্বল্পশিক্ষিত এবং জীবনধারণের জন্য পরনির্ভরশীল কজন নারী এত কঠিন সাহস দেখাতে পারেন? এখানে আর একটি প্রশ্নও থেকে যায়। পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যারা নিজেদের পরিবারে কি পণ দেওয়া-নেওয়া করেন না? সদুত্তর পাওয়া যায়নি। কারণ পণপ্রথার সাথে জড়িয়ে আছে মানুষের সীমাহীন ভোগ বাসনা ও লোভ।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে নারী

আমরা আগেই দেখেছি যে মহারাষ্ট্রে মহিলা পঞ্চায়েতের সদস্যারা নারী নির্যাতন নিয়েও আন্দোলন করেছেন। পরিবারের মধ্যে নারী নির্যাতন এদেশে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। বিশেষত গ্রামাঞ্চলে অশিক্ষিত ও গরিব ঘরের নারীরাই নির্যাতনের শিকার হন বেশি। সাধারণত আর্থিক অভাব, মদ ও জুয়ার নেশা, পণের টাকার দাবি, স্ত্রীর প্রতি অকারণ সন্দেহ অথবা অন্য নারীর প্রতি আকর্ষণ, আবার কখনও বা শুধু অকারণেই বহু স্বামী সর্বদা স্ত্রীকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করেন। আর এ নির্যাতনে কখনও কখনও যোগ দেন শ্বশুর, শাশুড়ি, দেওর, ননদ প্রভৃতি। উল্লেখ্য যে ইদানীং এ রাজ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত, বিশেষত পঞ্চায়েতের মহিলা সদস্যরা নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করছেন। আগে এসব ঘটনা সাধারণত গ্রামের মোড়ল এবং পুরুষ সমাজপতিরাই নিষ্পত্তি করতেন। আর সাধারণত তারা বিধান দিতেন নির্যাতিতা নারীর বিরুদ্ধে। এখন দিন বদলেছে। পঞ্চায়েতের সদস্যারা নারী নির্যাতন প্রতিরোধে, এমনকী অপরাধীকে শাস্তিদানের ব্যাপারেও সক্রিয় হয়ে উঠছেন। তাদের পক্ষে অবশ্য নারী নির্যাতন সম্পূর্ণ বন্ধ করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাধীর শাস্তি বিধানে সহায়তা করতে পারছেন। আর কিছু মদের 'ঠেক' ও জুয়াখেলার আড্ডা বন্ধ হয়েছে।

সাধারণভাবে অত্যাচারিত গৃহিণী নিকটতম পঞ্চায়েত সদস্যা বা পঞ্চায়েত প্রধান-এর কাছে অভিযোগ জানালে, সদস্যারা দলবদ্ধভাবে স্বামীকে ভয় দেখান। তাতে কাজ না হলে থানা পুলিশের সাহায্য নেন। পঞ্চায়েতের নারীরা উদ্যোগ নিলে পুলিশও প্রায়শই সঠিক পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়। গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সদস্যারাও নিজেদের কর্মসূচীর মধ্যে বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবে আগেই

উল্লেখ করা হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি ব্যতীত অন্য মহিলা সংগঠন বিশেষ নেই। কখনও কখনও এসব অত্যাচারের ঘটনা নিয়ে গ্রাম সংসদের মিটিং-এও আলোচনা হয়। কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা দাবি করেছেন যে পুলিশ আসার আগে তারা নিজেরাই মদের 'ঠেক' ভেঙ্গে দিয়েছেন। এ বিষয়ে কিছু উদাহরণ পঞ্চায়েত সদস্যাদের ভূমিকা সম্বন্ধে জানতে আমাদের সাহায্য করবে।

চাকদহ ব্লক-এর দুবড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এক সদস্যা জানালেন যে অনেক বাড়িতেই স্ত্রীর উপর অত্যাচার হয়। কয়েক মাস হল এ ব্যাপারে দলবদ্ধভাবে তারা কিছু প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হয়েছেন। একটি বাড়িতে স্বামী ঘর থেকে চাল, শাড়ি, বাসনপত্র নিয়ে বিক্রি করতেন, আর সেই সঙ্গে আরও টাকার দাবিতে স্ত্রীর মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে তার উপর অত্যাচার করতেন। একদিন সেই মহিলার উপর অত্যাচার হচ্ছে খবর পেয়ে ১০ জন মহিলা একত্রিত হয়ে সেই বাড়ির দরজা ভেঙ্গে ঢুকে পড়েন। স্বামীর কাছ থেকে সেই মহিলাকে উদ্ধার করে তাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসে গিয়ে অভিযোগ করেন। পঞ্চায়েত থেকে স্বামীকে ভয় দেখানো হয়। তাতেও কাজ না হলে সঙ্গে পুলিশ নিয়ে স্বামীকে ধরে এনে প্রহারের পর এখন কিছুদিন পরিস্থিতি শান্ত আছে। সাগর ব্লক-এর ব্রজেশ্বর প্রামানিক এক স্ত্রী থাকতেই আরেকটি বিয়ে করলে প্রথমা স্ত্রী পঞ্চায়েতের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তখন পঞ্চায়েত সদস্যারা তার পাশে দাড়িয়ে মনোবল জুগিয়েছেন। আর সেই প্রথমা স্ত্রী 'বাপের বাড়ি' চলে গিয়ে সেখান থেকে মামলা করে ডিভোর্সের পর সত্তর হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। এ রাজ্যে গরীব মহিলাদের জন্য বিনা ব্যয়ে আইনি সহায়তার ব্যবস্থার কথা শোনা যায়। তবে সমীক্ষিত জেলাগুলির মধ্যে কোন মহিলা এরকম সাহায্য পেয়েছেন বলে জানা যায় নি। অন্তত উপরোক্ত মহিলাটি পান নি। পঞ্চায়েত সদস্যারা নিজেরা চাঁদা তুলে কিছু আর্থিক সাহায্য করেছেন বলে দাবি করেছেন। সাঁকরাইল পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রীর দাবি অনুসারে একদিন তার সমিতির মিটিং চলা কালে খবর আসে যে একজন বধূ নির্যাতিত হচ্ছেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে থানায় খবর দেন এবং মিটিং অসম্পূর্ণ রেখে তখনই কিছু লোকজন নিয়ে (ইনি স্থানীয় গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সক্রিয় সদস্যা) সেই বাড়িতে উপস্থিত হন। আর ইতিমধ্যে খবর পেয়ে স্থানীয় পুলিশ অফিসার সেখানে গিয়ে সেই স্বামীকে গ্রেপ্তার করেন। স্ত্রীকে অর্ধমৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। আর স্বামীর হয় ৬ মাস জেল। এই মহিলা সভানেত্রীর আরও দাবি যে একদিন একটি বাড়িতে স্ত্রীকে হত্যা

করা হয়েছে খবর পেয়ে তিনি কয়েকজন সদস্যাকে একত্রিত করেন এবং স্থানীয় পুলিশ অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে সেই স্বামীকে গ্রেপ্তার করান। স্বামী ও তার ভাই-এর ১৪ বছর কারাদণ্ড হয়। চণ্ডীতলা ব্লক-২ এর সালোয়া বেগম জানালেন যে নিকটবর্তী একটি গ্রামের এক গর্ভবতী মহিলাকে নিয়ে তার স্বামী আর সংসার করবেন না বলে তাকে 'বাপের বাড়ি' পাঠিয়ে দেন। কিছুদিন পরে মহিলা আবার নিজের সংসারে ফিরে এলে তাকে হত্যা করা হয়। তখন পঞ্চায়েতের সদস্যাদের দাবি এবং সহযোগিতার ফলেই পলাতক শ্বশুরকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়। "শ্বশুর, শাশুড়ি আর তাদের মেয়ে এখন জেলে।" আর কুলটিকরি মহিলা গ্রাম পঞ্চায়েত-এর প্রধান তপতী সিং-এর দাবি যে একজন মহিলার স্বামী তাকে প্রায় প্রতিদিন শারীরিক অত্যাচার করতেন। একদিন খবর পেয়ে পঞ্চায়েতের সদস্যারা (একজন ছাড়া বাকি সবাই গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সদস্যা) দলবদ্ধ হয়ে সেই বাড়িতে গিয়ে স্বামীকে প্রচণ্ড 'বকাবকি' করেন, এবং ভয়ও দেখান। ফলে স্ত্রীর উপর অত্যাচার না কমে আরও বেড়ে যায়। এবার তারা কয়েকজন স্থানীয় পুরুষকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যান। পুলিশ নিয়ে আসবেন বলে ভয় দেখান, আর প্রয়োজনে "জঙ্গি ব্যবস্থা" করবেন বলেও জানিয়ে দেন। এরপর অত্যাচার বন্ধ হয়েছে। তবে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যারাই অকপটে স্বীকার করেছেন যে স্ত্রীর উপর এই নির্যাতন স্থায়ীভাবে বন্ধ করার মতো শক্তি তারা এখনও অর্জন করতে পারেন নি। তবুও কয়েকজন নারীও যদি সাময়িকভাবেও উপকৃত হন, তার মূল্যই কী কম? আর নারী নির্যাতন প্রতিরোধে গ্রামাঞ্চলের মহিলারা দলবদ্ধভাবে যে শক্তি সঞ্চয় করতে শুরু করেছেন, আগামী দিনের জন্য তা কি কোন শুভ ইঙ্গিত বহন করে না?

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে অধিকাংশ সদস্যার প্রয়োজনীয় শিক্ষার অভাবই পঞ্চায়েত রাজনীতিতে তাদের বড় প্রতিবন্ধকতা। তাছাড়া অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি এবং দুর্নীতি আছে। সে তো পরিবার ও সমাজের প্রায় সর্বত্রই থাকে এবং আছে। কিন্তু বড় কথা হল এই যে পশ্চিমবঙ্গে স্থানীয় উন্নয়নমূলক কর্মসূচীগুলি পঞ্চায়েতের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকার ফলে, আর পঞ্চায়েতের এক-তৃতীয়াংশ আসনে মহিলারা প্রবেশ করার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাবে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ নারীর মধ্যে একটি জাগরণ ঘটেছে। এখনও ঘটে চলেছে। আর সেই সঙ্গে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে উন্মোচিত

হয়েছে এক নবদিগন্ত। সঙ্গে সমতুল শিক্ষার প্রসার থাকলে এই জাগরণ হতো আরও সার্থক। তথাপি এই জাগরণ, এই আত্মোপলব্ধিই অদূর ভবিষ্যতে নারীকে তার অশিক্ষা এবং আর্থিক পরনির্ভরতা থেকে মুক্তি দিয়ে আরও আত্মপ্রত্যয়ী করে তুলবে, মানবাধিকার অর্জন করে নিতে সাহায্য করবে। আর তখনই নারী পুরুষের সমান অধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে এক আদর্শ সম সমাজ। এজন্য হয়তো প্রতীক্ষায় থাকতে হবে আরও দু এক দশক।

পাদটীকা

১। *পঞ্চায়েতে মেয়েরা ঃ পঞ্চায়েত সদস্যার ইতিহাস*; *মেয়েরা এলো পঞ্চায়েতে*; *জোট বাঁধার গপ্পো*; *নারী ও শিশু উন্নয়ন ও পঞ্চায়েত,* পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যাণী, নদীয়া।

২। *সর্বজনীন শিক্ষা ঃ পঞ্চায়েতের ভূমিকা,* পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, নদীয়া, কল্যাণী, পৃ. ৬-৮।

৯

সংসদীয় গণতন্ত্র ও ক্ষমতায়ন

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও স্বাধীনতা-উত্তর কালে সংসদীয় গণতন্ত্রে নারীরা রাজনৈতিক ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশ করার সুযোগ পেয়েছেন সামান্যই। উচ্চবিত্ত, উচ্চশিক্ষিত এবং প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত পরিবার থেকে উঠে আসা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যদের মধ্য থেকেই মুষ্টিমেয় কয়েকজন নারী স্বাধীনতার পর কিছু রাজনৈতিক পদ লাভ করেছিলেন। এদের মধ্যে রাষ্ট্রদূত, গভর্নর, মন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীও আছেন। কিন্তু এরা হলেন ব্যতিক্রমী উদাহরণ। পরিসংখ্যানের দিকে না তাকিয়েও বলে দেওয়া যায় যে সাধারণভাবে সংসদ ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে নারী সদস্যদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে নারীর রাজনৈতিক সচেতনতা অথবা বৃহত্তর রাজনীতিতে নারীর অবদান খুব সামান্য, একথা বলা যায় না। ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ ক্ষণে বার বার তা প্রমানিত হয়েছে। আসলে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় এই আন্দোলনের স্বার্থেই নারীদের ব্যবহার করা হলেও স্বাধীনতা-উত্তর কালে নারীকে রাজনৈতিক ক্ষমতার শরিক করার মতো আগ্রহ কারও মধ্যেই দেখা যায় নি। সে সময় কেন্দ্রীয় সরকারি ক্ষমতায় আসীন জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যেও না। ফলে স্বাধীনতার পরেই অধিকাংশ নারী আবার ফিরে গেছেন পরিবারের চৌহদ্দির মধ্যে, যদিও প্রয়োজনে নারীরা সব সময়ই বৃহত্তর আন্দোলনের শরিক হতে এগিয়ে এসেছেন।

আসলে পঞ্চাশ-এর দশক থেকে এখনও পর্যন্ত পুরুষ অধ্যুষিত রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে দেশের নারীশক্তিকে রাজনীতির মূলস্রোতের সাথে যুক্ত রাখার কোন ধারাবাহিক প্রচেষ্টাই হয়নি। নারীদের অনুপ্রাণিত করে দলগুলির মধ্যে তাদের অন্তর্ভুক্তির দিকেও উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। যেসব নারী পারিবারিক পরিবেশের প্রভাবে অথবা ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোন দলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন, তারাও দলের

মধ্যে সম্মানিত হয়েছেন কী? আজও প্রায় সব রাজনৈতিক দলের স্থানীয় কমিটি, জেলা কমিটি, এবং কেন্দ্রীয় কমিটিগুলিতে নারীরা উপেক্ষিত। আর এসবের ফলে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সাধারণ নারীর অংশগ্রহণ এখনও সীমিত। শুধু নির্বাচনেই নারী প্রার্থীর সংখ্যা নগণ্য নয়। নির্বাচনে নারী ভোটারের শতাংশও তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে কম।

মহিলা ভোটার

সংবিধানে সব প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার বলে ২১ এবং তদুর্ধ্ব বয়সের সব নারীই ভোটাধিকার লাভ করেন, যার প্রতিফলন ঘটে ১৯৫২ সালের নির্বাচনে। ১৯৫২ সালের নির্বাচনেই কিছু নারী প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে জয়লাভ করে রাজনৈতিক ক্ষমতার আঙিনায় প্রবেশ করেন। কিন্তু ৫০ বছর অতিক্রম করার পর আজও রাজনৈতিক ক্ষমতার দরবারে পুরুষরাই যে আধিপত্য করছেন এবং সেখানে নারীর প্রবেশাধিকার যে উপপ্রান্তিক বা প্রান্তিক স্তরের বেশি কিছু নয়, কিছু তথ্যের দ্বারাই তা প্রমাণিত হয়।

সারণি–১ (পৃঃ ১৬২) থেকে দেখা যাচ্ছে যে স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের প্রথম নির্বাচনে নারীদের ৪৫ শতাংশ ইলেকটার অর্থাৎ ভোটদাতা রূপে রেজিষ্ট্রিকৃত হয়েছিলেন। আর ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে রেজিষ্ট্রিকৃত নারী ইলেকটারের শতকরা হার ছিল প্রায় ৪৮। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কোনদিনই জনসংখ্যার অনুপাতে তারা ভোটদাতা রূপেও রেজিষ্ট্রিকৃত হন নি। সমাজ জীবনে নারীর হীনস্থানের প্রতিফলন রূপেই এর ব্যাখ্যা চলে। আবার ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ভোটদাতা রূপে রেজিষ্ট্রিকৃত নারীদের মধ্যে ৫০ শতাংশও ভোট দেন নি। ১৯৯১ এবং ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে যথাক্রমে রেজিষ্ট্রিকৃত নারীদের ৫১.৩ এবং ৪৩.৮ শতাংশ ভোট দিয়েছেন। প্রথম নির্বাচনে মোট ভোটারের মাত্র ৩৭ শতাংশ ছিলেন নারী। ১৯৯৬ সালে এই হার বেড়ে হয় ৪৩ শতাংশ। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ভোটদানের ক্ষেত্রেও পুরুষরা এগিয়ে আছেন।

এই চিত্রের জন্যও সম্ভবত রাজনৈতিক দলগুলিকেই প্রধানত দায়ী করা যায়। রাজনৈতিক দল, এমনকী মূলত মহিলাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গঠিত রাজনৈতিক দলের মহিলা শাখাগুলিতেও ভোটদাতা রূপে নারীকে

সারণি - ১

লোকসভায় নারী ইলেক্টার (ক) ও ভোটার (খ), ১৯৫২-১৯৯৬

বছর	ইলেকটার		ভোটার		মোট নারী ইলেক্টারের মধ্যে নারী ভোটারের শতাংশ	মোট ভোটারের মধ্যে নারী ভোটারের শতাংশ
	নারী	মোট	নারী	মোট		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১৯৫২	৭৭,৯৪৬,১৩৫ (৪৪.৯ শতাংশ)	১৭৩,২১৩,৬৩৫	২৯,৭৩৩,২৭০	৮০,৭০৯,২০২	৩৮.১	৩৬.৮৩
১৯৭১	১০৩,৬১৯,৬৬২ (৪৭.৬ শতাংশ)	২৭৪,০৯৪,৪৯৩	৬৪,১৫৩,৮৯৫	১৫১,৫৬৬,৮০২	৪৯.১	৪২.৩৩
১৯৯১	২৩৬,৫৩৫,৩০২ (৪৭.৪ শতাংশ)	৮৯৮,৩৬৩,৮০১	১২১,৪৭৯,৬৫৫	২৮২,৭২৫,৪৮৭	৫১.৩	৪২.৯৬
১৯৯৬	২৮২,৭৫০,৫১২ (৪৭.৭ শতাংশ)	৫৯২,৫৭২,২৮৮	১৫১,০২৮,৩০৮	৩৪৩,৩০৮,০৩৫	৪৩.৮	৪৩.০০

(ক) ভোটদাতা রূপে রেজিস্ট্রিকৃত (খ) যারা ভোট দিয়েছেন।

সূত্র : *Women in India A Statistical Profile, 1997*, Government of India, Department of Women and Child Welfare , Ministry of Human Resource Development, New Delhi, p.213.

বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে মনে হয় না। এ বিষয়ে দলের মহিলা শাখাগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা একান্ত জরুরি। নির্বাচনের ঠিক পূর্বেও দলীয় প্রতিনিধিরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরিবারের কর্তা ব্যক্তিকেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, বাড়ির মহিলাদের কথা তাদের মনে বিশেষ স্থান পায় না। দ্বিতীয়ত, মনে হয় বহু শতাব্দীর ঐতিহ্যের ফলে নারী নিজেও তার পারিবারিক কেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত হয়ে দেশের রাজনীতিতে নিজের ভূমিকার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন না। তাই ভোটদানের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে অনেক নারীই এখনও নির্লিপ্ত। ১৯৭৪ সালের দ্য কমিটি অন দ্য স্টেটাস অফ উইমেন-এর রিপোর্ট অনুযায়ী একটি সমীক্ষার অন্তর্গত অধিকাংশ নারীপুরুষ মনে করেছেন যে মহিলাদের কোন রাজনৈতিক দলে যোগ দেওয়া উচিত নয়। আর যারা একথা মনে করেছেন, তাদের মধ্যে নারীদের শতাংশই বেশি। নারীর সার্বিক সামাজিক অনগ্রসরতা, বিশেষত নারীশিক্ষার মন্থর গতিই মনে হয় এর প্রধান কারণ। ভোটদানের ব্যাপারেও নারীরা পুরুষের উপরেই যে নির্ভরশীল, তারও প্রমাণ

পাওয়া গেছে। উল্লিখিত সমীক্ষার অন্তর্গত ৪০ শতাংশ মানুষ মনে করেছেন যে পরিবারের পুরুষের মতানুযায়ীই নারীদের ভোট দেওয়া উচিত। এই মত যারা প্রকাশ করেছেন তাদের মধ্যেও নারীর শতাংশই বেশী।[১] এ হল চিরদিনের সেই পুরুষ নির্ভরতার প্রতিচ্ছবি। এই সমীক্ষাটি অবশ্য সত্তরের দশকের। এখন একুশ শতকের গোড়ায় দাঁড়িয়েও কি এই অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়েছে? তৃতীয়ত, বলা যায় যে শ্রমিক ইউনিয়নগুলি, নির্বাচনের ব্যাপারে যাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে, নারীদের সংগঠিত করতে বিশেষ উদ্যোগ নেয় না এখনও। ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মহিলা শ্রমিকের নিয়োগ এবং শিল্প ধর্মঘট নিয়ে যতখানি উদ্যোগ নিয়ে থাকেন ও যত সময় ব্যয় করেন, সাধারণ নারীদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি ও রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির জন্য ততখানি সচেষ্ট হন না। মহিলা শ্রমিকরা অনেকাংশে উপেক্ষিতই থেকে যান। চতুর্থত, গ্রামাঞ্চলের ভোট কেন্দ্রগুলি অনেক দূরে দূরে অবস্থিত হওয়ার ফলে এবং রাস্তাঘাট ও যাতায়াতের সুবন্দোবস্তের অভাবে অনেক নারী, বিশেষত বয়স্ক নারী, ভোট দিতে ব্যর্থ হন। পঞ্চমত, মহিলা ভোটারদের সংখ্যাল্পতার আরেকটি কারণ হল পরিবারের মধ্যে তাদের কর্মব্যস্ততা। নির্বাচনের দিনেও পরিবারের অবৈতনিক নারী কর্মীদের কোন ছুটি থাকে না। বরং সেদিন পরিবারের কর্তা ব্যক্তিদের ছুটি থাকার ফলে মহিলাদের বাড়ির কাজ আরও বাড়ে। তাদের ভোট দিতে যাওয়ার সময় কখন? অবশ্য এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে অনেক সময় মহিলারা বাড়ির কাজকে ভোট দিতে না যাওয়ার অজুহাত রূপেও ব্যবহার করে থাকেন। এও সেই আবহমানকালের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ঐতিহ্যের ফল। অধিকাংশ সাধারণ নারী আজও মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে গৃহস্থালি সামলানোই তাদের জীবনের আদর্শ। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের দাবির ফলে বাইরের কর্মজগৎ সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ অনেকখানি বাড়লেও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করার মতো স্পৃহা বিশেষ জাগ্রত হয়নি সাধারণ নারীদের মধ্যে।

লোকসভায় প্রতিনিধিত্ব : ১৯৫২-৭১

এই পরিস্থিতিতে উচ্চতর রাজনৈতিক ক্ষমতার অঙ্গিনায় অর্থাৎ সংসদে ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে নারীদের প্রতিনিধিত্ব যে নগণ্য হবে তা সহজেই অনুমেয়। পঞ্চাশ এবং ষাট-এর দশকে এদেশে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসই ছিল প্রধান রাজনৈতিক শক্তি। সত্তরের দশক থেকে কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব

ক্রমশ হ্রাস পাওয়ার ফলে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক শক্তির পট পরিবর্তন হয়। কিন্তু ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচন থেকে ১৯৯৮ সালের শেষতম নির্বাচন পর্যন্ত উচ্চতর ক্ষমতার দরবারে নারী প্রতিনিধিদের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। এখানে আমরা ১৯৫২ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ১৩টি লোকসভায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বিষয়ে দুটি ভাগে আলোচনা করব। প্রথমে আলোচনা করা হবে ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ৫টি নির্বাচন নিয়ে। এরপরে আলোচনা করা হবে ১৯৭৭ থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ৭টি নির্বাচন নিয়ে।

সারণি–২ (পৃঃ ১৬৫) থেকে এই সত্যই প্রকাশিত হচ্ছে যে ১৯৫২ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ৫টি লোকসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে বিরাট সিংহভাগই ছিলেন পুরুষ। ১৯৫২ সালে মোট ১৮৭৪ জন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে নারী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ৪৩ জন অথবা ২.২৯ শতাংশ। আর ১৯৭১ সালে নারী প্রতিদ্বন্দ্বীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৮৬ হলেও মোট প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে নারীরা ছিলেন মাত্র ৩ শতাংশ। ১৯৭১ সালে ৮৬ জন নারী প্রার্থীর মধ্যে জয়লাভ করেছিলেন ২১ জন অথবা ২৪.৪ শতাংশ। এই ৫টি নির্বাচনের মধ্যে ১৯৭১ সালেই নারী প্রার্থীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম জয়লাভ করেছিলেন। কিন্তু একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয় যে নারী প্রার্থীদের সংখ্যা অত্যল্প হলেও প্রতিটি নির্বাচনেই পুরুষ প্রার্থীর অপেক্ষা নারী প্রার্থীর জয়ের হার ছিল অনেক বেশি। আর সারণী–২ আমাদের এ তথ্যও দিচ্ছে যে ১৯৫২ সালে লোকসভার সাংসদদের মধ্যে মাত্র ২.৮৫ শতাংশ ছিলেন মহিলা। আর এই শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭১ সালে দাঁড়ায় ৪.৮।

সেই সময়ের রাজনৈতিক ক্ষমতার সমীকরণে স্বাভাবিক কারণেই লোকসভার নির্বাচনে মহিলা প্রার্থী এবং বিশেষত নির্বাচিত মহিলা সাংসদদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের দলভুক্ত। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসের ১৪ জন মহিলা প্রার্থী জয়ী হয়ে লোকসভায় প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আর কংগ্রেসের মহিলা প্রার্থীর এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬৭ সালে দাঁড়ায় ৩৬। ১৯৬৯ সালে কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হওয়ার ফলে ১৯৭১ সালের নির্বাচনে ইন্দিরা কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন ২১জন মহিলা। আর কংগ্রেস(ও) র প্রার্থী তালিকায় ছিলেন ১৪ জন মহিলা। তবে কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে এই ৩৫ জন মহিলা প্রার্থীর মধ্যে অনেকেই জয়লাভ করতে পারেন নি।[২] এখানে উল্লেখ্য যে ১৯৫৭ সাল থেকেই কংগ্রেসের মুখপত্রে

১৫ শতাংশ নারীকে নির্বাচনের টিকিট দেওয়ার কথা বার বার ঘোষণা করা হলেও কার্যত কোন বছরই এই নীতি অনুসরণ করা হয়নি। এই সময় লোকসভাগুলিতে কংগ্রেসের যেসব মহিলা প্রতিনিধিত্ব করেছেন, তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন তারকেশ্বরী সিন্‌হা, সুভদ্রা যোশী, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, রাজকুমারী অমৃত কাউর, ইলা পাল চৌধুরী, ইন্দিরা গান্ধী, সুচেতা কৃপালিনী, সুশীলা নায়ার, সুশীলা রোহতগি, সরোজিনী মহিষী, উমা নেহেরু প্রভৃতি।

সারণি - ২

লোকসভায় নির্বাচন প্রার্থী এবং নির্বাচিত সদস্য ঃ ১৯৫২-১৯৭১

বছর	প্রার্থী			নির্বাচিত			
	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	লোকসভায় নারী সাংসদদের শতাংশ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১৯৫২	১৮৭৪	১৮৩১	৪৩ (২.২৯)	৪৮৯	৪৭৫ (২৫.৯)	১৬ (৩২.৫)	২.৮৬
১৯৫৭	১৫১৯	১৪৭৪	৪৫ (২.৭৬)	৪৯৪	৪৬৭ (৩১.৬)	২৭ (৬০.০)	৪.৪০
১৯৬২	১৯৬২	১৯১৫	৭০ (৩.৫২)	৪৯৪	৪৫৯ (২৩.৯)	৩৫ (৫০.০)	৭.০৮
১৯৬৭	২৩৬৯	২৩০০	৬৯ (২.৯১)	৫২০	৪৮৯ (২১.২)	৩১ (৪৪.৯)	৫.৯৬
১৯৭১	২৭৮৪	২৬৯৮	৮৬ (৩.০)	৫১৪	৪৯৭ (১৮.৪২)	২১ (২৪.৮)	৪.৮

সূত্র ঃ *Women in India : A Statistical Profile, 1997*, Government of India, Ministry of Human Resource Development, p. 213

প্রথম লোকসভায় অবিভক্ত ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির মহিলা সাংসদ ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রেণু চক্রবর্তী। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে রেণু চক্রবর্তী পুনর্নির্বাচিত হন। আর মধ্যপ্রদেশ থেকে কম্যুনিষ্ট মহিলা সাংসদ হন শ্রীমতী পার্বতী কৃষ্ণান। ১৯৬২ সালে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর ১৯৭১ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পঞ্চম লোকসভায় সি.পি.আই.এম-এর সাংসদ হন

পশ্চিমবঙ্গের বিভা ঘোষ গোস্বামী। কিষান মজদুর প্রজা পার্টি এবং স্বতন্ত্র পার্টির অল্প কিছু মহিলা সাংসদও এই সময়ে ছিলেন।[৩]

উল্লেখ্য উপরোক্ত সময়ে লোকসভায় মহিলা সাংসদদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন উচ্চ অথবা উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারভুক্ত। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কালে পারিবারিক পরিমণ্ডলের মধ্য থেকেই এরা রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। একদা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষেত্রেও একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তার ব্যতিক্রমী পর্যায়ের রাজনৈতিক কূটবুদ্ধির বিকাশ ঘটেছিল নেহেরু পরিবারের পরিবেশের মধ্যেই। পুরানো রাজপরিবারভুক্ত মহিলা সাংসদদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন গোয়ালিয়র-এর বিজয় রাজে সিন্ধিয়া ও জয়পুরের গায়ত্রী দেবী। এসব উচ্চবিত্তের মহিলারা তাদের পিতা/স্বামী/ভ্রাতা প্রভৃতির সূত্র ধরেই রাজনীতিতে এবং সংসদে প্রবেশ করেছেন। এস. ডি. মুনি সত্তরের দশকের গোড়ায় তার সমীক্ষার পর যথার্থই বলেছেন, "Those women who enter the democratic race for power come from economically very well off families. They themselves and/or their close relations, such as the father, husband, or brother, own either large land acreage, industrial units, big business, or other sources of substantial income."[৪] অর্থবল ছাড়াও শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকারী হওয়ার ফলে রাজনীতি ক্ষেত্রেও এরা ছিলেন পরিশীলিত, আর এদের সামাজিক মর্যাদাও ছিল উচ্চস্তরের। এই উচ্চ সামাজিক মর্যাদা সম্পন্ন নারীদের অনেকেই (৩০-৪০ শতাংশ) বেশ কয়েকবার লোকসভায় পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। নতুন মুখ বেশি দেখা যায়নি, কারণ সামাজিক মর্যাদার এবং বিশেষত অর্থবলের অভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এবং জয়ী হওয়া ছিল এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

এই ৫টি লোকসভায় মহিলা সাংসদদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন উচ্চবর্ণ হিন্দু। শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং অর্থবলের জন্যই উচ্চবর্ণের হিন্দু নারীরা রাজনীতির ক্ষমতার দরবারে কিছুটা স্থান করে নিতে পেরেছিলেন, যা নিম্নবর্ণের এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারীদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তবে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মধ্যপ্রদেশ থেকে কিছু তপশিলী জাতি/উপজাতি এবং মুসলিম মহিলা কংগ্রেসের হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, আর এই কারণেই রাজ্যভিত্তিক মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে মধ্যপ্রদেশের প্রার্থীরাই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ।[৫] তবে তপশিলী জাতি/উপজাতি এবং মুসলিমদের মধ্যেও শিক্ষা এবং আর্থিক দিক দিয়ে উচ্চস্তরে অবস্থিত কিছু মহিলাই নির্বাচনের

টিকিট লাভ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে মধ্যপ্রদেশের রায়গড় নির্বাচন অঞ্চল থেকে রাণী কেশর কুমারী দেবী কংগ্রেসের টিকিটে তিনবার নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন। আর ১৯৫৭ সাল থেকে আসামের মুসলিম প্রধান নির্বাচনী অঞ্চল জোরহাট থেকে কংগ্রেসের টিকিট পেয়েছিলেন বেগম মফিতা বেগম।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে এই ৫টি লোকসভা নির্বাচনে মোট ২৬ জন মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। আর এদের মধ্যে ১০ জন, অর্থাৎ ৩৮.৪৬ শতাংশ জয়ী হয়েছিলেন।[৬] এই ১০ জনের মধ্যে ৫ জন ছিলেন কংগ্রেসের প্রার্থী, ৩ জন সি.পি.আই এবং ২ জন সি.পি.আই.এম-এর প্রার্থী। ১৯৫২ সালে লোকসভায় নির্বাচিত মহিলা সাংসদদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র সাংসদ ছিলেন সি.পি.আই-এর রেণু চক্রবর্তী। ১৯৫৭ সালে রেণু চক্রবর্তী পুনর্নির্বাচিত হন। তাছাড়া, ঐ বছর পশ্চিমবঙ্গ থেকে আরও নির্বাচিত হয়েছিলেন কংগ্রেসের রেণুকা রায় এবং ইলা পালচৌধুরী। ১৯৬২ সালের নির্বাচনের পর তৃতীয় লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র সাংসদ ছিলেন রেণুকা রায়। আর ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পর চতুর্থ লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গের মহিলা সাংসদ ছিলেন ২ জন, কংগ্রেসের শ্রীমতী উমা রায় এবং ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু। পঞ্চম লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গের সাংসদ ছিলেন কংগ্রেসের শ্রীমতী মায়া রায় এবং সি.পি. আই.এম-এর শ্রীমতী বিভা ঘোষ গোস্বামী।[৭] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে প্রথম লোকসভায় মহিলা সাংসদের মোট সংখ্যা ১৬ থেকে বেড়ে পঞ্চম লোকসভায় ২১ হয়, আর ঐ একই সময়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে লোকসভায় মহিলা সাংসদের সংখ্যা মাত্র ১ থেকে বেড়ে হয় ২। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে স্বাধীনতা আন্দোলনে এবং গণআন্দোলনে বাংলার নারীদের অগ্রণী ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন বিশেষ ঘটেনি। মধ্যপ্রদেশের নারীর ক্ষমতায়নই ছিল সর্বাধিক।

শ্রীমতী নির্মলা ব্যানার্জী সত্তরের দশকের গোড়ায় তার সমীক্ষায় দেখেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গেও সাধারণভাবে শিক্ষিত, উচ্চ আয় সম্পন্ন উচ্চবর্ণের পরিবারের মহিলারাই সক্রিয় রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। আর সাধারণভাবে এরা ছিলেন পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সের। শ্রীমতী ব্যানার্জী এখানে বলতে চেয়েছেন, যেসব অল্প বয়সী মহিলারা স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন, তারাই পরবর্তীকালের রাজনীতিতেও সক্রিয় ছিলেন। স্বাধীনতা-উত্তর প্রজন্মের নারীদের মধ্যে সেই রাজনৈতিক চেতনার ধারা প্রবাহিত হয়নি। শ্রীমতী ব্যানার্জীর নিজের কথায়, "In West Bengal, the

tradition of women participating in activities outside their families and social circles is yet to develop...The independence struggle acted as a stimulus to political activities. Since then such a force is lacking in West Begal."[৮] পরবর্তী দশকগুলিতেও একই ধারা চলছে কিনা তা-ই বিবেচনা সাপেক্ষ।

লোকসভায় প্রতিনিধিত্ব : ১৯৭৭-১৯৯৮

সারণি-৩ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৭৭ সালে লোকসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে মহিলা প্রার্থীরা ছিলেন অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ (২.৮৭ শতাংশ)। মহিলা প্রার্থীদের এই শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৬ সালে দ্বাদশ লোকসভায় ৪.২৯ শতাংশ দাঁড়ায়।

সারণি – ৩

লোকসভায় পুরুষ ও নারী নির্বাচন প্রার্থী এবং নির্বাচিত সদস্য : ১৯৭৭-৯৮

বছর	প্রার্থী			নির্বাচিত			
	মোট	পুরুষ	নারী	মোট	পুরুষ	নারী	লোকসভায় নারী সাংসদদের শতাংশ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১৯৭৭	২৪৩৯	২৩৬৯	৭০ (২.৮৭)	৫৪২	৫২৩ (২২.০৭)	১৯ (২৭.১৪)	৩.৬০
১৯৮০	৪৬২০	৪৪৭৮	১৪২ (৩.০৭)	৫৪২	৫১৪ (১১.৪৭)	২৮ (১৯.৭১)	৫.১৬
১৯৮৪	৫৩১৩	৫১৪৯	১৬৪ (৩.০৮)	৫২৮	৪৮৬ (৯.৪৩)	৪২ (২৫.৬০)	৭.৯০
১৯৮৯	৬৬১০	৫৯৬২	১৯৮ (২.৯৯)	৫২৯	৫০২ (৮.৪১)	২৭ (১৩.৬৩)	৫.১০
১৯৯১	৮৬৯৯	৮৩৭৪	৩২৫ (৩.৭৩)	৫২১	৪৮৪ (৫.৭৭)	৩৭ (১১.৩৮)	৭.১০
১৯৯৬	১৩,৯৫২	১৩,৩৫৩	৫৯৯ (৪.২৯)	৫৪৩	৫০৩ (৩.৭৬)	৪০ (৬.৬৭)	৭.৩৬
১৯৯৮ (1998 CSDS data.)				৫৪৩	৫০০	৪৩	৭.৯২

সূত্র : *Women in India : A Statistical Profile, 1997*, Government of India, Ministry of Human Resource Development, New Delhi, p.213.

প্রধানত মহিলাদের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলির পৃষ্ঠপোষকতার অভাবের দ্বারাই লোকসভায় মহিলা প্রার্থীর সংখ্যাল্পতা ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে ১৯৭৭ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত প্রতিটি নির্বাচনে মহিলাদের মধ্যে জয়লাভের হার ছিল পুরুষদের অপেক্ষা অনেক বেশি, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রায় দ্বিগুণ অথবা তারও বেশি। ১৯৭৭ সালে পুরুষ এবং মহিলা প্রার্থীদের জয়লাভের হার ছিল যথাক্রমে ২২.০৭ এবং ২৭.১৪। আর পরবর্তী নির্বাচনগুলিতে পুরুষ ও নারী, উভয়েরই জয়লাভের হার ক্রমাগত কমে এলেও ১৯৯৬ সালে নির্বাচিত পুরুষ সদস্যের হার (৩.৭৬) অপেক্ষা নির্বাচিত মহিলা সদস্যের হার (৬.৬৭) ছিল প্রায় দ্বিগুণ। নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলি অনেক সময় প্রার্থীর গুণাগুণ বিচার না করেই পুরুষ প্রার্থী দাঁড় করান। অনেক রাজনীতি মনস্ক পুরুষরা আবার নিজেদের নিরপেক্ষ রাজনৈতিক ভাবমূর্তি তৈরী করার উদ্দেশ্যে নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই এদের মধ্যে জয়লাভের হার হয় কম। বিপরীতে প্রধানত অর্থনির্ভর নির্বাচনে সাধারণভাবে মহিলাদের প্রতি রাজনৈতিক দলগুলির অনীহা থাকার ফলে উচ্চবর্গের প্রায় নিশ্চিত সম্ভাব্য জয়ী কিছু প্রার্থীই শুধু দলের সমর্থন পান। নির্দল মহিলা প্রার্থী প্রায় নেই বলহে চলে। ফলে মহিলা প্রার্থীদের মধ্যেই জয়লাভের হার হয় বেশি। সারণি-৩ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৭৭ সাল থেকে মহিলা সাংসদদের হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েও ১৯৯৮সালের নির্বাচনেও তা ৮ শতাংশে পৌঁছায় নি। অর্থাৎ বর্তমানের ত্রয়োদশ লোকসভার সাংসদদের মধ্যেও ৯০ শতাংশের বেশি অধিকার করে আছেন পুরুষরা। এ হল ভারতীয় সমাজে সামগ্রিক ভাবে নারীর পারিবারিক এবং সামাজিক অবস্থানেরই রাজনৈতিক প্রতিফলন।

পঞ্চাশ এবং ষাট-এর দশকের মতো সত্তর এবং আশির দশকেও দেখা গেছে যে জন্মসূত্রে অথবা বিবাহসূত্রে উচ্চশ্রেণীভুক্ত এবং রাজনৈতিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত মহিলারাই সাধারণভাবে লোকসভায় ক্ষমতার আসন অলংকৃত করেছেন। অধিকাংশ মহিলা সাংসদই উচ্চ আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক স্থানে অবস্থিত কোন ব্যক্তির স্ত্রী, ভগ্নী অথবা কন্যা। কোন না কোন কারণে নিজের পক্ষে জয়ী হওয়া সম্ভব নয় মনে করে পুরুষরাই কখনও কখনও পরিবারের মহিলাদের প্রার্থী হতে সাহায্য করেছেন। এতে পারিবারিক রাজনৈতিক ক্ষমতা ধরে রাখা যায়, আর পরের নির্বাচনে পুরুষের পক্ষে সেই আসনে দাঁড়িয়ে জয়লাভের সম্ভবনাও কিছুটা থেকে যায়। এক্ষেত্রে মহিলারা শুধু পুরুষের প্রতীক রূপেই থাকেন। অনেক সময় আবার স্বামী স্ত্রী উভয়েই

একই অঞ্চলে একই রাজনীতির সাথে জড়িত থেকেছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবার পক্ষে নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে জয়লাভ করার উদাহরণও আছে বেশ কিছু। প্রাথমিক পর্যায়ে এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শ্রীমতী ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ, শ্রীমতী মানেন্দ্রমোহন চৌধুরী (আসাম) এবং শ্রীমতী ইন্দুবালা সুমাদিয়া(রাজস্থান)। অবশ্য প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে আশির দশকের মধ্যভাগ থেকে কিছু স্বাধীনচেতা, নিজগুণে গুণান্বিতা, রাজনৈতিকভাবে সচেতন নারীকেও সংসদে দেখা গেছে। তবে সংখ্যায় এরা নিতান্তই অল্প। আর উল্লেখ্য যে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অসুবিধাভোগী নিম্নবর্গের মহিলাদের লোকসভায় প্রতিনিধিত্ব নিতান্তই যৎসামান্য। ১৯৯৬ সালে লোকসভায় যে ৪০ জন মহিলা নির্বাচিত হন, তাদের মধ্যে মাত্র ২ জন, উত্তরপ্রদেশের ফুলনদেবী এবং পশ্চিমবঙ্গের সন্ধ্যা বাউড়ি, ছিলেন তপশিলী জাতিভুক্ত।[৯] ১৯৯৮ সালে উত্তরপ্রদেশ থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন মায়াবতী। আর মধ্যপ্রদেশের উমা ভারতী হলেন অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী (ওবিসি) ভুক্ত।

ত্রয়োদশ লোকসভায় নির্বাচিত ৪৩ জন মহিলা সাংসদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ছিলেন ৫ জন। এই ৫ জন হলেন সিপিআই-এর গীতা মুখ্যার্জি (সম্প্রতি প্রয়াত) তৃণমূলের মমতা ব্যানার্জী ও কৃষ্ণ বসু এবং সিপিআই-এম-এর মিনতি সেন ও সন্ধ্যা বাউড়ি(তপশিলী)। তবে এখানেও বিগত কয়েকটি নির্বাচনে একই মহিলারা একাধিকবার নির্বাচিত হয়েছেন। নতুন আলোর প্রবেশ বিশেষ ঘটেনি।

উল্লেখ্য যে বর্তমানে সাধারণ নারীদের মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা অনেকখানি বজায় থাকলেও মনে হয় এখন লোকসভায় মহিলা সাংসদদের সংখ্যাল্পতার অন্যতম কারণ হল তাদের আর্থিক সঙ্গতির অভাব। রাজনীতিতে অনীহা অথবা যোগ্যতার অভাব নয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরে এখন বেশ কিছু রাজনীতি মনস্ক মহিলার দেখা পাওয়া যায়। উপযুক্ত রাজনৈতিক যোগাযোগ এবং আর্থিক সঙ্গতির অভাবই এদের নির্বাচনে দাঁড়াবার পথে প্রধান অন্তরায়। প্রত্যেক প্রার্থীর জন্য যে অঢেল পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয়, তার অনেকাংশই বহন করতে হয় প্রার্থীকে। আর সেই সঙ্গে আছে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন। অর্থের এবং দুর্বৃত্তায়নের এই নির্বাচনে নারীদের পক্ষে পিছিয়ে থাকাই স্বাভাবিক। আর অনেকখানি এই কারণেই বিত্তশালী এবং দীর্ঘকাল রাজনীতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত পরিবার থেকে উঠে আসা নারী অথবা কোন রাজনৈতিক দলের বহুদিনের সক্রিয় কর্মী ব্যতীত নির্বাচনে নারীর পক্ষে প্রার্থী হওয়া সহজ হয় না। অনেক সময় আবার যথেষ্ট রাজনৈতিক সচেতনতা এবং আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও

প্রধানত পারিবারিক কারণেই নারীর পক্ষে দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক কর্মীরূপে কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, এবং ফলে রাজনৈতিক ভবিষ্যৎও উজ্জ্বল হয় না।

উল্লেখ্য যে লোকসভার মহিলা সাংসদদের মধ্যে অল্পকিছু মহিলা মন্ত্রিত্বের দায়িত্বও পেয়েছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে বেশির ভাগই হলেন রাষ্ট্রমন্ত্রী, ক্যাবিনেট মন্ত্রী নন। মন্ত্রিত্বের দপ্তর বন্টনেও আছে লিঙ্গ বৈষম্য। স্বাস্থ্য, শিশু ও নারী কল্যাণ, তথ্য ও সম্প্রচার, সামাজিক কল্যাণ প্রভৃতি কয়েকটি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরই সাধারণত মহিলাদের দেওয়া হয়। গুরুত্বপূর্ণ শিল্প, বাণিজ্য, স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও বিদেশ মন্ত্রক-এ থাকে পুরুষদের একচেটিয়া আধিপত্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পঞ্চাশের দশকে রাজকুমারী অমৃত কাউর ছিলেন পূর্ণমন্ত্রী (স্বাস্থ্য দপ্তর)। আর সেই সময় শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন এবং তারেকশ্বরী সিন্‌হা যথাক্রমে বিদেশ মন্ত্রকের ডেপুটি মন্ত্রী এবং অর্থ বিষয়ক ডেপুটি মন্ত্রী ছিলেন। যাট এবং সত্তরের দশকে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিভিন্ন সময়ে অটোমেটিক এনার্জি, প্ল্যানিং, অর্থ, স্বরাষ্ট্র, বিজ্ঞান ও কারিগরি এবং বিদেশ মন্ত্রক-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলিকে নিজের হাতেই রেখেছিলেন।[১০] কিন্তু এগুলি হল ব্যতিক্রমী উদাহরণ। ইদানীং কালেও খুব সামান্য সংখ্যক মহিলাকেই পূর্ণমন্ত্রী অথবা রাষ্ট্রমন্ত্রী রূপে পাওয়া যায়। বর্তমানে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স সরকারে (২০০১) ৩০ জন পূর্ণমন্ত্রীর মধ্যে মহিলা আছেন মাত্র ৩ জন। প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী তার স্নেহধন্যা শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জীকে পূর্ণমন্ত্রী রূপে গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে দপ্তরের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীমতী মমতা তার কীর্তিকলাপের ফলে স্বেচ্ছায় তা হারিয়েছেন। শ্রীমতী সুষমা স্বরাজ ও উমা ভারতী যথাক্রমে যোগাযোগ ও সম্প্রচার এবং যুববিভাগ ও স্পোর্টস এর পূর্ণমন্ত্রী রূপে আসীন আছেন। আর ৪৫ জন রাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে ৬ জন আছেন মহিলা। এদের মধ্যে শ্রীমতী মানেকা গান্ধী (সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন) এবং বসুন্ধরা রাজে (ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প) স্বাধীন দায়িত্বে আছেন। এদের উপরে কোন ক্যাবিনেট মন্ত্রী নেই। বাকি ৪ জন মহিলা রাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন বিজয়া চক্রবর্তী (জলসম্পদ) জয়ন্তী মেহ্‌টা (শক্তি, রীতা ভার্মা (গ্রামোন্নয়ন) এবং সুমিত্রা মহাজন (মানব সম্পদ উন্নয়ন)। গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিত্বের দপ্তরে মহিলাদের সংখ্যাল্পতার জন্য সাধারণভাবে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মানসিকতাকেই দায়ী করা যায়।

মহিলা সাংসদদের সম্বন্ধে বলা যায় যে এদের অধিকাংশই লোকসভায় নীরব দর্শক নন, রীতিমত সরব। পঞ্চাশ-এর দশক থেকেই মহিলা সাংসদরা নানা বিষয়ে

প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, রেজোল্যুশন পেশ করেছেন, এবং বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছেন।[১১] আর মন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা মহিলারাও যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গেই নিজ নিজ দপ্তরের দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে একথাও সত্য যে প্রথমদিকে নারী সাংসদদের মধ্যে শিল্প ও নারী বিষয়ক চিন্তাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। দ্য উইমেনস্ অ্যাণ্ড চিলড্রেনস্ ইনস্টিটিউশনস লাইসেনসিং বিল, দ্য অ্যাডপশন অফ চিলড্রেনস্ বিল, হিন্দু ম্যারেজ বিল ও অ্যান্টি ডাউরি বিল প্রভৃতিতে নারীরাই বেশি সরব হয়েছেন। কোন কোন বামপন্থী মহিলা সাংসদ অবশ্য (রেণু চক্রবর্তী এবং গীতা মুখার্জী) ট্রেড ইউনিয়ন, ওয়ার্কার্স কমপেনসেশন বিল এবং ফ্যাক্টরিস অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নিয়ে বক্তব্য রেখে তাদের সমাজবাদী আদর্শের প্রমাণ রেখেছেন। গত পাঁচ-ছ বছর যাবৎ লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভায় মহিলাদের আসন সংরক্ষণের বিষয় নিয়ে যে বিতর্ক চলছে, তাতেও অতি স্বাভাবিক কারণেই মহিলারা (এ বিষয়টি দশম পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। আর কিছু মহিলা সাংসদ আন্তর্জাতিক স্তরের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও তাদের সুচিন্তিত বক্তব্য রেখেছেন। তবে একথাও সত্য যে কিছু মহিলা সংসদে সর্বদাই প্রায় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। তবে সংখ্যায় এরা অল্প। আর এ রকম কিছু নীরব দর্শক তো পুরুষ সাংসদদের মধ্যেও থাকে।

রাজ্যসভায় প্রতিনিধিত্ব

লোকসভার তুলনায় রাজ্যসভায়ও মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বেশি কিছু ভালো নয়। সারণি-৪ (পৃঃ ১৭৩) এ প্রদত্ত রাজ্যসভায় মহিলা প্রতিনিধিদের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৫২ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত রাজ্যসভায় মোট আসনের মধ্যে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব ছিল গড়ে ৯ শতাংশ, অর্থাৎ লোকসভার মতো রাজ্যসভায়ও সাংসদদের মধ্যে ৯০ শতাংশের বেশি হলেন পুরুষ। রাজ্য সভায় বিভিন্ন রাজ্যভিত্তিক মহিলা সাংসদের বিস্তারিত তথ্য সুলভ নয়। তবে এটুকু বলা যায় যে ১৯৭৮ সালে রাজ্যসভায় মোট ২৪ জন মহিলা সাংসদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সাংসদ ছিলেন ৩ জন। এরা হলেন কংগ্রেসের শ্রীমতী পূরবী মুখার্জী, প্রতিমা বোস এবং সি.পি.আই.এম-এর কনক মুখার্জি। এই সময় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ক্ষমতার যে নতুন সমীকরণ ঘটে তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় পরবর্তীকালের রাজ্যসভায়। ১৯৮২ এবং ১৯৮৬ সালে রাজ্যসভায় পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন সি.পি.আই.এম-

এর শ্রীমতী কনক মুখার্জি। তবে ১৯৮২ এবং ১৯৮৬ এই দুই বারই অধ্যাপিকা ডঃ অসীমা চাটার্জি ছিলেন রাজ্যসভায় নমিনেটেড সাংসদ। আর ১৯৯৮ সালের রাজ্যসভায় পশ্চিমবঙ্গের মোট ১৪ জন প্রতিনিধির মধ্যে মহিলা প্রতিনিধি ছিলেন মাত্র ২ জন। শ্রীমতী ভারতী রায় (সি.পি.আই.এম) এবং চন্দ্রকলা পাণ্ডে(সি.পি.আই.এম)। ১৯৯৯ সাল থেকে রাজ্যসভায় পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় মহিলা প্রতিনিধি আছেন শ্রীমতী সরলা মাহেশ্বরী। লক্ষ্যণীয় যে এই তিনজন মহিলার মধ্যে দুজন অতি উচ্চবিত্ত এবং

সারণি-৪

রাজ্যসভায় মহিলা সাংসদদের সংখ্যা ও শতাংশ, ১৯৫২-১৯৯৮

বছর	আসনসংখ্যা	মহিলা সাংসদ	মহিলা সাংসদের শতাংশ
১৯৫২	২১৯	১৬	০৭.৩১
১৯৫৭	২৩৭	১৮	০৭.৫৯
১৯৬২	২৩৮	১৮	০৭.৫৬
১৯৬৭	২৪০	২০	০৮.৩৩
১৯৭১	২৪৩	১৭	০৭.০০
১৯৭৭	২৪৪	২৫	১০.২৫
১৯৮০	২৪৪	২৪	০৯.৮৪
১৯৮৪	২৪৪	২৮	১১.৪৮
১৯৮৯	২৪৫	২৪	০৯.৮০
১৯৯১	২৪৫	৩৮	১৫.৫১
১৯৯৬	২২৩	১৯	০৮.৫২
১৯৯৮	২৪৫	১৫	০৬.১২
গড়	২৩৯	২২	০৯.১১

সূত্র ঃ সি. এস. ডি. এস

একজন উচ্চবিত্ত পরিবারভুক্ত। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারা ক্ষমতার আঙিনায় প্রবেশ করার সুযোগ পান খুব কমই। আর লোকসভার মতো রাজ্যসভাতেও তপশিলী জাতি/উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর নারীর স্থান চোখে না

পড়ার মতো। তন্ন তন্ন করে খুঁজে রাজ্যসভায় পাওয়া যায় উত্তরপ্রদেশের তপশিলী জাতিভুক্ত মায়াবতী ও মীরাকুমারকে। সাধারণ নারীর তুলনায় নিম্নবর্ণের নারীর অধিকতর আর্থসামাজিক অনগ্রসরতাই (প্রথম পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে) মূলত এজন্য দায়ী। কিন্তু নিম্নবর্গের নারীর আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ন ব্যতীত গণতন্ত্রই মূল্যহীন হয়ে পড়ে, আর সামাজিক ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার কথাও হাস্যকর শোনায়। এখানে উল্লেখ্য যে ১৯৯৮ সালে মায়াবতী উত্তরপ্রদেশ থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হয়ে ভারতীয় সমাজবাদী পার্টির দলনেত্রী হয়েছেন।

রাজ্য বিধানসভায় প্রতিনিধিত্ব

বিভিন্ন রাজ্য এবং ইউনিয়ন অঞ্চলের বিধানসভাগুলিতেও মহিলাদের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। সারণি-৫ (পৃঃ ১৭৫) থেকে দেখা যাচ্ছে যে ১৯৫২ থেকে ১৯৯৮-৯৯ সাল পর্যন্ত রাজ্য এবং ইউনিয়ন অঞ্চলে মহিলা সদস্যদের শতাংশের উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয় নি। ১৯৫৭ সালে সারা ভারতে গড়ে মহিলারা মাত্র ৬.৩ শতাংশ আসন অধিকার করেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিধানসভায় মহিলা বিধায়কের শতাংশের অনেকখানি তারতম্য লক্ষিত হলেও ১৯৯৮-৯৯ সালে সারা ভারতের রাজ্য এবং ইউনিয়ন অঞ্চলের বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব ছিল মাত্র ৬ শতাংশ। একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হল এই যে শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর রাজ্যগুলির মহিলা প্রতিনিধিত্ব অনগ্রসর রাজ্যগুলির অপেক্ষা বেশি নয়। সাধারণভাবে দিল্লি, হরিয়ানা, পাঞ্জাব ও অন্ধ্রপ্রদেশের মহিলা প্রতিনিধিত্ব রাজ্য ও ইউনিয়ন অঞ্চল অপেক্ষা বেশি কিন্তু রাজ্যগুলির শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মানের সাথে মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ লক্ষিত হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে কেরল রাজ্যে নারী শিক্ষার হার সর্বোচ্চ (৯৭ শতাংশ), আর রাজস্থানে নারী শিক্ষার হার মাত্র ২০ শতাংশ। সামগ্রিক উন্নয়নের দিক দিয়েও কেরালা রাজ্য রাজস্থানের তুলনায় অনেক সামনের সারিতে। তথাপি ১৯৫২ থেকে ১৯৯৮-৯৯ সাল পর্যন্ত কেরালা অপেক্ষা রাজস্থানের বিধানসভাতে মহিলারা অনেক বেশি হারে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আর মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম ও নাগাল্যাণ্ড প্রভৃতি আদিবাসী অধ্যুষিত পাহাড়াঞ্চলে, যেখানে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের ঐতিহ্য এখনও কিছু বিদ্যমান আছে, বিধানসভায় মহিলা প্রতিনিধিত্ব খুবই কম। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব মধ্যস্তরের।

সারণি–৫

বিধানসভায় মহিলাদের ক্রমহ্রাসমান প্রতিনিধিত্ব, ১৯৫২-১৯৯৭ (মহিলা বিধায়কদেব শতাংশ)

ক্রমিক নং	রাজ্য	১৯৫২	১৯৫৭	১৯৬০—৬৫	১৯৬৭—৬৯	১৯৭০—৭৫	১৯৭৭—৭৮	১৯৭৯—৮৩	১৯৮৪—৮৮	১৯৮৯—৯২	১৯৯৩—৯৭	১৯৯৮—৯৯	রাজ্য গড়
১।	অন্ধ্রপ্রদেশ	২.৯	৩.৭	৩.৩	৩ ৮	৯ ১	৩ ৩	৪ ১	৩.৪	৩.৭	২.৭	৯ ৫	৪ ৬
২।	অরুণাচল প্রদেশ	…	..				০ ০	৩ ৩	৬.৭	৩.৩	৩.৩	১.৭	৩.০
৩।	আসাম	০.৫	৪ ৬	৩.৮	৪ ০	৭ ০	০ ৮	০ ৮	৪.০	৪ ০	৪.৮	..	৩.২
৪।	বিহার	৩.৬	৯.৪	৭.৯	২.২	৩.৮	৪ ০	৩ ৭	৪.৬	২ ৮	৩ ৪		৪ ৩
৫।	গোয়া	…		.	৬ ৭	৩ ৩	৩ ৩	০ ০	০.০	৫ ০	১০.০	৫ ০	৪ ৪
৬।	গুজরাট	…	..	৮ ৪	৪ ৮	৩ ২	.	২ ৭	৮ ৮	২.২	১.১	২.২	৪.০
৭।	হরিয়ানা	…	.	.	৭ ৪	৬ ২	৪.৪	৭ ৮	৫.৬	৬.৭	৪ ৪	.	৬ ২
৮।	হিমাচল প্রদেশ	০.০	..	..	০ ০	৫ ৯	১.৫	৪ ৪	৪.৪	৫ ৯	৪.৪	৮ ৮	৪ ২
৯।	জম্মু ও কাশ্মীর	…	.	০.০	০.০	৫ ৩	১ ৩	০ ০	১.৩	. .	২ ৩		১.৫
১০।	কর্ণাটক	২.০	৮.৭	৮.৭	৩.২	৫ ১	৪ ০	০ ৯	৩ ৬	৪.৫	৩.১	২.৩	৪ ৩
১১।	কেরালা	০.০	৪.৮	৩.৯	০ ৮	১ ৫	০ ৭	৩ ২	৫ ৭	৫ ৭	৯ ৩		৩.৬
১২।	মধ্যপ্রদেশ	২.১	১০.৮	৪ ৯	৩ ৪	৫ ৪	৩ ১	৫ ৬	৯.৭	৩ ৪	৩.৮	৮ ১	৫.৪
১৩।	মহারাষ্ট্র	১.৯	৬.৩	৪.৯	৩ ৩	৯ ৩	২ ৮	৬ ৬	৫ ৬	২.১	৩ ৮	৪.২	৪.৬
১৪।	মণিপুর	…	.	..		০ ০		০ ০	০ ০	১.৭	০.০		০ ৩
১৫।	মেঘালয়	…	.			১ ৭	১ ৭	০ ০	৩.৩		১ ৭	৫ ০	২ ২
১৬।	মিজোরাম	…	.			০ ০	৩ ৩	৩ ৩	১ ৭	০ ০	০ ০	০.০	১.২
১৭।	নাগাল্যাণ্ড	…	. .		০ ০			০ ০	১ ৭	…	০ ০		০ ৫
১৮।	ওড়িশা	৯ ৬	৩.৬	১.৪	৩ ৬	১ ৪	৪ ৮	৩.৪	৬ ১	৪ ৮	৫ ৪		৪ ০
১৯।	পাঞ্জাব	২.২	৫.৮	৫ ২	১ ০	৫ ৮	২ ৬	৫ ১	৩ ৪	৫.১	৬.০	.	৪ ০
২০।	রাজস্থান	০.০	৫.১	৪.৫	৩ ৩	৭ ১	৪ ০	৫ ০	৮ ০	৫ ৫	৪.৫	৭.০	৫ ০
২১।	সিকিম	…	..	..				০ ০	০ ০	৬ ৩	৩ ১	৩ ১	২ ৫
২২।	তামিলনাড়ু	০.৩	৫.৯	৩ ৯	১ ৭	২ ১	০ ৯	২ ১	৩.৪	৯.০	৩.৮		৩ ৬
২৩।	ত্রিপুরা	..	…	.		৩ ৩	১ ৭	৬ ৭	৩ ৩	.	১.৭	.	৩ ০
২৪।	উত্তরপ্রদেশ	১.২	৫.৮	৪.৪	২ ৮	৫ ৯	২ ৬	৫ ৬	৭.৩	৩.৩	৪ ০		৪.১
২৫।	পশ্চিমবঙ্গ	০.৮	৩.৬	৪.৮	২ ৯	১.৬	১ ৪	২ ৪	৪ ৪	৭ ১	৬.৮	.	৩.৪
২৬।	দিল্লি	৪.২	..	..		৭.১	৭ ১	৭.১	..		৪ ৩	১২.৯	৭.৩
২৭।	পণ্ডিচেরী	…	…	৬.৭	৩.৩	০.০	০ ০	৩.৩	৩ ৩	১.৭	৩.৩	.	২.৬
	গড়	১.৮	৬.৩	৪.৯	২ ৯	৪.৪	২.৮	৩.৮	৫.৩	৪.৫	৪.০	৬.০	৪.১

সূত্র : সি. এস. ডি. এস.

বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভাগুলিতে মহিলা প্রতিনিধিত্বের এই চিত্র পুনরায় এ কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রে নির্বাচন এখনও প্রধানত অর্থনির্ভর। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও যোগ্যতা অপেক্ষা আর্থিক সঙ্গতি ও দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতি নির্বাচনে অধিক প্রাধান্য পায়। মহিলাদের ক্ষেত্রেও একথা প্রায় সর্বতোভাবে প্রযোজ্য। যে সব মহিলারা নির্বাচনে বিপুল ব্যয়ভারের অধিকাংশ নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে (পারিবারিক) বহন করতে সক্ষম হন, তাদের পক্ষেই প্রতিনিধিত্ব করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। অনুমান করা যায় যে বর্তমানে প্রতি রাজ্যেই অধিকাংশ নারীর পক্ষে নির্বাচনে ব্যয়ভার বহন করার অক্ষমতাই তাদের স্বল্প প্রতিনিধিত্বের অন্যতম কারণ। সেই সঙ্গে অবশ্য পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার কারণটি তো আছেই। নারীদের মধ্যেও আবার অধিকতর অনগ্রসর দলিত নারীরাই এই অবস্থার প্রধান শিকার। সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি, এমনকী কূটবুদ্ধি যা রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন, সাধারণ তথাকথিত অশিক্ষিত নারীদের মধ্যেও কম থাকে না। প্রয়োজন হল বুদ্ধিবৃত্তির সাথে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার সমন্বয়। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে অনেক সাধারণ নারী ইচ্ছা সত্ত্বেও সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগই পান না। সে সুযোগ তাদের দেওয়া হয় না, নানা আর্থসামাজিক ও পারিবারিক কারণে। ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে একথা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে যে রাজনীতিতে মহিলারা পুরুষের মতোই যোগ্যতা সম্পন্ন, এবং ভাল ও খারাপ, দুইই হতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকালে দেখা যায় যে এ রাজ্যেও বিধানসভার নির্বাচনে ১৯৫২ সাল থেকেই মহিলা প্রার্থী এবং বিধায়কদের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় নগণ্য। ১৯৯৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই রাজ্যে মোট ২০৩৫ জন প্রার্থীর মধ্যে মহিলা ছিলেন ৯৭ জন, অথবা ৫ শতাংশ। আর ২০০১ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত বিধানসভা নির্বাচনে মোট ১৬৭৬ জন প্রার্থীর মধ্যে মহিলা ছিলেন ১০২ জন, অথবা ৬ শতাংশ। ১৯৯৬ সালে মোট ২৯৪ জন জয়ী বিধায়কের মধ্যে মহিলা ছিলেন মাত্র ২০ জন, অর্থাৎ ৬.৮ শতাংশ। আর এই কুড়ি জন মহিলা বিধায়কের মধ্যে ১৬ জন ছিলেন সি.পি.আই.এম-এর বিধায়ক। বাকি চার জনের মধ্যে তিনজন কংগ্রেসের এবং একজন দার্জিলিং ন্যাশন্যাল লিবারেশন ফ্রন্ট-এর বিধায়ক।

২০০১ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ১০২ জন মহিলা প্রার্থীর মধ্যে জয়লাভ করেছেন ২৫ জন। অর্থাৎ ২৯৪ জনের বিধানসভায় এখন মহিলা বিধায়করা

হলেন ৮.৫ শতাংশ। ১৯৯৬ সালের তুলনায় মহিলা বিধায়করা এবার ২ শতাংশ বেশি আসন অধিকার করেছেন। এবারের ২৫ জন নতুন মহিলা বিধায়কের মধ্যে ১৭ জন হলেন বামফ্রন্টের (১৩ জন সি.পি.আই.এম., ২ জন আর.এস.পি ও ২ জন ফরওয়ার্ড ব্লকের) বিধায়ক। বাকী ৮ জন মহিলা বিধায়কের মধ্যে ৫ জন হলেন তৃণমূলের এবং ৩ জন কংগ্রেসের।

উল্লেখ্য যে সি.পি.আই.এম.-এর মোট ১৩ জন মহিলা বিধায়কের মধ্যে ৪ জন তপশিলী জাতির (বাঁশরি কাজি, নন্দরানি দল, বিলাসীবালা সহিস, ও উমা বাউরি) এবং একজন মুসলিম (মুজাফা বেগম)। আর.এস.পি.র দুজন মহিলা বিধায়কের মধ্যে একজন তপশিলী উপজাতি (কুমারী কুঞ্জুর) ও ১ জন তপশিলী জাতির (নর্মদা রায়) বিধায়ক আছেন। এছাড়া, কংগ্রেসেরও একজন মুসলিম বিধায়ক (রুবি নুর) আছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ২০০১ সালের নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গের নতুন বিধানসভায় ২৫ জন মহিলা বিধায়কের মধ্যে এখন পাঁচজন তপশিলী জাতি, ১ জন তপশিলী উপজাতি এবং দুইজন মুসলিম বিধায়ক।

২০০১ সালের নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ৪৮ জনের যে নতুন মন্ত্রীসভা গঠন করেছেন, তাতে ৩৪ জনের পূর্ণ মন্ত্রীর মধ্যে স্থান পেয়েছেন মাত্র ২ জন মহিলা। এরা হলেন নন্দরানী দল (জনশিক্ষা দপ্তর) ও ছায়া ঘোষ (কৃষিবিপনন দপ্তর)। আর ১৪ জন উপমন্ত্রীর মধ্যেও আছেন ২ জন মহিলা। এরা হলেন বিলাসীবালা সহিস (তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর উন্নয়ন দপ্তর) ও ইভা দে (স্কুল শিক্ষা দপ্তর)। এদের মধ্যে বিলাসীবালা সহিস ও নন্দ রানী দল, দুজনেই তৃণমূল স্তরের রাজনীতি থেকে উঠে এসেছেন উচ্চতর রাজনীতির ক্ষমতার আঙিনায়। বিলাসীবালা এবার নিয়ে মন্ত্রী হলেন তৃতীয় বার। আশা করা যায়, আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের মহিলারা তাদের রাজনৈতিক সচেতনতার প্রমাণ দিয়ে সারা ভারতের মহিলাদের পথ দেখাবেন।

পাদটীকা

(১) *Towards Equality : Report of the Commitee on the Status of Women in India,* Goverment of India, Ministry of Education and Social Welfare, 1974, P 448

(২) S.D.Muni, "Women in the Electoral Process,"in Vina Mazumdar (ed), *symbols of power,* Allied Publishers Private Ltd,1979, p.35

(৩) *ঐ,*

(৪) *ঐ,* p.40

(৫) *ঐ,*

(৬) Bangendu Gangulee, "Profile of Women in West Bengal," in Vina Mazumdar (ed), op,cit, p. 319

(৭) Shanta Bhatt, *Women Parliamentarians of India,* Shiva Publishers Distribution, Udaipur,1995,p.205, Appendix No.5.

(৮) Nirmala Banerjee,"Politicization of Women in West Bengal," in Vina Mazumdar(ed), op,cit,pp.101-164

(৯) *Women in India : A statistical Profile, 1997,* Government of India. Ministry of Human Resource Development , New Delhi, pp.235-36.

(১০) Shanta Bhatt, *op,cit,* pp, 89-91

(১১) বিস্তারিত-এর জন্য দেখুন Shanta Bhatt, *op. cit,* Chapter-6

১০

সংরক্ষণের প্রশ্ন

ইংরেজ শাসিত ভারতে ১৯৩৫ সালের সংবিধান প্রণয়নের প্রেক্ষিতেই মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের প্রশ্নটি প্রথম ওঠে। সেই সময় গান্ধীজির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে মহিলা নেতৃবৃন্দ "মহিলাদের একতা" এবং "সমান অধিকার" প্রতিষ্ঠার কারণে সংরক্ষণের বিরোধিতা করেন। কিন্তু তাদের সে দাবি তখন পূর্ণ হয়নি। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদ এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে সাধারণভাবে মহিলাদের স্বল্প প্রতিনিধিত্বের কারণেই তাদের সংরক্ষণের বিষয়টি আবার আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। ১৯৭৪ সালে দ্য কমিটি অন দ্য স্টেটাস অফ উইমেন মহিলাদের সংরক্ষণের বিরুদ্ধে সুপারিশ করে, যদিও এই কমিটি শুধুমাত্র মহিলাদের নিয়েই গঠিত হয়েছিল। এই কমিটি পঞ্চায়েত স্তরে মহিলাদের সংরক্ষণের পরিবর্তে 'মহিলা পঞ্চায়েত' গঠন করার সুপারিশ করে। আর সংসদ ও প্রাদেশিক আইন সভায় মহিলাদের সংরক্ষণের পরিবর্তে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মহিলা নির্বাচন প্রার্থীর শতাংশ বৃদ্ধি করার সুপারিশ করে।

সত্তর-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে আশির দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়টি এদেশে নারী প্রগতির ইতিহাসে এক নূতন ধারা সংযোজিত করে। রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃক প্রথম নারী দশক ঘোষণা (১৯৭৫-১৯৮৫), নতুন নতুন নারী সংগঠনের উত্থান এবং সেই সঙ্গে নানাবিধ দুর্নীতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, পণপ্রথা ও নারী নির্যাতন প্রভৃতির বিরুদ্ধে নারী আন্দোলন নারীকে আবার পাদপ্রদীপের আলোতে নিয়ে আসে। আশির দশকের মধ্যভাগেই মহিলাদের সংরক্ষণের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। ১৯৮৮ সালে দ্য ন্যাশনাল পার্সপেক্টিভ প্ল্যান-এ পঞ্চায়েতে মহিলাদের জন্য ৩০ শতাংশ সংরক্ষণের সুপারিশ করা হয়েছিল। কিন্তু অনেক টানাপোড়েনের পর ১৯৯২ সালে ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনির দ্বারা তপশিলী জাতি/উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী (ও বি

সি) সহ সব নারীরাই সংরক্ষণের মাধ্যমে পঞ্চায়েতে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার প্রাপ্ত হন। আর তখন থেকেই বিভিন্ন নারী সংগঠনের নেত্রীগণ রাজনীতির উচ্চতর ক্ষমতার দরবারে অর্থাৎ সংসদ ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতেও মহিলাদের সংরক্ষণের দাবিতে সোচ্চার হন। প্রধানত তাদেরই চাপে ১৯৯৬ সালে একাদশ লোকসভায় ইউনাইটেড ফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রধানমন্ত্রী দেবেগৌড়ার নেতৃত্বে একটি মহিলা সংরক্ষণ বিল ৮১তম সংবিধান সংশোধনি বিল রূপে লোকসভায় উপস্থাপিত করা হয়। কিন্তু সেই থেকে এই প্রস্তাবিত বিলটি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মতবিরোধ দানা বাঁধতে থাকে। নানা কূটনৈতিক চালের ফলে বিতর্কিত এই মহিলা সংরক্ষণ বিলটির ভবিষ্যৎ এখনও অন্ধকারে নিমজ্জিত। মহিলা সংরক্ষণ বিলটির এই অচলাবস্থার কারণ আলোচনার জন্য সর্বাগ্রে বিতর্কিত এই বিলটির বক্তব্য ও তার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন।

মহিলা সংরক্ষণ বিল ও তার যৌক্তিকতা

মহিলা সংরক্ষণ বিল-এ সংবিধানের ৩৩০ ধারার পরে সংশোধনি রূপে '৩৩০-এ' ধারার ক্লজ (১)-এ বলা হয়েছে ঃ

"Seats shall be reserved for women in the House of the People." '৩৩০এ' ধারার ক্লজ 'বি' তে বলা হয়েছে, "As nearly as may be, one-third of the total number of seats reserved under clause (2) of Article 330 shall be reserved for women belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be...". আর প্রস্তাবিত '৩৩০এ' ধারার ক্লজ (৩)-এ বলা হয়েছে, "As nearly as may be, one-third (including the number of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes) of the total number of seats to be filled by direct election to the House of the People in the State or Union Territory shall be reserved for women and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in that State or Union Territory."

সুতরাং প্রস্তাবিত বিল-এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হল ঃ (১) তপশিলী জাতি/উপজাতির জন্য সংরক্ষিত আসনের এক-তৃতীয়াংশ আসন এই জনগোষ্ঠীর মহিলাদের

জন্য লোকসভায় সংরক্ষিত রাখা হবে (মূল সংবিধানের ৩৩০ ধারায় তপশিলী জাতি/উপজাতির জন্য এই জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যার অনুপাতে সংরক্ষণের কথা বলা আছে) ; (২) তপশিলী জাতি/উপজাতি সহ সমস্ত মহিলাদের জন্য মোট এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য লোকসভায় সংরক্ষিত থাকবে ; আর (৩) বিভিন্ন নির্বাচনি এলাকার মধ্যে সংরক্ষিত আসনগুলি ৫ বছর অন্তর আবর্তিত হবে ; এবং (৪)১৫ বছরের জন্য এই সংরক্ষণের অধিকার থাকবে।[১]

আরও উল্লেখ্য যে মূল সংবিধানের ৩৩২ ধারার পরে প্রস্তাবিত সংশোধনির '৩৩২এ' ধারাতে রাজ্য বিধানসভাগুলিতেও লোকসভার মতো একইভাবে মহিলাদের জন্য একই রকম সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে।

যুগ যুগান্তরের অশিক্ষা, আর্থিক স্বনির্ভরতার অভাব এবং সর্বোপরি সামাজিক অবিচার সব নারীকেই এক পশ্চাৎপদ শ্রেণীতে পরিণত করে রেখেছে। প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে যে প্রথম ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস কমিশন ১৯৫৫ সালেই নারীকে একটি অনগ্রসর শ্রেণী রূপে ঘোষণা করে তাদের জন্য সংরক্ষণের দিক দর্শন করেছিলেন। সামগ্রিকভাবে সমাজের হীনস্থানে থাকা এই নারীদের সার্বিক উন্নতির জন্যই সারাদেশের রাজনীতিতেও তাদের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব থাকা বাঞ্ছনীয়। সাধারণভাবে অনগ্রসর বা পশ্চাৎপদ নারীদের মধ্যে তপশিলী জাতি/উপজাতি এবং ওবিসি শ্রেণীভুক্ত নিম্নবর্গের নারীরা আরও বেশি পশ্চাৎপদ। সুতরাং নারীদের মধ্যেও আবার বিশেষভাবে অনগ্রসর নারীরা সহ সমস্ত নারীদের জন্যই পুরসভা থেকে সংসদ পর্যন্ত সমস্ত স্তরে সংরক্ষণ থাকা একান্ত জরুরি। এজন্য আমরা, আমাদের সমাজ দায়বদ্ধ। ইতিমধ্যে ৭৩ তম এবং ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনির দ্বারা পঞ্চায়েতে এবং পুরসভায় নিম্নবর্ণের নারী সহ সব নারীরাই সংরক্ষণের মাধ্যমে প্রবেশাধিকার পেয়েছেন। কিন্তু এখন উচ্চতর ক্ষমতার আসরে সংরক্ষণের মাধ্যমে নারীর প্রবেশাধিকার নিয়ে যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে, তা আগে কখনও দেখা যায় নি। ভারতীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এই বিলটি এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এই বিলটি দেশের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ক্ষমতার দরবারে নারীর প্রতিনিধিত্ব বিষয়ক বলেই কি এর বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতাও পূর্বেকার সব মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে? অনেক সময় মহিলাদের জন্য সংরক্ষণকে সমতার পরিপন্থী এবং তাদের প্রতি অবমাননাকর বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু পুরুষের তুলনায় নারীর সার্বিক হীনস্থানের কথা মনে রাখলেই এই যুক্তি ধূলিসাৎ হয়ে যায়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম

ধরে আর্থসামাজিক হীনস্থান থেকে ঘরে বাইরে সুবিধাপ্রাপ্ত পুরুষদের সমান স্তরে পৌঁছানোর জন্যই নারীর এই বিশেষ সুবিধা প্রয়োজন। জনসংখ্যার অর্ধাংশ পশ্চাৎপদ নারীর জন্য অন্যূন ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ থাকলেই বা ক্ষতি কি? সমতার নীতি তো সেদিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

রাজনৈতিক দলগুলির অবস্থান

. এই মহিলা সংরক্ষণ বিলটি নিয়ে লোকসভার ভিতরে যে তুলকালাম কাণ্ড ঘটেছে, সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে তার কোন দৃষ্টান্ত নেই। বামপন্থী ও ডানপন্থী নির্বিশেষে সব রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা করেই এই বিল-এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৯৬ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর বিলটি লোকসভায় আলোচনার জন্য উপস্থাপিত করা হলে প্রধানত রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আর জে ডি) এবং সমাজবাদী পার্টির (এস পি) প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ফলেই শেষ পর্যন্ত বিলটি সি পি আই সাংসদ গীতা মুখার্জীর (সম্প্রতি প্রয়াত) নেতৃত্বে জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয় পুনর্বিবেচনার জন্য। আর জে ডি এবং এস পির মুলায়ম সিং যাদব ও লালু প্রসাদ যাদবদের প্রধান দাবি ছিল যে সংরক্ষিত এক-তৃতীয়াংশ আসনের মধ্যে সাধারণ ও তপশিলী জাতি/উপজাতি মহিলাদের সাথে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর মহিলাদের জন্যও সংরক্ষেণের ব্যবস্থা করতে হবে। মূলত ওবিসি নারীদের সংরক্ষণের দাবিতেই তারা এই বিলটির প্রবল বিরোধিতা করেন। এরপর থেকেই বিলটি নিয়ে অচলাবস্থা এখনও দূর হয়নি, যদিও কয়েকবার বিলটি লোকসভায় উপস্থাপিত করার চেষ্টা হয়েছে।

একথা সত্য যে বিহার কিংবা উত্তরপ্রদেশের পরিস্থিতিতে ওবিসিদের সমর্থন ছাড়া সরকার চালানো কিংবা রাজনীতিতে টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু আর জে ডি এবং এসপির বিরোধিতাই কি বিলটি এখনও পর্যন্ত অনুমোদিত না হওয়ার একমাত্র কারণ? সেক্ষেত্রে তো সংবিধান সংশোধনির জন্য সাধারণ নিয়ম মেনে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বিলটিকে অনুমোদন করিয়ে নেওয়া যেত। প্রকৃত কারণ খুঁজতে হবে অন্যত্র। আসলে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের অর্থ হল লোকসভার ১৮০টি আসন মহিলাদের অধিকারে আসা। অর্থাৎ এই ১৮০টি আসন থেকে পুরুষদের ক্ষমতাচ্যুতি ঘটা। আপাত কারণের আড়ালে পুরুষদের এই ক্ষমতাচ্যুতির আশঙ্কাই প্রধানত মহিলা সংরক্ষণ বিলটির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে

দাঁড়িয়েছে। এ পর্যন্ত বিলটি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মতবিরোধ ও টানাপোড়েনই প্রমাণ করে যে পুরুষতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলি মহিলাদের সংরক্ষণেরই বিরোধী। কিন্তু জনসংখ্যার অর্ধাংশ নারী ভোটারদের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই দলগুলি বিলটির বিরুদ্ধতা করতে অপারগ হচ্ছে। অথচ সংসদের বাইরে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় ৮০ শতাংশ পুরুষ সাংসদই প্রকাশ্যে বলেছেন যে মহিলাদের প্রধান স্থান হল রান্নাঘরে। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, 'মহিলারা সংসদে গেলে রুটি বানাবে কে?' আবার কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে মহিলাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা হবে তাদের পক্ষে অপমানকর। তারা কি এই ব্যবস্থা মেনে নেবেন?[২] এসব প্রশ্নের উত্তরে আসার আগে সংসদের ভিতরে এই মহিলা বিলটি নিয়ে গত কয়েক বছরে যে লঙ্কাকাণ্ড ঘটেছে তার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানা প্রয়োজন।

১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো বিলটি ঐ বছরই ডিসেম্বর মাসে ফিরে আসে ৭টি প্রতিবাদী নোট সহ সমর্থিত হয়ে। এই প্রতিবাদী নোটগুলিতে ওবিসি নারীদের জনসংখ্যার অনুপাতে সংরক্ষণের দাবি করা হয়, আর তখনই এই বিলটির ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যায়। প্রতিবাদী নোটগুলির ফলেই বিলটির বিপক্ষে একটি বড় অজুহাত পেয়ে যান পুরুষ সাংসদগণ। এই সময় বিলটির প্রতিবন্ধকতার দিকে লক্ষ্য রেখেই প্রধানমন্ত্রী দেবেগৌড়া মহিলাদের জন্য ৩৩.৩ শতাংশের বদলে ১৫ শতাংশ সংরক্ষণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।[৩] পরবর্তীকালেও এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষণের পরিবর্তে ২০, ১৫, এমনকী ১০ শতাংশ সংরক্ষণের প্রস্তাবও বারে বারে এসেছে। কারণ মহিলারা যত কম সংখ্যায় সংসদে যাবেন, পুরুষদের স্বার্থ ততই বেশি রক্ষিত হবে। ১৯৯৭ সালের ৬ই মাচ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় মহিলা কমিশন কর্তৃক আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে দেবেগৌড়া বলেন, "Introducing amendments to the existing legislation is time-consuming and simultaneously we also have to sensitize the people to the fact that a woman is no longer an ornamental entity, but weilds immense power in nurturing families, community development and nation-building."[৪] অর্থাৎ দেবেগৌড়া ধরেই নিয়েছিলেন যে এই বিলটি আইনে পরিণত করা সহজসাধ্য হবে না। আর প্রসঙ্গত তিনিও মহিলাদের পারিবারিক দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দিতে ভোলেননি। দেবেগৌড়া তার কার্যকালে বিলটি দ্বিতীয়বার আর সংসদে উপস্থাপিত করার কোন চেষ্টাই করেন নি।

এরপর আই কে গুজরাল-এর প্রধানমন্ত্রিত্ব কালে ১৯৯৭ সালের ৬ই মে বিলটি লোকসভায় আলোচনার প্রস্তাব করা হলে আর জে ডি এবং এস পির সাথে বিলটির বিরোধিতায় এবার যোগ দেয় অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লিগ। আর জে ডির সভাপতি শারদ যাদব এবং মুসলিম লিগ এর সাংসদ তসলিমুদ্দিন একযোগে এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষণের মধ্যেই মুসলিম মহিলাদের জন্য সংরক্ষরণের দাবি করেন। সমাজবাদী দলের প্রধান এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মুলায়ম সিং যাদব মহিলাদের সংরক্ষণের জন্য কোন পরিবর্ত নীতির কথা তোলেন। আর প্রসঙ্গক্রমে তিনি আরও জানিয়ে দেন যে নারীদের সংরক্ষণের প্রশ্নে ওবিসি নারীদের জন্য জনসংখ্যার অনুপাতে সংরক্ষণের প্রশ্ন নিশ্চয়ই উঠবে।[৫] আর এই সময় বিজেপি সভাপতি লালকৃষ্ণ আদবানি তার ৫৫ দিনের রথযাত্রার শেষে অভিযোগ করেন যে এই সংরক্ষণের প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করেই ইউনাইটেড ফ্রন্ট সরকার ধর্ম এবং জাতিবর্ণের দ্বন্দ্বকেই আবার উস্কে দিতে চাইছেন। আর সেই সঙ্গে তিনি একথাও জানিয়ে দেন যে ধর্ম এবং জাতিবর্ণ ভিত্তিক সংরক্ষণকে সর্বশক্তি দিয়ে ঠেকানো হবে।[৬] মনুস্মৃতির আদর্শে বিশ্বাসী নারী বিদ্বেষী এবং পরধর্মে অসহিষ্ণু দলের নেতার পক্ষে এ ধরনের প্রতিক্রিয়াই ছিল স্বাভাবিক। এখানে একটি প্রশ্ন আসছে। বি জে পির কাছ থেকে ওবিসি এবং মুসলিম নারীদের সংরক্ষণের প্রবল বিরোধিতা হবে অনুমান করেই কি লালু-মুলায়মরা মুসলিম লিগ-এর সাথে একযোগে বিলটির ভবিষ্যৎ অন্ধকারে তালিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে ও বি সি ও মুসলিম নারীদের জন্য সংরক্ষণের দাবিতে সংসদের 'ওয়েল'এ লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে ছিলেন? মনে রাখা প্রয়োজন আর জে ডি সভাপতি শারদ যাদবই ১৯৯৬ সালে বিলটি লোকসভায় প্রথম উপস্থাপিত হওয়ার পর প্রশ্ন তুলেছিলেন যে মহিলারা সংসদে এলে রুটি বানাবে কে? আরজেডি এবং এস পির নেতারা কি সত্যিই মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত দেখতে চান? উল্লেখ্য যে প্রথম থেকেই বিলটি নিয়ে আরজেডি নেতাদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। আর জে ডি দলের নেতা এবং তদানীন্তন রেলমন্ত্রী রাম বিলাস পাশোয়ান মন্তব্য করেছিলেন যে সামাজিক ন্যায় বিচারের যুক্তি দেখিয়ে ওবিসি নারীদের জন্য সংরক্ষণের দাবি করা সুবিধাবাদের নীতি ছাড়া অন্য কিছু নয়। আর সেই সঙ্গে বিহারের প্রসঙ্গ তুলে তিনি যথার্থই বলেছিলেন, "I don't know how many SCs, STs and minorities have been given tickets by the Rastriya Janata Dal leadership in Bihar for contesting the Rajya Sabha and Legislative Council elections

and how many of them appointed to the party posts in the Dal."[৭] সুতরাং লালু মুলায়মরা 'পিছড়ে বর্গের' নারীত্রাতা রূপে অবতীর্ণ হলে তাদের দাবির সততা ও সদিচ্ছা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতেই পারে।

প্রকৃতপক্ষে মহিলা সংরক্ষণ বিলটিকে কেন্দ্র করে অসুবিধা দেখা দেয় প্রধানত সংরক্ষণের শতাংশ এবং আবর্তন ভিত্তিক নীতি নিয়ে। আবর্তন ভিত্তিক নীতি অনুসারে এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট হলে পুরুষ সাংসদরা অনেকগুলি আসনই শুধু হারাবেন না, সেই সঙ্গে ৫ বছর পরে তাদের পূর্বেকার আসনটি ফিরে পাওয়াও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। আর রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর সাথে সাথে কিছু আর্থিক সুবিধা হারানোর প্রশ্নও কি নেই? রাজনীতি তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখন একটি পেশাতেই পরিণত হয়েছে। তাই যে কোন উপায়ে মহিলা সংরক্ষণ বিলটিকে ঠাণ্ডা ঘরে পাঠিয়ে দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য। লোকসভার অধিবেশন সমাপ্তির আগে সেবারের মতো বিলটি অমীমাংসিত থেকে যায়।

এর পরবর্তী পর্যায়ে ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (এন ডি এ) সরকারের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী ১৯৯৮ সালের ১৪ই জুলাই বিলটি আলোচনার জন্য সংসদে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু লোকসভার "ওয়েল"-এ আর জে ডি, এস পি এবং বহুজন সমাজ পার্টির (বি এস পি) নেতাদের তাণ্ডবের ফলে আইন মন্ত্রী নাম্বিদুরাই বিলটি সংসদে পেশ করতেই পারেন নি। এবার লালু-মুলায়ম-শারদ যাদবের সমর্থনে আরও যোগ দিয়েছিলেন সরকারের শরিক সমতা দল এবং সমর্থক দল ন্যাশনাল কনফারেন্স (সৈফুদ্দিন সোজ)। আগের মতো এবারেও বিলটির পক্ষে ছিলেন বি জে পি, কংগ্রেস ও বামপন্থী দলগুলি। এরা প্রস্তাবিত বিলটিকেই (ওবিসি এবং মুসলিম নারীদের সংরক্ষণ ছাড়া) অনুমোদনের পক্ষে ছিলেন। সি পি আই এম সাংসদ সোমনাথ চ্যাটার্জির কাছে বিলটি বলপূর্বক সংসদে পেশ করতে না দেওয়ার অর্থ ছিল মহিলাদের উপর নির্যাতনের সামিল। তার কথায় "The House cannot even discuss the matter. This is a clear example of atrocities on women.... who have to be involved more and more in the political mainsteam"[৮] অপর দিকে প্রধানমন্ত্রী (বি জে পি) বাজপেয়ী বিলটি আলোচনার জন্য পেশ করতে ব্যর্থ হওয়ার পরে বলেছেন, "There never have been reservations along communal lines in our country." আর সঙ্গে এও জানিয়ে দিয়েছেন যে ওবিসি নারীদের জন্য সংরক্ষণের

কোন সম্ভাবনাই নেই।[৯] কিন্তু অনুমান করা যায় যে লালু মুলায়ামরা ওবিসি এবং মুসলিমদের সমর্থন কেড়ে নেবার চেষ্টা করছেন মনে করেই সরকারের শরিক সমতা দলের প্রভুনাথ সিং এবং সমর্থক দল মুসলিম লিগ-এর সৈফুদ্দিন সোজ-এর মতো নেতারা সরকারি নীতির বিরোধিতা করেছেন।

এই নতুন পরিস্থিতিতে কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধী জানিয়েছেন যে ৩৩.৩ শতাংশ সংরক্ষণের জন্য তার দল দায়বদ্ধ হলেও ওবিসি এবং সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষণের প্রশ্ন যখন উঠেছে, তখন সহমতের স্বার্থে কংগ্রেস তাও বিবেচনা করতে প্রস্তুত। আর পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছেন, "ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা সংবিধানে নেই। মুসলিমদের সংরক্ষণ নিয়ে অসুবিধা আছে। কিন্তু সেটা দেখা যেতে পারে। আমি চাই মহিলা সংরক্ষণ বিলে ওবিসি মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ থাকুক।"[১০] বি জে পির পক্ষ থেকে ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের বিরোধিতা করা হলেও দলের সভাপতি কে এল শর্মা ওবিসিদের সম্পর্কে মনোভাব আরও নমনীয় করে বলেছেন, "এ বিষয়ে বিতর্ক চলতে পারে, সব দল একমত হলে ওবিসিদের সংরক্ষণের কথাও ভাবা যেতে পারে।"[১১] বি জে পির সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মদনলাল খুরানা সেই সময় একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেছেন যে বি জে পি ওবিসি মহিলাদের সংরক্ষণের বিরোধী নয়। কিন্তু এ বিষয়ে সহমত স্থাপনের জন্য বিলটিকে আবার সর্বদলীয় বৈঠকে পাঠানো উচিত। মনে হয় লালু-মুলায়মরা একচেটিয়া রাজনৈতিক সুবিধা নিতে চাইছেন মনে করেই বামপন্থী দল সহ কংগ্রেস এবং বি জে পি নেতৃবৃন্দ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই আবার বিবেচনা। আবার বৈঠক।

প্রশ্ন হল, কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় আসীন বি জে পি দলের লালকৃষ্ণ আদবানি, মুরলী মনোহর যোশী এবং প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ কি সত্যই মহিলাদের সংরক্ষণ চান? মনুস্মৃতির ধ্যানধারণার অনুসারী এই দলে নারীকে মাতৃশক্তি রূপে কল্পনা করার যে নীতি এদের দলীয় ইস্তাহারে আছে, তাতে সীতা-সাবিত্রীর আদর্শই হল ভারতীয় নারীর আদর্শ। বি জে পির কোন কোন নেতা আবার রূপ কানোয়ার-এর মৃত্যুকেও সতীর পুণ্য বলে বন্দনা করেছিলেন। আবার মহিলা সংরক্ষণ বিলের আলোচনা শুরুর কালে এই দলের নেতার মুখেই শোনা গেছে যে মহিলাদের প্রকৃত স্থান হল রান্নাঘরে। সুতরাং একথা মনে করলে বোধহয় ভুল হবে না যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে মহিলা এবং ওবিসিদের ভোটের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই মহিলা বিলটি সংসদে আলোচনার চেষ্টা হয়েছে কয়েকবার। কিন্তু বি জে পির

অন্দরমহলে, বিশেষত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অভ্যন্তরে, এ বিষয়ে সমর্থন না থাকাটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। তাই লালু-মুলায়ম-শারদ যাদবদের কার্যকলাপে বি জে পি সরকার একটি অজুহাত খুঁজে পেয়ে তার সদ্ব্যবহার করবে না কি? আর তাই ১৯৯৮ সালের (১৪ই ডিসেম্বর) চেষ্টা করেও বিলটিকে দ্বিতীয়বার আর আলোচনার জন্য উপস্থাপিত করাই সম্ভব হয় নি সর্বদলীয় বৈঠকের প্রয়োজনের অজুহাতে।

পরবর্তীকালেও এ অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। ১৯৯৯ সালের শীতকালীন অধিবেশন শেষ হওয়ার আগের দিন, অর্থাৎ ২৩ শে ডিসেম্বর আইনমন্ত্রী রাম জেঠমালানি মহিলা সংরক্ষণ বিলটি এবার ৮৫তম সংবিধান সংশোধনি রূপে লোকসভায় উপস্থাপিত করেন। কিন্তু তার আগের দিনই ২৫টি রাজনৈতিক দলের মিটিং-এ বিলটির ভবিষ্যত নির্ধারিত হয়ে যায়। এই মিটিং-এ আর জে ডি, এস পি এবং বি এস পির নেতারা জানিয়ে দেন যে ওবিসি নারীদের সংরক্ষণ ছাড়া বিলটি তারা যেকোন মূল্যে সর্বশক্তি দিয়ে ঠেকাবেন। এজন্য খলনায়কের ভূমিকা নিতেও তারা প্রস্তুত। ২৩ শে ডিসেম্বর বিলটি উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টা হলে লালু-মুলায়ম যাদবরা সংসদের "ওয়েল" এ উপস্থিত হয়ে আগ্রাসী মূর্তি ধারণ করেন। আর তাদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন জনতা দল (ইউনাইটেড) এবং সমতা দলের সদস্যগণ। সরকারে আসীন এন ডি-এর মধ্যেও মতপার্থক্য দেখা দেয়। এন ডি এর বড় সমর্থক দল তেলেগু দেশম পার্টি এবং তৃণমূল কংগ্রেস বর্তমান অবস্থাতেই বিলটি আলোচনার জন্য উদ্যোগ নেন। কিন্তু সুযোগ বুঝে এন ডি-এর শরিক দল জে ডি (ইউনাইটেড), শিবসেনা, আকালিদল এবং অন্না ডি এম কে বিলটির বিরোধিতা করতে এগিয়ে আসে। আর মুসলিম নেতা সৈয়দ সাহাবুদ্দিন মহিলাদের সংরক্ষণ ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়ে তার মধ্যে ওবিসি এবং মুসলিম নারীর সংরক্ষণ দাবি করেন। কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস এবং বামপন্থী দলগুলি যথারীতি বর্তমান বিলটির অনুমোদন করতে আগ্রহী হয়। সুতরাং কোন রকম সমাধানে পৌঁছবার আগেই অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যায়।

যথারীতি আবার ২০০০ সালের শীতকালীন অধিবেশনে ২১ শে ডিসেম্বর বিলটি সংসদে আলোচনার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু এই সভাও পণ্ড হয়ে যাবার ইঙ্গিত পেয়ে লোকসভার অধিবেশন শেষ হয়ে যাবার ঠিক আগের দিন বিলটি আলোচনার জন্য তালিকাভুক্ত হলেও নির্দিষ্ট দিনে বিলটি লোকসভায় উপস্থাপিত

করা সম্ভব হয় নি। অধিবেশনের শুরুতেই লোকসভার 'ওয়েল'-এ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে এক লঙ্কাকাণ্ডের অবতারণা হওয়ার ফলে অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যায়। তবে এই সভায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রশেখর কিছুদিন আগে ইলেকশন কমিশন থেকে দেওয়া প্রস্তাবটি (যে প্রস্তাবে সংবিধান সংশোধন করে সংরক্ষণ দেবার পরিবর্তে রাজনৈতিক দলগুলিকে নির্বাচনে এক-তৃতীয়াংশ আসনে মহিলা প্রার্থী দেবার কথা বলা হয়) বিবেচনা করার দাবি জানান। ২০০১ সালে পুনরায় যথারীতি শীতকালীন অধিবেশন শেষ হওয়ার আগের দিন অর্থাৎ ২১ শে জানুয়ারী বিলটির প্রসঙ্গ নিয়ে বাক-বিতণ্ডা এবং ২বার সভা মুলতুবি হয়ে যাবার পর অধ্যক্ষ জি এম সি বালযোগী শীতকালীন অধিবেশেনের সমাপ্তি ঘোষণা করে দেন। বর্তমানে ইলেকশন কমিশন-এর প্রস্তাবটি অন্যতম আলোচনার বিষয়। তবে এই প্রস্তাবটি আলোচনা করার আগে এই বিলটি সম্বন্ধে মহিলা সাংসদদের অবস্থানও জানা প্রয়োজন।

মহিলা সাংসদদের অবস্থান

১৯৯৬ সালে মহিলা সংরক্ষণ বিলটি প্রথম লোকসভায় উপস্থাপিত করার সময় থেকেই মহিলা সাংসদরা প্রায় সবাই বর্তমান বিলটিকে অনুমোদন করিয়ে নিতে আগ্রহী ছিলেন। তবে এ বিষয়ে ব্যতিক্রমও আছে। দেবেগৌড়ার প্রধানমন্ত্রিত্বের কাল থেকেই বি জে পির সুষমা স্বরাজ, কংগ্রেসের মার্গারেট আলভা, মমতা ব্যানার্জী, জনতা দলের সরোজ দুবে ও প্রমীলা দণ্ডবতে, তেলেগু দেশম-এর রেনুকা চৌধুরী, সি.পি.আই-এর গীতা মুখার্জি (সম্প্রতি প্রয়াত) প্রভৃতিরা ওবিসি এবং মুসলিম নারীদের সংরক্ষণ ছাড়াই বর্তমান বিলটিকে গ্রহণ করার দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু বি জে পির সাংসদ শ্রীমতী উমা ভারতী এ বিষয়ে অন্যতম ব্যতিক্রম। এ ছাড়াও এই ব্যতিক্রমের দলে আছেন কংগ্রেসের শ্রীমতী সেলজা, মীরা কুমার (তপশিলী জাতি) এবং বহুজন সমাজবাদী পার্টির মায়াবতী (তপশিলী উপজাতি)। এই চারজনই ওবিসি নারীদের জন্যও সংরক্ষণের দাবিদার। যদিও এদের দলের নীতি সংরক্ষণের বিরুদ্ধে। অনুমান করা যায় নিম্নবর্গ থেকে উঠে আসা এই মহিলারা নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান থেকে নিম্নবর্গের নারীর স্বার্থ রক্ষার্থে এগিয়ে এসেছেন। উমা ভারতী এ বিষয়ে বলেছেন, "I am in favour of Mondala and Kamandulu.... the parliament already has enough upper caste women with lipstick and powder... I want to see women who smell of

gobar too.”[১২] উমা ভারতী বি জে পির সভাপতি লালকৃষ্ণ আদবানির ধর্ম ও জাতিবর্ণ ভিত্তিক সংরক্ষণের বিরুদ্ধে ঘোষিত নীতি থেকে সরে গিয়ে সংসদের ভিতরে এবং বাইরে ওবিসিদের জন্য সংরক্ষণের দাবি করায় বি জে পি দলের মধ্যে বিভাজন দেখা দেয়। এ বিষয়ে প্রথমে উমা ভারতী দলের ভিতরে তার সমর্থক রূপে পাশে পেয়েছিলেন যশোবন্ত সিন্‌হাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যশোবন্ত সিন্‌হাও আদবানির ঘোষিত নীতিকেই দলীয় নীতি বলে সমর্থন করেন।[১৩] কিন্তু উমা ভারতী তার মতে অনড় আছেন। আরও তাৎপর্যপূর্ণ হল এই যে উমা ভারতী যেমন নিজের দলীর নীতির বিরুদ্ধে ওবিসিদের সংরক্ষণ সমর্থন করেছেন, তেমনি আবার জনতা দলের নীতির বিরুদ্ধতা করে ঐ দলেরই সরোজ দুবে, প্রমীলা দণ্ডবতে এবং কমলা সিন্‌হা দলের ভিতর থেকে বর্তমান বিলটির বিরুদ্ধতা হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।[১৪] সম্ভবত তারা অনুমান করেছিলেন যে বিলটিকে ঠাণ্ডাঘরে পাঠিয়ে দেওয়াই ছিল দলীয় বিরোধিতার মূল উদ্দেশ্য, ওবিসি নারীরা ছিলেন অজুহাত মাত্র। আবার তেলেগু দেশম-এর শ্রীমতী জয়াপ্রদা নাহ্‌দার মতে জনসংখ্যার অনুপাতেই মহিলাদের সংরক্ষণ হওয়া উচিত। বিপরীতে এ বিষয়ে বি জে পির বড় সমর্থক দল কংগ্রেসের সভানেত্রী শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধী এবং আন্না ডি এম কের সাধারণ সম্পাদিকা জয়ললিতাও বর্তমান বিলটিকেই অনুমোদন করতে চেয়েছেন। জয়ন্তী নটরাজন বিলের সপক্ষে জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও বিলটি নিয়ে এত টালবাহানার সমালোচনা করেছেন।[১৫] আর কংগ্রেসের মার্গারেট আলভা রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনি ইস্তাহারে মহিলাদের সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করার পরও বিলটিকে সংসদে উপস্থাপিত করার মধ্যেই পুরুষদের তঞ্চকতার প্রমাণ দেখতে পেয়েছেন। তিনি এটিকে “Total hypocrisy of men and hollow promises of political parties”[১৬] বলে মন্তব্য করেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৯৯৭ সালের ২০শে জুলাই দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ‘সমাজবাদী মহিলা সভা’র একটি সেমিনারএ পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্য থেকে আগত ২৫০ জন মহিলা সংসদের পরবর্তী অধিবেশনেই বিলটি অনুমোদনের দাবি জানান। জনতা দলের প্রমীলা দণ্ডবতে বলেন, “If the government passes the bill, we will see to it that 50% of the State Assemblies would also pass the same.”[১৭] বিলটি ভোটে না দেওয়ার জন্যও তারা সমালোচনা করেন। অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে বিলটি

শীঘ্র লোকসভায় আলোচনার জন্য উপস্থাপিত করার দাবিতে কয়েকটি মহিলা সংগঠনের পক্ষ থেকে সংসদ চত্বরে একটি সমাবেশে সর্বভারতীয় গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা বৃন্দা কারাত মহিলা বিলটি সম্বন্ধে সরকারের সদিচ্ছার অভাবের উল্লেখ করে বলেন যে পেশিবল, অর্থবল এবং দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতিতে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। তাই বিলটি আগে সংসদে অনুমোদন করিয়ে নিয়েও পরে সংশোধনির মাধ্যমে ওবিসি নারীদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়।[১৮] বৃন্দা কারাত অনেকবারই একথা বলেছেন।

উল্লেখ্য যে বেশিরভাগ মহিলাই এই বিলটি অনুমোদনের সপক্ষে হলেও এ বিষয়ে সংসদের ভিতরে শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জীর ভূমিকা সব শোভনতার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। ১৯৯৮ সালে লোকসভার এক বিশেষ অধিবেশনে অধ্যক্ষ বিলটি আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট তারিখ দিতে ব্যর্থ হলে সি পি আই-এর গীতা মুখার্জী এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মমতা ব্যানার্জী একযোগে লোকসভা থেকে 'ওয়াক আউট' করেন। পরে গীতা মুখার্জীর নেতৃত্বে মহিলা সাংসদরা অধ্যক্ষ জি এস সি বালাযোগীকে সংসদের 'জিরো আওয়ার'-এ বিলটির প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে বাধ্য করান এবং সেখানে গীতা মুখার্জী মানবাধিকারের প্রশ্নে বিলটি অবিলম্বে লোকসভায় অলোচনার জন্য উপস্থাপিত করানোর দাবি জানান। কিন্তু ১৪ই জুলাই বিলটি সংসদে উপস্থাপিত করার উদ্যোগ নেওয়া হলে বিলটির পক্ষে এবং বিপক্ষের নেতারা যখন সংসদের 'ওয়েল'-এ এক তাণ্ডব নৃত্যের সৃষ্টি করেন, মমতা ব্যানার্জীও এতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। লালু-মুলায়মদের শ্লোগানের বিপরীতে মমতা ব্যানার্জী বি জে পির মহিলা সাংসদদের নিয়ে বিল-এর পক্ষে স্লোগান দিতে থাকেন। মমতার অন্যতম সমর্থক ছিলেন বি জে পি-র সুষমা স্বরাজ। গীতা মুখার্জীর নেতৃত্বে সি পি আই-এর মহিলা সাংসদরাও অবশ্য তাদের বক্তব্য জানাতে কার্পণ্য করেন নি। এরপর ডিসেম্বর মাসে বিলটি দ্বিতীয়বার লোকসভায় উপস্থাপিত করার চেষ্টা হলে মমতা আগ্রাসী মূর্তি ধারণ করেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে সমাজবাদী দলের দারোগা প্রসাদ যাদব বিলটি পেশ করতে বাধা দান করলে তৃণমূলের এই নেত্রী দারোগা প্রসাদের জামার কলার ধরে টানতে টানতে তাকে 'ওয়েল' থেকে বাইরে নিয়ে আসেন এবং তার হাত মুচকে দেন।[১৯] একদিকে সমতা দল এবং রাষ্ট্রীয় জনতা দল, আর অপরদিকে মমতা ব্যানার্জী ও তার সমর্থকদের মধ্যে ধবস্তাধবস্তি ও হাতাহাতির ফলে লোকসভার ভিতরেই এক লঙ্কাকাণ্ডের উদ্ভব হয়, আর সেই সঙ্গে সংসদীয় গণতান্ত্রিক রীতিনীতিও ভূলুণ্ঠিত হয়।

মহিলা সংরক্ষণ বিলটি নিয়ে সংসদের ভিতরে এ পর্যন্ত শারীরিক বলপ্রয়োগের চেষ্টা সমেত যেসব কাণ্ডকারখানা ঘটেছে তা আগে কখনও ঘটেছে বলে জানা যায় না। এতেই প্রমাণিত হয় যে এই বিলটি পুরুষকেন্দ্রিক সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিতকে কিভাবে কাঁপিয়ে দিয়েছে। প্রথমত, এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের ফলে ১৮০টি লোকসভার আসন থেকে পুরুষদের ক্ষমতাচ্যুতির সাথে সাথে এই সংরক্ষিত আসনগুলি আবর্তিত হওয়ার প্রস্তাবের ফলে পুরুষদের পক্ষে পূর্বেকার আসনগুলি ৫ বছর পরে আবার ফিরে পাবার ব্যাপারেও থাকবে অনিশ্চয়তা। তাই ছলে, বলে, কৌশলে বিলটি নিয়ে আলোচনা করার পথেই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে বার বার। প্রথম থেকেই এই বিলের ব্যাপারে বি জে পির এক বড় সমর্থক কংগ্রেসের সভানেত্রীও সম্প্রতি এ বিষয়ে বি জে পি সরকারের সততা এবং সদিচ্ছা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এই বিলের সমর্থক মহিলা সদস্যগণ ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বরে লোকসভার শীতকালীন অধিবেশনের শেষে প্রধানমন্ত্রীকে ঘেরাও করে বিলটিকে রাজ্যসভা থেকে অনুমোদিত করিয়ে নেওয়ার জন্য দাবি করেন। কিন্তু সদিচ্ছার অভাব থাকলে কোন বিষয়ই কার্যকর করা সম্ভব হয় না।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে সাধারণ মহিলাদের সংরক্ষণ নিয়ে, এমন কী আরও বেশি পশ্চাৎপদ তপশিলী জাতি/উপজাতি মহিলাদের সংরক্ষণ নিয়েও ততখানি আপত্তি ওঠেনি, যতখানি আপত্তি উঠেছে ওবিসি এবং মুসলিম নারীর সংরক্ষণ নিয়ে। কিন্তু হিন্দু এবং অ-হিন্দু (মুসলিম) ওবিসি নারীরা তো সাধারণ নারীদের অপেক্ষা বেশি অনগ্রসর। তাহলে ওবিসি নারীদের জন্য পৃথক সংরক্ষণ নিয়ে বাধা থাকবে কেন? শিক্ষা এবং আর্থিক অবস্থানের দিক থেকেও সাধারণভাবে ওবিসি নারীদের স্থান তপশিলী জাতি/উপজাতি নারীদের অপেক্ষা খুব বেশি উন্নত মানের নয়। তাহলে তপশিলী জাতি/উপজাতি নারীর সংরক্ষণে বাধা না থাকলে ওবিসি নারীর সংরক্ষণে বাধা কোথায়?

বাধা প্রধানত একটাই। তপশিলী জাতি/উপজাতি মানুষেরা জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ২৩ ভাগ। আর হিন্দু এবং অহিন্দু ওবিসিরা শতকরা অন্যূন ৫২ ভাগ। অর্থাৎ জনসংখ্যার অর্ধাংশ নারীদের মধ্যে সংখ্যাধিক্য হল ওবিসি নারীদের। আর মহিলাদের সংরক্ষণ নিজ নিজ জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যার অনুপাতে হলে সংসদে এবং রাজ্য বিধানসভায় ওবিসি নারীরাই হবেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। সেই সঙ্গে তপশিলী

জাতি/উপজাতিভুক্ত মহিলারা মিলে নিম্নবর্গের মহিলারাই লাভ করবেন বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা (অন্যূন ৭৫ শতাংশ)। অর্থাৎ বর্তমানে যেসব উচ্চবর্গের মহিলারা আধিপত্য করছেন, তাদের আসনসংখ্যা খুবই সীমিত হয়ে পড়বে। আর ঠিক এই কারণেই প্রায় সব মহিলা সাংসদরাই নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতার স্বার্থে বর্তমান বিলটিকেই (ওবিসি এবং মুসলিম নারীদের সংরক্ষণ ছাড়া) যত শীঘ্র সম্ভব অনুমোদন করিয়ে নিতে চেয়েছেন। বি জে পি সাংসদ শ্রীমতী সুষমা স্বরাজও এই বিলটির পক্ষে। আসলে নারীদের মধ্যে আপাত "একতা" রক্ষার যুক্তি দেখিয়ে মুষ্টিমেয় উচ্চবর্গের নারী সংখ্যাগরিষ্ঠ ওবিসি নারীদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চান। আবার কিছু মহিলা হয়তো মনে করেন যে একবার নারীদের সংরক্ষণ স্বীকৃত হলে পরে ওবিসি নারীদের জন্য সংরক্ষণ পাওয়া সহজ হবে। কিন্তু বাস্তবে সে কাজটি তখন আরও কঠিন হওয়ারই সম্ভাবনা। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে নিম্নবর্গের নারীদেরই আর্থিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধার প্রয়োজন বেশি। সেদিক থেকেও তপশিলী জাতি/উপজাতি এবং ওবিসি নারীদের সংরক্ষণ একই সাথে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

বহুজন সমাজ পার্টির সাংসদ মায়াবতী (তপশিলী জাতি) মহিলাদের জন্য ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ দাবি করে তার মধ্যে আবার অপেক্ষকৃত পশ্চাৎপদ শ্রেণীর নারীদের জন্য তাদের জনসংখ্যার অনুপাতে সংরক্ষণ দাবি করেছেন।[২০] আর বিজেপির উমা ভারতী ওবিসি নারীদের জন্য সংরক্ষণ দাবী করলেও সামগ্রিকভাবে মুসলিম নারীদের জন্য সংরক্ষণের অসুবিধা আছে বলে মনে করেন, কারণ ভারতীয় সংবিধানে ধর্মের ভিত্তিতে কোন সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই। কিন্তু এটা কোন প্রকৃত অসুবিধা বলে মনে হয় না। সংবিধানের ১৫ ধারা অনুযায়ী সমাজের দুর্বলতর নারীদের বিশেষ সুবিধা দানের ব্যবস্থা এক্ষেত্রে গ্রহণ করা যায় না কি? কিন্তু সেখানে অসুবিধা হল এই যে মুসলিম নারীদের মধ্যে সবাই পশ্চাৎপদ নন। আর্থসামাজিক দিক দিয়ে কিছু মুসলিম অগ্রসর নারীও আছেন। সেখানে সমতার নীতি অনুসরণ করে সব মুসলিম নারীকে সংরক্ষণ দেবার যৌক্তিকতা নেই, এবং সেক্ষেত্রে উমা ভারতীর সুপারিশ হল মণ্ডল কমিশন-এর অন্তর্গত মুসলিম অনগ্রসর শ্রেণীর নারীদের, অর্থাৎ জুলাহে, বুংকার, আনসারি প্রভৃতি নারীদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।[২১] মহিলা সংরক্ষণের মূল উদ্দেশ্যই হল আর্থিক এবং সামাজিক হীনস্থানে অবস্থিত নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের পথ দেখানো। এ কথা অনস্বীকার্য যে আর্থিক এবং সামাজিক প্রতিপত্তির সাথে

সাধারণভাবে রাজনৈতিক প্রতিপত্তির একটি অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে।

বর্তমানে তথাকথিত নারীবাদীদের মধ্যে অন্যতমা এবং 'মানুষী' পত্রিকার সম্পাদিকা মধু কিশওয়ার সংসদ এবং প্রাদেশিক বিধানসভায় নারীদের সংরক্ষণের বিরোধী। কারণ তার মতে সংরক্ষণের ফলে রাজনৈতিক নেতাদের আত্মীয়াদেরই এই আসনগুলি অধিকার করার সম্ভাবনা থাকবে।[২২] অনেকেরই জানা যে পঞ্চায়েতে মহিলাদের সংরক্ষণ বিষয়েও এরকম আপত্তি উঠেছিল। কিন্তু মাত্র আট ন বছরের মধ্যেই পঞ্চায়েতে বহু নারী তাদের প্রাথমিক জড়তা এবং অসুবিধা কাটিয়ে নিজ ব্যক্তিত্বে এবং যোগ্যতায় ভাল কাজ করার প্রমাণ রেখেছেন। আর পঞ্চায়েতের মতো এখানেও বলতে হয় যে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সব সদস্যই কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাধারণত নিজস্ব দলীয় নীতিকেই অনুসরণ করেন। নারীরা যদি প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের পুরুষ আত্মীয়দের 'প্রক্সি' হন, তাহলে বলা যায় যে পুরুষ সাংসদরাও (ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া) তাদের দলের 'প্রক্সি'। মায়াবতী, মীরা কুমার, উমা ভারতী প্রভৃতি মহিলারা যেভাবে সংসদের সাধারণ সদস্যপদ থেকে শুরু করে মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন থাকেন তার কি কোনই কৃতিত্ব নেই?

প্রত্যেক গোষ্ঠীর নারীর জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব বহুসংখ্যক পুরুষের মধ্যে নারীকে বিচ্ছিন্নতা ও একাকিত্ববোধ থেকে মুক্ত করে তাদের সাহস, শক্তি ও ব্যক্তিত্ব গঠনের সহায়ক হবে বলেই আশা করা যায়। ন্যাশনাল পার্সপেক্টিভ প্ল্যান-এ যথার্থই বলা হয়েছিল যে "Enlarged representation is likely to remove the isolation of women and give them visibility and strength to be more assertive and take part in decision-making."[২৩] নারীর বিচ্ছিন্নতা ও একাকিত্ববোধ দূরে সরিয়ে রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাগ্রহণের প্রয়োজনেও তাদের প্রতিনিধিত্ব শ্রেণী এবং জাতিবর্ণের অনুপাতেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর 'ছোট চুলওয়ালা' এবং 'গোবরের গন্ধওয়ালা' মহিলারা নিজ নিজ বর্গের প্রতিনিধিত্ব করলেই তা সম্ভব।

বর্তমান পরিস্থিতি

১৯৯৮ সাল থেকে মহিলাদের সংরক্ষণ বিষয়ক আলোচনায় এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে এ বিষয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের প্রস্তাবের ফলে। মুখ্য নির্বাচনি কমিশনার জি.এস.গিল-এর প্রস্তাব অনুসারে সব রাজনৈতিক দলের কিছু শতাংশ

আসনে মহিলা প্রার্থী দেবার সুপারিশ করা হয়েছে। এ জন্য অবশ্য প্রয়োজন হবে ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের (People's Representative Act) সংশোধন। মিঃ গিল একথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলে মহিলা প্রার্থী ১০-১৫ শতাংশের বেশি হবে না। আর এই ১০-১৫ শতাংশের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর শ্রেণীর (less favoured sections) মহিলাদের শতাংশ কত থাকবে তা দলই ঠিক করবে।

উল্লেখ্য যে অনেকদিন আগে থেকেই মুলায়ম সিং যাদব মহিলাদের জন্য ১০-১৫ শতাংশ সংরক্ষণের কথা বলে আসছিলেন। আসলে কোন রাজনৈতিক দলই জনসংখ্যার অর্ধাংশ মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসনও ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক নয়। তাই এক নতুন প্রস্তাবের মাধ্যমে ১০-১৫ শতাংশের সুপারিশকে আলোচনার জন্য আনা হয়েছে। ১০-১৫ শতাংশ সংরক্ষণ মেনে নিলে অনেক আগেই মহিলা সংরক্ষণ বিলটি লোকসভায় পাশ হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। আরও এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে রাজনৈতিক দল কর্তৃক মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাব নতুন কিছু নয়। ১৯৭৪ সালেই কেন্দ্রীয় সরকারের দ্য কমিটি অন দ্য স্টেটাস অফ উইমেন-এর সুপারিশে বলা হয়েছিল, "The political parties should adopt a definite policy regarding the percentage of women candidates to be sponsored by them for elections to parliament and Assemblies. While they may intitially start with 15%, this should be gradually increased so that in time to come the representation of women in the legislative bodies has some relationship to their position in the total population of the country or the state."[২৪] সেই সময় এই সুপারিশ কার্যকর হলে এতদিনে এই মহিলারা হয়তো তাদের জনসংখ্যার অনুপাতেই প্রতিনিধিত্ব করতে পারতেন। এরকম প্রস্তাব পরে আরও এসেছে। রাজনৈতিক দলগুলি কিন্তু মহিলা ভোটারদের গুরুত্ব উপলব্ধি করা সত্ত্বেও লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে তাদের উপযুক্ত সংখ্যক টিকিট দেওয়ার চেষ্টা করেনি। দলগুলির মধ্যে এ ব্যাপারে অনীহা না থাকলে অনেক আগেই এ ব্যবস্থা করা যেত।

পরিশেষে মনে রাখা প্রয়োজন যে সংবিধান সংশোধনির মাধ্যমে মহিলাদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা হলেও কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলিকেই মহিলা প্রার্থী দিতে হবে। মূল পার্থক্য শুধু এই যে গিল-এর প্রস্তাব অনুযায়ী সংবিধান সংশোধন না করে

জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের সংশোধন করতে হবে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংরক্ষণের ভিত হবে অনেক দৃঢ় এবং স্থায়ী। যেমন হয়েছে পঞ্চায়েতে। তাছাড়া প্রশ্ন হল, জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের সংশোধন করার পরও রাজনৈতিক দলগুলিকে নির্ধারিত শতাংশ অনুযায়ী মহিলাদের টিকিট দিতে কী বাধ্য করা সম্ভব হবে? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইন এবং বাস্তবের মধ্যে যে আসমান-জমিন পার্থক্য থাকে, তা সকলেরই জানা। প্রায় সব রাজনৈতিক দলই তাদের দলীয় ইস্তাহারে নির্দিষ্ট শতাংশ আসনে মহিলা প্রার্থী দেওয়ার নীতিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কোন দলই এখন পর্যন্ত তা পূর্ণ করে নি। ভবিষ্যতেও যে করবে তার নিশ্চয়তা কি?

এই নতুন প্রস্তাব নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যে মতপার্থক্য থাকবে, তা আগেই জানা ছিল। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের ডাকা সভায় ৮টি সর্বভারতীয় স্বীকৃত দল এবং ২৫টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে শুধু সমাজবাদী দল (মুলায়ম সিং যাদব) এবং রাষ্ট্রীয় জনতা দলই এই প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছে। কিন্তু মুলায়ম ও লালুপ্রসাদ যাবদরা ১০ শতাংশ সংরক্ষণের মধ্যে ওবিসি নারীদের জন্য কতটুকু শতাংশ নির্দিষ্ট রাখতে চান, তা এখনও স্পষ্ট নয়। 'পিছড়ে বর্গের' নারীত্রাতা রূপেই তো এতদিন এস পি এবং আর জে ডি নেতারা মহিলা সংরক্ষণ বিলটির প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছেন। বাকি দলগুলি কিন্তু মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের প্রস্তাবে তাদের অসম্মতি জানিয়ে এসেছেন। কোন কোন দল আবার সংবিধান সংশোধনির মাধ্যমে সংরক্ষণের জন্যই সর্বদলীয় ঐক্যস্থাপনের চেষ্টার কথা বলেছেন। আবার ইতিমধ্যে ২০০০ সালে নতুন করে মধু কিশওয়ার এবং অন্যান্যদের ফোরাম ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মসও রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে লোকসভায় ও রাজ্য বিধানসভায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের এক নতুন প্রস্তাব দিয়েছেন।[২৫] কিন্তু জি. এস. গিল-এর প্রস্তাবের থেকে এই প্রস্তাবের পার্থক্য খুব সামান্য।

বর্তমানে মুখ্য নির্বাচনি কমিশনারের প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি আবার সংরক্ষণ বিলটি নিয়ে আলোচনাই প্রমাণ করে রাজনৈতিক দলগুলি মহিলাদের সংরক্ষণ বিষয়টি নিয়ে কতটা উদ্বিগ্ন। যুক্তিতর্কের জাল বিস্তার করে শেষ পর্যন্ত তারা মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব কতটা কমিয়ে আনতে সক্ষম হবেন, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকার সঙ্গত কারণ তো আছেই। ক্ষমতার মোহ ত্যাগ করা তো সহজ নয়, বিশেষত এই ত্যাগ যদি হয়

মহিলাদের কারণে। তাই প্রশ্ন জাগে, অদূর ভবিষ্যতে উচ্চতর ক্ষমতার আঙিনায় অধিক হারে মহিলাদের প্রবেশাধিকার কি সত্যই ঘটবে?

পাদটীকা

(১) The Constitutional (Eighly-fifth Amendment) Bill, 1999 (Bill No. 99 of 1999), Lok Sabha, pp. 2 and 3.

(২) *The Times of India,* 16 September, 1996 and the *Hındusthan Times,* 15 September, 1996.

(৩) *Hindusthan Times,* 19 February, 1997.

(৪) *Hindu,* 9 March, 1997.

(৫) *Hindu,* 21 May, 1997.

(৬) *The Indian Express,* 19 May, 1997.

(৭) *Hindu,* 20 May, 1997.

(৮) *Hındusthan Tımes,* 25 July, 1998.

(৯) *Hindu,* 14 July, 1998.

(১০) *আনন্দবাজার পত্রিকা,* ১৫ই জুলাই, ১৯৯৮.

(১১) ঐ

(১২) *Hindusthan Times,* 15 September, 1996.

(১৩) *Ibid,* 21 May, 1997.

(১৪) *Hindu,* 20 May, 1997.

(১৫) *Hindusthan Times,* 10 May, 1997.

(১৬) *Hindu,* 21 May, 1997.

(১৭) *Ibid,* 22 July, 1997.

(১৮) *The Statesman,* 25 July, 1998.

(১৯) *The Times of India,* 28 November, 1999.

(২০) *Hindu,* 28 November, 1999.

(২১) *The Times of India,* 17 July, 1998.

(২২) Kishwar Madhu, "Women and Politics : *Beyond Quatas", EPW,* 26 December, 1996, p. 2867.

(২৩) *The National Perspective plan for women : 1988-2000, Report of the Core Group set up by the Department of Women and Child Development,* Government of India, 1988, p. 128.

(২৪) *Towards Equality : Report of the Committee on the status of Women in India.,* Government of India, Department of Social Welfare, Ministry of Education and Social Welfare, December, 1974, p. 304.

(২৫) *Manushi,* No. 116. January-February, 2000.

১১

রাজনীতি ও নারীমুক্তি

সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি ও রাজনীতি পরস্পরের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। দেশের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে নারীপুরুষের অবস্থানের সাথে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার সাযুজ্য থাকাও তাই স্বাভাবিক। আগের পরিচ্ছেদগুলিতে আমরা দেখেছি যে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরের মানুষের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের তারতম্য আছে। আর পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর আর্থসামাজিক অবস্থানের প্রতিচ্ছবিই রাজনীতিতেও ধরা পড়েছে। অন্যান্য উন্নত এবং অনুন্নত দেশের নারীমুক্তির অভিজ্ঞতা বলে যে পিতৃতান্ত্রিক আর্থসামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন না করে নারীমুক্তি সম্ভব নয়। আমাদের আলোচনাতেও এই সত্যই ধরা পড়েছে যে দেশের পিতৃতান্ত্রিক আর্থসামাজিক বিন্যাসের আমূল পরিবর্তন না করে নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন অসম্ভব। কিন্তু আর্থসামাজিক ব্যবস্থা এবং তার পরিবর্তন সম্পূর্ণভাবে দেশের রাষ্ট্রনীতির উপর নির্ভরশীল। তাই রাজনীতিতে, অথবা বলা যায় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে পার্লামেন্ট পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের মূল কেন্দ্রগুলিতে নারীর ক্ষমতায়ন একান্ত জরুরি। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে পিতৃতান্ত্রিক আর্থসামাজিক পুনর্বিন্যাসের দ্বারাই সামগ্রিক নারীমুক্তি সম্ভব। রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং আর্থসামাজিক ক্ষমতায়ন পরস্পরের সাথে গভীরভাবে যুক্ত।

এদেশে প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত এক নিরবচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক-সামাজিক ঐতিহ্য প্রবহমান। আমরা আগেই দেখেছি যে ধর্মশাস্ত্রের শাসনে এবং জাতিবর্ণ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর আর্থসামাজিক স্থানাংক নির্দেশিত এবং নির্ধারিত হয়েছিল পুরুষশাসিত সমাজের নিম্নস্তরে। শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত সারাজীবনে নারীর কোন ধরনের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়নি। পরিবারের মধ্যে নারীর কর্তব্য ছিল পতিসেবা, সন্তান উৎপাদন ও পারিবারিক দাসীবৃত্তি করা। আর এই সংকীর্ণ পারিবারিক বৃত্তের

মধ্যেই ছিল নারীর সারাজীবনের ব্যক্তিসত্তার সীমানা। ধর্মশাস্ত্রগুলির মধ্যে অন্যতম মনুস্মৃতিতে, রামায়ণ, মহাভারত মহাকাব্যে এবং বিভিন্ন পুরাণে নির্দেশিত পুরুষের সার্বিক প্রাধান্য এবং নারীর হীনত্বের তত্ত্বই আজও সাধারণভাবে প্রতিফলিত দেখি আমাদের সমাজে। মনুর উক্তি 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি' এখনও বহুলাংশে কার্যকর। তাছাড়া, ধর্মশাস্ত্রের বিধানে এবং সমাজপতিদের শাসনে শূদ্রের মতোই নারী ছিল শিক্ষা, ধর্মানুষ্ঠান এবং সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত। এই ধর্মশাস্ত্রীয় মনুবাদী সংস্কৃতির মধ্যে অবশ্য কিছু ব্যতিক্রম ছিল, বিশেষত লোকায়ত বা চার্বাকবাদী ধর্মহীন গোষ্ঠীর মধ্যে এবং এদেশের আদিবাসী জনজাতির মধ্যে। কিন্তু এরা ছিল আর্যসমাজের মূল ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় প্রবাহের বাইরে অবস্থিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী মাত্র। মধ্যযুগের ভক্তি আন্দোলন এবং উনিশ শতকের তথাকথিত নবজাগরণ সত্ত্বেও এই ব্রাহ্মণ্যবাদী আর্থসামাজিক সাংস্কৃতিক কাঠামোর বিশেষ পরিবর্তন হয়নি।

একই সঙ্গে এদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা কয়েক শ বছর ধরে প্রায় অটুট রয়েছে। মধ্যযুগে তো বটেই, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কালে এবং স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে এই সামন্ততান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয়নি। মূলত শহরাঞ্চলে অধুনা ধনতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, কিন্তু এদেশের বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে এবং কৃষি অর্থনীতিতে আজ একুশ শতকের প্রথম পাদেও ভারত একটি আধা সামন্ততান্ত্রিক এবং আধা ধনতান্ত্রিক দেশ। রাষ্ট্রীয় নীতিতেও সামন্ততন্ত্রের প্রভাবই প্রবল। আর এই সামন্ততন্ত্রই অশিক্ষা, ধর্মীয় কুসংস্কার, জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা এবং শূদ্র বা কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর শোষণের ধারক ও বাহক। আর এই সামন্ততান্ত্রিক আর্থসামাজিক কাঠামোই শাসক শ্রেণীর স্বার্থে চিরায়ত করে চলেছে নারী নির্যাতন ও দমনের সনাতন কাহিনী। এদেশের সামন্ততন্ত্রের এই আর্থসামাজিক কাঠামোই নারীমুক্তির প্রধান অন্তরায়। একমাত্র গণজাগরণ এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে গণশক্তির প্রয়োগের মাধ্যমেই যুগান্তকারী আর্থসামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে, আর নারীমুক্তি আন্দোলন এই বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। সুতরাং রাজনীতির মাধ্যমে নারীশক্তির ক্ষমতায়ন ছাড়া সামগ্রিক নারীমুক্তি সম্ভব নয়।

প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় ভারতে কোন গণবিপ্লবের নজির নেই। তাই সেখানে নারীশক্তির রাজনৈতিক প্রকাশেরও কোন উদাহরণ নেই। ইংরেজ আমলে সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতি কিছু গণঅভ্যুত্থানে নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের উল্লেখযোগ্য

উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু এ সব ঘটনা ঘটেছিল প্রধানত সেই আদিবাসী সমাজের মধ্যে যেখানে নারী স্বাধীনতা আগে থেকেই বর্তমান ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের গোড়ার দিকে কিছু উচ্চবিত্ত এবং উচ্চবর্ণের নারী অংশগ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন এবং স্বদেশী আন্দোলনেও কিছু মধ্যবিত্ত নারীর অংশগ্রহণের উদাহরণ আছে। কিন্তু প্রধানত গান্ধীজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন এবং তিরিশ ও চল্লিশের দশকের বামপন্থী আন্দোলনে বহু সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। তেভাগা আন্দোলন, তেলেঙ্গানা অভ্যুত্থান ও নক্সাল আন্দোলন ছাড়া অন্যান্য গণঅভ্যুত্থানেও বহু সংখ্যক নারীর, বিশেষত নিম্নবর্গের নারীর অংশগ্রহণ সুপরিচিত ইতিহাস। অন্যদিকে ১৯১৯ সাল থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী সাংবিধানিক সংস্কারের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনীতিতে কিছু সংখ্যক শিক্ষিত এবং পারিবারিক সূত্রে সম্পত্তিশালী নারী অংশগ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু বিদেশি সামাজ্যবাদীদের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করার কালে যেসব নারীরা ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে পুরুষের সাথে প্রায় সমানভাবে যোগ দিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তাদের অধিকাংশকেই আবার ঘরে ফিরে যেতে হয়েছিল। স্বাধীনতা-উত্তর কালে তারা রাজনৈতিক মূলস্রোতের সাথে যুক্ত হতে পারেন নি। অথবা বলা যায় যে তাদের যুক্ত করার মতো আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরী করা হয়নি। এখানেই নিহিত আছে আমাদের চরম ব্যর্থতা।

ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাস বলে যে তৃণমূল স্তরের গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে পার্লামেন্ট পর্যন্ত সর্বত্র পুরুষরা, বিশেষত উচ্চবর্গের পুরুষরাই আধিপত্য করে চলেছেন। বর্তমান রাষ্ট্রপতি সহ যে কয়েকজন নিম্নবর্গের পুরুষ এবং নারী রাজনীতির বিভিন্ন স্তরে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হতে পেরেছেন, তারা নিতান্তই ব্যতিক্রম। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সাধারণ নারীদের অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতায়ন হয়েছে নগণ্য মাত্র। লোকসভায় ও রাজ্যসভায় নারীর ক্ষমতায়ন যে দেশের বর্তমান পিতৃতান্ত্রিক আর্থসামাজিক ভিতকে সজোরে নাড়িয়ে দিতে সক্ষম তা বুঝতে পারার ফলেই দীর্ঘদিন ধরে মহিলা সংরক্ষণ বিলটিকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে রাখা হয়েছে। নারীদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের অনীহাই এ বিষয়ে প্রধান অন্তরায় হয়ে দেখা দিয়েছে। অজুহাত রূপে ব্যবহার করা হচ্ছে জাতিবর্ণ ধর্মের দ্বন্দ্বকে। মহিলাদের সংরক্ষণকে কেন্দ্র করে এমন প্রশ্নও উঠেছে যে আমেরিকা, ইংল্যাণ্ডের মতো উন্নত দেশেও যখন রাজনৈতিক ক্ষমতার উচ্চস্তরে বেশি নারীকে দেখা যায় না, তখন

এদেশে নারীর জন্য সংরক্ষণের প্রয়োজন কি? পুরুষ রাজনীতিজ্ঞরা কী নারীদের উন্নয়নের জন্য কাজ করেন না? এজন্য নারীদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রয়োজন কী?[১]

এ বিষয়ে প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন যে তথাকথিত উন্নত দেশের আর্থসামাজিক কাঠামো আমাদের দেশের মতো আধা ধনতান্ত্রিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক নয়। ঐ দেশগুলিতে নারীর সামগ্রিক অনগ্রসরতা এদেশের তুলনায় অনেক কম। এ দেশের আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় নারীপুরুষের বিরাট বৈষম্য দূরীকরণের জন্য, নারী সমাজের সার্বিক অধিকার অর্জন ও নারীমুক্তির জন্যই নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন একান্ত জরুরি। পুরুষ সাংসদরা অবশ্যই নারীদের স্বার্থ এবং উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন এবং রাখেন। তবে ক্ষমতায়নের ফলে নারী সাংসদরাও যদি পুরুষদের স্বার্থ এবং উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রাখার সুযোগ পান তাহলে আপত্তি কোথায়? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পশ্চিম ইওরোপেও নারী আন্দোলনের ফলে নবব্বই-এর দশক থেকে পার্লামেন্টের নির্বাচনে নারীপুরুষের মধ্যে সমতার নীতি (principle of parity) অনুসরণ করে প্রার্থী দেবার সময় অর্ধেক নারী এবং অর্ধেক পুরুষ প্রতিনিধিত্বের চেষ্টা চলছে।[২] তবে একথা সত্য যে শুধু সংবিধান সংশোধন অথবা জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের সংশোধনের দ্বারা, অর্থাৎ শুধু কাগুজে শর্তের দ্বারা ভারতের মতো সনাতন পরম্পরায় বিশ্বাসী দেশে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য আবশ্যিক পরিবেশ সৃষ্ট হতে পারে মাত্র, ক্ষমতায়নকে নির্বিঘ্ন করা যায় না। আগেই বলা হয়েছে, এজন্য অত্যাবশ্যক হল পিতৃতান্ত্রিক আর্থসামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং আর্থসামাজিক ক্ষমতায়ন যুগ্মভাবে নারীকে তার সামগ্রিক শৃঙ্খল মুক্তির পথ দেখাতে পারে।

সাম্প্রতিককালে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং পুনর্গঠনের মাধ্যমেই এদেশের নারীসমাজের প্রকৃত ক্ষমতায়নের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। ১৯৯২ সালের ৭৩ তম সংববিধান সংশোধনির পর সংরক্ষণের মাধ্যমে পঞ্চায়েতের প্রতিটি স্তরে (তপশিলী জাতি/উপজাতি এবং ওবিসি সহ) সব নারীরা এক-তৃতীয়াংশ আসনে প্রতিনিধিত্ব করছেন। আর সাধারণ নারীদের মতো তপশিলী জাতি/উপজাতি এবং ওবিসি নারীরাও কিছু কিছু গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধানের পদে আসীন আছেন। অনেক রাজ্যেই এখন পঞ্চায়েতের সহায়তায় নারীরা শিক্ষা এবং অস্থায়ী ও স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়ে আর্থসামাজিক মূল স্রোতের সাথে নিজেদের যুক্ত করতে সক্ষম

হচ্ছেন। তবে এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের স্থানই মনে হয় সর্বপ্রধান। অনেক রাজ্যেই নারীরা এখন পঞ্চায়েতকে কেন্দ্র করেই পানীয় জলের সমাধান, শিশু ও নিজেদের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও সচেতন হয়ে উঠছেন। আর এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছেন কতগুলি মহিলা সংগঠন। মহারাষ্ট্রের অনুন্নত এলাকায় মহিলা সংগঠনের সাহায্যেই কিছু 'মহিলা পঞ্চায়েত' গড়ে উঠেছে, আর এই মহিলা সংগঠনগুলি পঞ্চায়েত সদস্যাদের সাথে মিলিতভাবে গ্রামীণ উন্নয়নমূলক কাজে ব্রতী আছে। পশ্চিমবঙ্গে মহিলা সংগঠনগুলির মধ্যে অন্যতম গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতিও মেদিনীপুর জেলার কুলটিকরি 'মহিলা পঞ্চায়েত'টি গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। অনেক রাজ্যেই পঞ্চায়েত সদস্যারা এখন দলবদ্ধভাবে নারীদের জীবনের প্রাত্যহিক সমস্যা থেকে শুরু করে অনেক পারিবারিক এবং সামাজিক সমস্যার সমাধান করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এই সমস্যাগুলির মধ্যে প্রধান হল পুরুষদের মদ ও জুয়ার নেশা এবং নারী নির্যাতন জনিত সমস্যা। তৃতীয় পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে যে চল্লিশ এবং পঞ্চাশ-এর দশকে বিভিন্ন গণঅভ্যুত্থানে যোগদানকারী নারীরাও রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে তাদের পারিবারিক এবং সামাজিক সমস্যা দূরীকরণের আন্দোলনকে যুক্ত করেছিলেন। সমাজ ও রাজনীতি পরস্পরের হাত ধরাধরি করেই চলে। পঞ্চায়েতে মহিলাদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিহারের মতো অনগ্রসর রাজ্যেও নারীরা, বিশেষত তরুণীরা, নারী শিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহ এবং পণপ্রথার বিরুদ্ধে সচেতন হয়ে উঠেছেন। ব্যক্তিগত সমীক্ষায় দেখা গেছে যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে কিছু মহিলা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে গ্রাম পঞ্চায়েতের আঙিনায় পৌঁছোনোর ফলে বাড়ির অন্দরমহল থেকেও এখন জাতিবর্ণের ভেদাভেদ মুছে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতকে কেন্দ্র করেই শুরু হয়েছে নারী জাগরণ। আশা করা যায় যে অন্যান্য রাজ্যের পঞ্চায়েতের নারীরাও ক্রমশ এ বিষয়ে শুভ সংকেত বহন করে আনবেন। সাধারণভাবে বলা যায়, নূতন সংবিধানিক ব্যবস্থা এবং রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার পুনর্নিমাণের মাধ্যমেই শুরু হয়েছে নারীশক্তির রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও ক্রমবিকাশের পথ। বিশেষত যে নিম্নবর্গের নারীরা ছিলেন চিরকাল ভারতের নারীসমাজের বিপুল গরিষ্ঠ অংশ, তাদের সামনেও উন্মুক্ত হয়েছে শিক্ষা, স্বাধিকার ও ক্ষমতার এক নবদিগন্ত। আর পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। পঞ্চায়েতকে কেন্দ্র করেই গ্রামাঞ্চলের নারীরা এখন অন্ধকারের মধ্যেও মুক্তির আলো দেখতে পাচ্ছেন, আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছেন। কিছু নারীর পঞ্চায়েতে ক্ষমতায়নের ফলেই নারীরা এখন শক্তি সঞ্চয় করে

দলবদ্ধভাবে পারিবারিক এবং সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজে ব্রতী হয়েছেন। অথবা বলা যায়, এভাবেই এদেশে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আর্থসামাজিক ভিত তৈরী হচ্ছে। যে সনাতন পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত নারীর হীনস্থান সহ জাতিবর্ণ ভিত্তিক ধর্মশাস্ত্রীয় আর্থসামাজিক ব্যবস্থাকে চিরায়ত করে রেখেছিল, তার পুনর্বিন্যাসের এখানেই সার্থকতা।

আমাদের আলোচনা থেকে এ কথাই স্পষ্ট হচ্ছে যে নারীমুক্তি আন্দোলন সার্বিক মানবমুক্তির আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গমাত্র। যে নারী পৃথিবীর অর্ধেক ছেয়ে আছে, তার মুক্তি ছাড়া সামগ্রিক মানবমুক্তি সম্ভব নয়। তেমনি আবার কৃষক শ্রমিক সহ অগণিত নিপীড়িত শোষিত মানুষের মুক্তি ছাড়া নারীমুক্তিও অসম্ভব। জনগণের সমস্ত নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে এবং হাতে হাত মিলিয়ে নারীমুক্তি আন্দোলনকে এগিয়ে যেতে হবে। আর এসত্যও সহজে ধরা দেয় যে নারীপুরুষ সাম্য সব মানুষের সার্বিক সাম্যেরই আঙ্গিক মাত্র। যে সমাজ উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ, ধনীদরিদ্র, জোতদার-ক্ষেতমুজর, মালিক-শ্রমিক অসাম্যের কাঠামোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সে সমাজে বিচ্ছিন্নভাবে শুধুমাত্র নারী-পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। অর্থাৎ একমাত্র বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আদর্শের ভিত্তিতেই নারীমুক্তির পন্থা নির্ণয় করা সম্ভব।

পরিশেষে এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য হয়ে পড়ে যে এদেশের আর্থসামাজিক কাঠামোতে সামন্ততন্ত্র এবং ধনতন্ত্রের মতোই সনাতন ধর্মশাস্ত্রীয় ঐতিহ্যও নারীর হীনস্থানের অন্যতম কারণ। জাতিবর্ণভেদ, পিতৃতন্ত্র এবং পরিবারে ও সমাজে নারীর হীনস্থান, এ সবই সনাতন ধর্মশাস্ত্রীয় বিধানের উপর অধিষ্ঠিত। সামন্ততন্ত্র, ধর্মান্ধতা এবং অশিক্ষা-কুশিক্ষার দুর্মর অপসাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নারীর হীনস্থানকে চিরায়ত করে রেখেছে। সম্প্রতি ধর্মীয় মৌলবাদের মাধ্যমে এই সনাতন অপসংস্কৃতি এদেশের রাজনীতির অন্দরমহলে প্রবেশ করে রাষ্ট্রক্ষমতায় জাঁকিয়ে বসেছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারে আসীন প্রধান রাজনৈতিক দলটি ক্ষমতায় আসার অল্পদিন পরেই সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ১৯৯৮ সালে এক নূতন শিক্ষানীতি চালু করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, যে শিক্ষানীতি ছিল হিন্দু মৌলবাদের উপর অধিষ্ঠিত। নারীদের সম্বন্ধে ছিল হাউসকিপিং বা ঘরে কাজের শিক্ষার ব্যবস্থা। ব্যাপক প্রতিরোধের ফলে সে শিক্ষানীতি তখন প্রত্যাহৃত হলেও কোন সন্দেহ নেই যে মনুস্মৃতি অনুসারী

বিজেপি এবং তাদের সংঘ পরিবার নারীকে তার প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রগুলি কর্তৃক নির্দিষ্ট আর্থসামাজিক আসনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। সমস্ত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের ঐতিহাসিক দায়িত্ব হল সম্মিলিতভাবে মৌলবাদী শিক্ষানীতি, এবং নারীর পৃথিবী ঘরে ও পুরুষের পৃথিবী ঘরের বাইরে বৃহত্তর ক্ষেত্রে, এই পশ্চাৎমুখী এবং প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক আদর্শকে সর্বশক্তিতে প্রতিহত করা। সাময়িকভাবে সে সময় এই শিক্ষানীতি প্রবর্তন করতে ব্যর্থ হলেও এই মৌলবাদী শক্তি নানাভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে এবং উচ্চশিক্ষাকে প্রভাবিত করতে সর্বদাই সচেষ্ট। একুশ শতকের উত্তর-আধুনিকতা এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে বিজেপি সরকার জ্যোতিষশাস্ত্রকে উচ্চশিক্ষার পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। আরও উদ্বেগের কারণ হল এই যে কিছু নারীকেও তারা সহযোগী রূপে পেয়েছে। অতি সম্প্রতি জাতীয় মহিলা কমিশন, ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন এবং ইউনিসেফ সম্মিলিতভাবে দিল্লিতে তিনদিন ব্যাপী যে ধর্মসভার অনুষ্ঠান করেছিলেন, সেই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন এবং অনুষ্ঠান শেষে গৃহীত প্রস্তাবও পাঠ করেছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ-এর নেত্রী সাধ্বী ঋতম্ভরা। আর এই অনুষ্ঠানেই কন্যাভ্রূণ হত্যা প্রতিরোধের নামে শুধু মহিলাদের গর্ভপাতের অধিকার এবং আধুনিক জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিরই বিরোধিতা করা হয়নি, সেই সঙ্গে বিধবার পুনর্বিবাহেরও বিরোধিতা করা হয়েছে। আর সমর্থন করা হয়েছে 'সতী' হওয়ার ধর্মশাস্ত্রীয় রীতিকে।[৩] এভাবেই আজ হিন্দু মৌলবাদ নারীশক্তিকে দমন করে রাখতে বদ্ধপরিকর। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে হিন্দু মৌলবাদকে অবিলম্বে প্রতিহত করতে না পারলে এদেশের নারী সমাজ সহ সমস্ত আর্থসামাজিক ব্যবস্থাই কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে যাবে। সুতরাং এ কথা দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট যে রাজনীতির মূল প্রবাহ থেকে ধর্মীয় মৌলবাদ এবং হিন্দু জাতিয়তাবাদ সহ সব মধ্যযুগীয় অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রাম নারীমুক্তি সংগ্রামেরই নামান্তর। আর এ সংগ্রামের অত্যাবশ্যক শর্ত হল নারীর আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন। ২০০১ সালের নারীর ক্ষমতায়ন বর্ষে নারীমুক্তি আন্দোলনের এই হোক ছাড়পত্র।

পাদটীকা

(১) Vir Sanghvi, "Why I Oppose the Women's Reservation Bill," *Hindusthan Times*. 24 December. 2000.

(২) Bharati Ray (ed), *Women and Politics : France, India and Russia*. K. P. Bagehi & Co., Kolkata, 2000, p. 83.

(৩) *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৫/৬/২০০১ এবং ২৮/৬/২০০১.

লেখিকার অন্য দুখানি নারীমুক্তি গ্রন্থ সম্বন্ধে

নারী শ্রেণী ও বর্ণ

বইটিতে লেখিকা ভারতের শ্রেণী ও বর্ণ বৈষম্যের সমাজে নারীর অবস্থান কোথায়- এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। ... নারীসত্তার পূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় দিকগুলি যুক্তি-তর্ক সহকারে উপস্থাপিত করা হয়েছে। সমাজের সর্বাপেক্ষা নগণ্য অথচ সামাজিক উৎপাদনে সর্বাধিক গণ্য শূদ্র বর্ণের সঙ্গে নারীকে, তা তিনি যে কোন বর্ণের হোন না কেন, একাত্ম করে দেখানোর কৌশলটিও তিনি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। ... ভারতীয় পিতৃতান্ত্রিক ঐতিহ্যে নারীর আর্থসামাজিক অবস্থান পুরুষের অনেক নীচে, এই পটভূমির উপর দাঁড়িয়ে লেখিকা নারীর অনগ্রসরতার মূল কারণগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। ...বইটি আকারে ছোট কিন্তু প্রয়োজনীয় তথ্যে মলাট থেকে মলাট অবধি ঠাসা। ... কিন্তু শুধু কি নিষ্প্রাণ তথ্য? না, তা নয়। তথ্যের সঙ্গে আছে বিশ্লেষণ, আছে অনুভব, আছে ভবিষ্যদিশার আকুতি। পাঠক পড়ে উপকৃত হবেন। আনন্দিত হবেন যেমন সমালোচক নিজে হয়েছেন।

— বেলা দত্তগুপ্ত, *গণশক্তি*

কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায় দু'শো পাতার পরিসরে নিম্নবর্গ ও বর্ণের মেয়েদের আর্থসামাজিক অবস্থার একটি তথ্যসমৃদ্ধ ছবি তুলে ধরেছেন। বৈদিক যুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত তার দৃষ্টি প্রসারিত। ...বইটির সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, আধুনিক অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে মেয়েদের ভূমিকা ও পারিবারিক জীবনে তার প্রভাব। কৃষি, সংগঠিত শিল্প, অসংগঠিত শিল্প, ও সার্ভিস সেক্টর এসব ক্ষেত্রেই মেয়েদের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে, নানা সমীক্ষার মাধ্যমে। অনেক তথ্য এসেছে, যা... আমাদের নতুন করে ভাবায়। লেখিকা ... প্রশ্নগুলির রূপরেখা তুলে ধরেছেন। এটাই আমাদের সহায়তা করবে।

—সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, *আনন্দবাজার পত্রিকা*

ডঃ কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'নারী শ্রেণী ও বর্ণ' বইটিতে ভারতীয় সমাজে আর্থসামাজিক এবং পারিবারিক ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণের নারীর অবদান এবং সেই সঙ্গে এদের শোষণ ও বঞ্চনার চিত্রটি তুলে ধরতে গিয়ে নারী, শ্রেণী ও বর্ণের আন্তঃসম্পর্কটিকে অনুসন্ধান করেছেন এবং তার অনুসন্ধানের মাধ্যমে শুধু বাংলা ভাষায় নয়, যে কোন ভাষায় প্রকাশিত নারীমুক্তি আন্দোলনের সাহিত্যে এক অপূর্ণতা পূরণ করেছেন। ...শ্রেণীগত ও বর্ণগতভাবে উৎপীড়িত যে নারী-পুরুষেরা নতুন সমাজ গড়ার সংগ্রামে ব্রতী হয়েছেন, 'নারী, শ্রেণী ও বর্ণ' তাদের হাতে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার রূপে কাজ করবে।

— *নতুন গণতন্ত্রের জন্য*

ধর্ম ও নারী ঃ সেকাল ও একাল

বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ধর্ম এবং সমাজজীবনে তাদের বিধিনিষেধের প্রেক্ষিতে নারীর অবমাননা ও পঙ্গুত্ব প্রাপ্তির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে বর্তমানে আলোচ্য গ্রন্থটির প্রাসঙ্গিকতা। লেখিকা বিদুষী এবং বহুঅধীতি...হিন্দু বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থাবলী অনুপুংক্ষ অধ্যয়ন করেছেন। ...দশটি প্রধান পরিচ্ছেদে নারীর যাবতীয় অবস্থানে শাস্ত্র ও ধর্মের ভূমিকা কত গভীর ভাবে অনুপ্রবেশ করেছে - এ কথা লেখিকা সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। নারী জীবনে ধর্মের প্রভাব সম্পর্কিত আরও কিছু গ্রন্থ আছে, কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থটি গবেষণা, চিন্তন ও মনন সব দিক থেকেই উৎকর্ষের দাবি রাখে। ...একটি ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি।

—বেলা দত্তগুপ্ত, *গণশক্তি*

শুধু সমাজ কেন, রাজনীতি বা অর্থনীতিও প্রায়ই পরিচালিত হয় ধর্মের দ্বারা। সেই আলোকে আজকে সমাজে নারীর যে অবস্থান, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক যাই হোক না কেন, তার ওপর ধর্মের প্রভাব কতটুকু তার ওপরই আলোকপাত করতে চেয়েছেন কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায় তার **ধর্ম ও নারী ঃ সেকাল ও একাল** বইটিতে। ...নারীর জীবনের ওপর ধর্মশাস্ত্রের প্রভাব বিষয়ক এই গবেষণাগ্রন্থটি একটি প্রশ্ন রেখে শেষ হয় ঃ ধর্মের শৃংখল চূর্ণ করাই কি তাহলে নারী মুক্তির প্রথম পদক্ষেপ হবে?

—তানজিনা হোসেন, *ভোরের কাগজ,* ঢাকা

ডঃ জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে

গণতন্ত্র ধর্ম ও রাজনীতি

ব্যাপকার্থে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় যে সামাজিক বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন, তার দেশজ উৎসের সন্ধান বইটির আপাদমস্তক বিধৃত। ...আমাদের বোধির জগৎকে একটি সুস্থ সামগ্রিক চেতনায় মণ্ডিত করে। ...বুদ্ধি ও মননের জগতে যে সংকট, তা থেকে মুক্ত হতে গেলে অবশ্য পাঠ্য হিসাবে এই বইটিকে গণ্য করা উচিত। ...মাঝে মাঝে সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়ি, তবে কি 'বৈশ্য সভ্যতাই' চূড়ান্ত উপসংহার? ...আজ সাম্রাজ্যবাদের যে ভয়াবহ সংক্রমণ

আমাদের বিবেচনাবোধ আচ্ছন্ন করছে, সেই ধ্বস্ত চরাচরে দাঁড়িয়ে অকৃত্রিম আস্থায় বলব, আসুন আমরা বইটি পড়ি। আত্মস্থ করি। অনেক স্বস্তিবোধ করবেন পড়া হয়ে গেলে।

—*গণশক্তি*

জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গভীর অধ্যয়ন ও মুক্তবুদ্ধি মননশীলতার খ্যাতি বহুশ্রুত। আলোচ্য গ্রন্থটিতে গণতন্ত্র, ধর্ম, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয় বিচার বিশ্লেষণ সেই মুক্তবুদ্ধির স্পষ্ট প্রতিফলন। ...সামগ্রিক স্বাধীনতার অবর্তমানে প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের কোনও স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করার পক্ষে সবচেয়ে বড় বাধা দারিদ্র। ...দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলও জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাধীনতার ধারণাকে সার্থক করে তোলার বড় রকমের অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে বলে গ্রন্থকার মনে করেন। ...তিনি মনে করেন ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ শূদ্রশ্রেণীর উপর প্রভুত্ব ও শোষণশাসনকে চিরস্থায়ী করতে আর্য শাসকশ্রেণী নির্লজ্জভাবে ধর্মকে নানা কৌশলে ব্যবহার করে। ...তাঁর বৌদ্ধিক লড়াইয়ের মূল লক্ষ্য ধর্মান্ধতা সৃষ্টির রাজনৈতিক কৌশলকে ব্যর্থ করা। ...তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের অনুকূলে। ...শ্রেণীহীন শোষণহীন ‘সমসমাজ’ গঠনের লক্ষ্যে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান জরুরি। ...স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি নিয়ে পুরাতন ধ্যানধারণাগুলি তিনি যাচাই করেছেন নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে। বিশেষ করে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের গুণে বিবিধ নজিরসমৃদ্ধ হয়ে প্রগতির সপক্ষে পুরাতন ধারণাগুলিই নতুন তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়েছে।

—*আনন্দবাজার পত্রিকা*

মহাকাব্য ও মৌলবাদ

‘মহাকাব্য ও মৌলবাদ’ গ্রন্থটি বর্তমান ভারতবর্ষের মৌলবাদ কলুষিত পরিমণ্ডলে মননশীলতার একটি সমৃদ্ধ ফসল। লেখক রামায়ণ-মহাভারত, শ্রুতি-স্মৃতি, উপনিষদ-পুরাণ গভীর ভাবে অনুধাবন করে আর্থসামাজিক কাঠামোর সংগে ভাববাদী, কল্পনাপ্রবণ, ধর্মীয় সাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। ...রামায়ণ ও মহাভারতে ধর্মশাস্ত্রের মূল কঠোর জনবিরোধী নীতিগুলিই ... জনসাধারণের হৃদয়ে গভীর ভাবে প্রোথিত করা হয়েছে।

...লেখকের সিদ্ধান্তের সংগে আমরা একমত। ... এ বইটি প্রতিটি অনুসিন্ধৎসু মানুষের কাছে সমাদর পাবে বলে প্রত্যাশা করি।

—*গণশক্তি*

লেখক বলতে চেয়েছেন যে রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণে, ধর্মশাস্ত্রে ঐতিহাসিক কালে প্রচলিত বিশেষ সামাজিক ধ্যান-ধারণা প্রচারিত ও প্রতিফলিত হয়েছে। ...এসব সুপ্রাচীন সত্যাদর্শ আধুনিক যুগে সম্পূর্ণ অপ্রাসংগিক হয়ে পড়েছে। রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্য মাত্র, শিরোধার্য ধর্মগ্রন্থ নয়। ...সব মৌল বক্তব্য এবং সিদ্ধান্ত মৌল প্রমাণের উপরেই সুপ্রতিষ্ঠিত। ...গ্রন্থটি মৌলবাদের বিরুদ্ধে যাঁরা সংগ্রাম করেন, তাঁদের পাঠ্য বলে মনে করি।

—*আনন্দবাজার পত্রিকা*

সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্গীতা

নিঃসন্দেহে একটি ব্যতিক্রমী রচনা। ...এতাবৎকাল সমাজ তথা ব্যক্তিজীবনে ধর্মের প্রভাব নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। সমাজ কিভাবে ধর্মকে নিয়ন্ত্রিত, পরিচালিত করেছে তার ব্যাখ্যা হয়নি। ...অধ্যাপক জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়...দীর্ঘদিনের একটি অভাব পূরণ করলেন। ...'সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভগবদ্গীতা' ভারতীয় ধর্ম, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রনীতি চর্চার ক্ষেত্রে এক গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংযোজন। বহুমাত্রিক দৃষ্টিভংগী ও গবেষণা পদ্ধতির সহায়তায় তিনি ভগবদ্গীতার অনুপুংখ বিশ্লেষণ করেছেন যা একান্তই অভিনব ও অনন্য। সুগভীর পাণ্ডিত্যে ও শায়কী দৃষ্টিতে রচিত ... সুগভীর তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ একখানি বই আমাদের উপহার দিয়েছেন।

—*গণশক্তি*

জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় গীতার একটি 'পার্থিব' ব্যাখ্যা রচনা করেছেন। ...এ বিষয়ে তাঁর প্রচেষ্টা এবং পাণ্ডিত্য সমাদরণীয়। 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি' অবলম্বন করে সর্বকালে বিখ্যাত গীতার প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করাই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। এগারোটি সুরচিত অধ্যায়ে...গীতাকে সামাজিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে আনা হয়েছে, সে প্রেক্ষিতে তার মূল্যায়ন করা হয়েছে। গীতার এই পার্থিব ব্যাখ্যা অবশ্যই প্রাসংগিক। অবশ্যই প্রয়োজনীয়। লেখকের আলোচনা

গভীর বিশদ, তথ্যপূর্ণ। তিনি গীতার কাব্যগুণকে অস্বীকার করেন নি। ...তিনি মনে করেন যে গীতার ভগবান কল্পিত চরিত্র, অবতার কিংবা ঐতিহাসিক মানুষ নন।

ধর্মের ভবিষ্যৎ

অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বশেষ গ্রন্থ 'ধর্মের ভবিষ্যৎ'-এ ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে তার ব্যাপক পর্যালোচনা এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অভিব্যক্ত। পনেরোটি সুনির্দিষ্ট স্তরে ধর্মের বহিরংগ ও অন্তর্লোকের সক্ষম ব্যবচ্ছেদ ঘটিয়েছেন গ্রন্থকার পনেরোটি পরিচ্ছেদে। ...মানুষের জন্ম ও ধর্ম-ভাবনার উৎপত্তিকে সময়ের, সমাজের বিস্তৃত পটে স্থাপন করেছেন অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ধর্মকে যত রকম দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা সম্ভব তা করেছেন অনুপুংখতায়। ...বিশ্বসৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ভাবনার প্রেক্ষিতেও ধর্মকে রেখে তার যুক্তিগ্রাহ্য মূল্যায়ন করেছেন। এবং এখানে অমোঘ হয়ে উঠেছে আধুনিকতম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা। ...এই গ্রন্থপাঠ একালের উৎসুক পাঠকের কাছে এক সমুন্নত মেধাবী অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে। আমাদের জটিল সময়ের, বিভ্রান্তিদীর্ণ সমাজের প্রেক্ষিতে এই মনীষাঋদ্ধ গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে এক বিরল সংযোজন হিসেবেও চিহ্নিত হবার যোগ্যতাকে নিঃসংশয়ে অর্জন করে নিয়েছে।

জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ধর্মের ভবিষ্যৎ' গ্রন্থে ... বিশ্ব সৃষ্টি সম্বন্ধে ধর্ম ও বিজ্ঞানের বক্তব্যগুলি নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। ...লেখক পর্যালোচনা করেছেন বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের স্বরূপ। ...এ ভাবে লেখক পরিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে ধর্মের সংগে একে একে সংস্কৃতির, আর্থসামাজিক কাঠামোর, রাষ্ট্রের ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সম্বন্ধ ও স্বরূপগুলি বিশ্লেষণ করেছেন। ...শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় যে কর্তৃত্ব ও দক্ষতার সংগে 'ধর্ম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' পরিচ্ছেদটি লিখেছেন তা পাঠককে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি সম্বন্ধে নতুন নতুন চিন্তায় উদ্দীপিত করবে। ...প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরোধী মুক্তচিন্তা, জীবনমুখী ধর্ম, নাস্তিকতার অবদান ও পরিসীমা, সাম্য ও স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে লেখকের চিন্তা ও চর্চা খুবই কৌতুহলোদ্দীপক এবং আমাদের অভিনিবেশ দাবি করে। ...আমরা জানতে চাই যে লেখক সন্নিবেশিত তথ্য ও তত্ত্বের হিমালয় সদৃশ পার্বত্যের উর্ধ্বে কি আছে কোনও সমাজজনীন সত্যের উজ্জ্বল উদয়?